শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম

স্বামী অভেদানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
কলিকাতা

॥ দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা ॥

'শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম'-গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ নূতন রূপে প্রকাশিত হ'ল। আলোচ্য বিষয় হিসাবে একটি নূতন পরিশিষ্ট সংযুক্ত হ'ল। প্রথম সংস্করণেই এই গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর নিজস্ব নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষা, সমাজ ও ধর্মের যে ব্যাখ্যা করেছেন তা বর্তমান সমাজের উপযোগী বলে মনে করি। অধ্যাত্মজ্ঞানদীপ্ত অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী স্বামী অভেদানন্দের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন চিন্তাধারা ছিল এবং সে চিন্তাধারা প্রাচীন, মধ্য ও বর্তমান ভারতের চিন্তাধারার বিরোধী নয়—বরং মিলনমৈত্রী ভাবে সমৃদ্ধ ও সঙ্গে সঙ্গে যুগোপযোগী ভাবের অনুকূল। সমাজবাসী প্রতিটি মানুষ শিক্ষা, সমাজ ও ধর্মকে বাদ দিয়ে জীবনপ্রবাহকে কখনই সবল ও সচল রাখতে পারে না। শিক্ষার আলোকে সমাজ-জীবনকে উদ্দীপিত ক'রে ধর্মের মাধুর্য উপভোগ করাই তার লক্ষ্য ও কাম্য। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ জীবনোপযোগী আলোচনার অবতারণা করে এ'সকল বক্তৃতা প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে দিয়েছিলেন। বর্তমান গ্রন্থ তাদের অনুলিখন ও মুদ্রণ। প্রথম সংস্করণের মতো দ্বিতীয় সংস্করণও পাঠকপাঠিকাদের জীবনপথে প্রেরণা দান করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রকাশক

॥ প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ॥

পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে ইংরাজীতে অনেকগুলি বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন। সেইগুলি বাংলা অনুবাদের আকারে সঙ্কলিত হইয়া এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল। তাহা ছাড়া তাঁহার স্বরচিত একটি প্রবন্ধও এই গ্রন্থে যথাযথ ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রথম বক্তৃতাটি ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে পাটনা সহরে ২৭ জানুয়ারী Behar Youngmen's Institute-এর উদ্যোগে তখনকার শিক্ষামন্ত্রী স্যার ফকিরুদ্দীন আহম্মদের সভাপতিত্বে প্রদত্ত হইয়াছিল। আমেরিকা হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমনের পথে কুয়ালালামপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্থানীয় আশ্রমে স্বামীজি দ্বিতীয় বক্তৃতাটি ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই অক্টোবর প্রদান করিয়াছিলেন তৃতীয় বক্তৃতাটি হনোলুলুতে Pan-Pacific-Educational Conference-এর অধিবেশনে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে দেওয়া হইয়াছিল। 'শিক্ষা, ও সমাজ' নামে চতুর্থ বক্তৃতাটি 'নৃপেন্দ্র নারায়ণ পাবলিক হল'-এ প্রদত্ত হইবার পরে তাঁহার দ্বারা স্বহস্তে লিখিত হইয়াছিল। চতুর্থ বক্তৃতাটি কোন এক জনসভায় প্রদত্ত হইয়াছিল। ষষ্ঠ ও সপ্তম বক্তৃতাটি স্বামিজী ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে প্রথম ভারতে আসিবার সময়ে কলিকাতার নাগরিকদের ও যুবকবৃন্দের উদ্দেশে দুইটি জনসভায় প্রদান করিয়াছিলেন। *Religion of the Twentieth Century* নামে স্বামিজীর ইংরাজী বক্তৃতাটি 'বিংশ শতকের ধর্ম' নামে এই গ্রন্থে অষ্টম পরিচ্ছেদে অনুবাদের আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বামীজির *Aim of Religion* নামক ইংরাজী বক্তৃতাটির অনুবাদ শেষ পরিচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে।

শিক্ষিত সমাজের নিকট পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দের নাম সাধারণতঃ একজন সিদ্ধসন্ন্যাসী উন্নত শ্রেণীর ধর্মশিক্ষক এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় বেদান্তের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্নকারী মহাজ্ঞানী মনীষী বলিয়া পরিচিত। কিন্তু স্বামিজী শুধু ধর্মসাধনায় ও দার্শনিক তত্ত্বনির্ণয়ের ব্যাপারে ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্যদেশে বহু নরনারী পথপ্রদর্শক ছিলেন না। সংসারের সর্ববিধ বন্ধনত্যাগী মোহবিজয়ী সিদ্ধ সন্ন্যাসী হইলেও স্বামিজী তাঁহার স্বদেশ, জাতী ও সমাজকে কোনদিনই ভুলিতে পারেন নাই।

ভারতবর্ষের অগণিত অধিবাসীর সহিত তিনি আপনার একাত্মতা ও প্রাণস্পন্দন অনুভব করিতেন, তাহাদের দুঃখ দুর্গতি দারিদ্র ও অবনতিতে তাঁহার অন্তরে ব্যথা ও সমবেদনার দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিত। দেশ জাতী ও সমাজের মধ্যে তিনি নিজের আরাধ্য দেবতাকে দেখিতে পাইতেন বলিয়া স্বদেশবাসী নরনারীদের সেবা তাঁহার নিকটে ধর্ম-সাধনার নামান্তর ছিল। দেশকে এই জাতীয়তাবাদী স্বদেশপ্রাণ সিদ্ধসন্ন্যাসী কী ঐকান্তিক শ্রদ্ধা, সমবেদনা ও মমতাভরা দৃষ্টিতে দেখিতেন, কী নিবিড়ভাবে ভালবাসিতেন তাহা তাঁহার *India and Her People* (ভারতীয় সংস্কৃতি) নামক পুস্তকে অগ্নিময়ী ভাষায় জীবন্ত অনুরাগের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। "শিক্ষা' সমাজ ও ধর্ম" নামে বর্তমান গ্রন্থের প্রত্যেকটি অধ্যায় পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দের জলন্ত স্বদেশপ্রাণতা ও স্বদেশবাসীর প্রতি ঐকান্তিক প্রেম, সহানুভূতি ও শুভেচ্ছার পরিচয়ে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। বাংলার প্রত্যেক দেশভক্ত ধর্মনিষ্ঠ ও সমাজের উন্নতি প্রয়াসী হিন্দু নরনারী এই পুস্তকে আপনাদের দেশসেবায় কর্মপন্থার নির্দ্দেশ পাইবেন। প্রকৃত হিন্দুধর্ম কি এবং তাহার বিশ্বজনীন ভাব ও অপরূপ যুক্তিপ্রাধান্য দেখিয়া পাঠক-মাত্রেই হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে নিজেদের ভ্রান্তি ও বিকৃত ধারণা দূর করিতে পারিবেন। আজিকার দিনে হিন্দুধর্ম, সমাজ, জাতীয়তা ও শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে বালিকা হইতে পরিণত বয়স্ক নরনারীমাত্রের সঠিক পরিচয় লাভ করা একান্ত প্রয়োজন। আধুনিক বাংলার হিন্দুসমাজ সেই সন্ধান এই গ্রন্থে পাইবেন এ'সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা লইয়া আমরা এই গ্রন্থ তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত করিলাম।

পাঠকের সুবিধার জন্য প্রত্যেক অধ্যায়েরই বিস্তৃত বর্ণনাপূর্ণ সূচীপত্র দেওয়া হইয়াছে। আবশ্যক অনুযায়ী কোন কোন অধ্যায়ে নির্দ্দেশিকা (references ও ফুটনোট সন্নিবিষ্ট করা হইল।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫

প্রকাশক

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য রসায়নবিজ্ঞান সম্বন্ধে অত্যধিক জ্ঞান থাকার প্রয়োজন—বর্তমান যুগে বাস করিয়াও অধিকাংশ ভারতবাসীর আন্তর্জাতিক দৃষ্টি খুলে নাই—আধুনিক বিজ্ঞান ও সমস্ত সৌরজগৎ সম্বন্ধে ভারতবাসীদের অধিকাংশ ব্যক্তিরই কোন স্পষ্ট ধারণা, জানিবার আগ্রহ অথবা সত্যান্বেষণ প্রবৃত্তি নাই—নিজের সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নতি না করিলে কোন জাতিই জগতে আপনার স্থান লাভ করিতে পারে না—ভারতবাসীদের আত্মনির্ভরতা ও স্বাবলম্বন প্রকৃতির অভাব—পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্যের গুরুভার—প্রকৃত বিদ্যা ও জ্ঞান কাহাকে বলে—দিব্যজ্ঞান লাভই শিক্ষার আদর্শ হওয়া উচিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষা ও সভ্যতা — পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৫১—৫৯

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সামাজিক জীবনের মূলনীতির পার্থক্য—প্রাচ্যের সমাজজীবনের আদর্শ কর্তব্যপরায়ণতা—পাশ্চাত্য সমাজ-জীবনের আদর্শ ব্যক্তিগত অধিকারবাদ—চীন, জাপান ও ভারতবর্ষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবের ঐক্য ও সাদৃশ্য—অধিকারবাদের প্রকৃতি—প্রাচ্যজগতের আদর্শ কর্তব্যবাদের বৈশিষ্ট্য—পাশ্চাত্যদেশের বাণিজ্যবাদ ও শ্রমশিল্পের প্রসারকে প্রাচ্যদেশবাসীরা জীবনের চরমনীতি বলিয়া স্বীকার করে নাই—পাশ্চাত্ত্যের অধিকারবাদকে প্রাধান্য দিলে ভারতবাসী হিন্দুসমাজে নৈতিক অবনতি ও বিপর্যয়ের সম্ভাবনা—এই দুই সমাজনীতির মধ্যে কোনটির শ্রেষ্ঠতা ও উপযোগিতা আছে তাহা নিরপেক্ষভাবে নির্ণয় করা প্রয়োজন—উভয় দেশের মনীষীদের এবিষয়ে একটা নিষ্পত্তি ও মীমাংসা করা উচিত—বর্তমান যুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশের সভ্যতা, সমাজ ও সংস্কৃতিকে জানিবার সুযোগ আসিয়াছে—ইহাদের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা মূলতঃ অথবা বাহ্যতঃ তাহা আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ের সভ্যতার আদানপ্রদানের ফলেই একে অন্যকে যথার্থভাবে জানিতে বুঝিতে ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইতে সমর্থ হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিক্ষা ও সমাজ — পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬০—৮১

হিন্দুসমাজে বর্ণবিভাগের কোন প্রয়োজন আছে কি না? প্রকৃত বর্ণভেদ বলিতে কী বুঝায়? গাত্রচর্মের রঙই অতীতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছিল—চতুর্বর্ণ সম্বন্ধে গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—বর্তমান হিন্দুসমাজে জাতিভেদ অযৌক্তিকতা ও অন্যায় নীতি—জন্মগত জাতিভেদ আজিকার দিনে অচল—নারী ও

পুরুষের সমান অধিকার বৈদিক যুগ হইতে হিন্দু সমাজে ছিল—প্রাচীন ভারতে হিন্দু-নারীদের সামাজিক সকল বিষয়ে সমান অধিকার—শিক্ষা, ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতি সকল বিষয়ে নারীদের সমান অধিকার দেওয়া কর্তব্য—আদর্শ জননী না হইলে সমাজে আদর্শ সন্তান জন্মগ্রহণ করে না—স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য বিলাসিতা ও স্বেচ্ছাচারিতা নয়—বাঙলা-দেশের বহুলোকের খাদ্যাখাদ্য-নির্ণয়ে ও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে অজ্ঞতা—শরীর সুস্থ সবল ও কর্মক্ষম রাখাই আহারের উদ্দেশ্য—মানুষে মানুষে দ্বেষ ঘৃণা ও হিংসার ভাব সামাজিক একতা ও উন্নতির অন্তরায়—বর্তমান হিন্দুসমাজের অবনতির কারণ তথাকথিত জাতিভেদ ও প্রাদেশিক বিদ্বেষ—প্রাচীন ভারতে বর্ণাশ্রমের উপযোগিতা—প্রাচীন হিন্দুজাতির বিদ্যাপীঠ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—বর্তমান হিন্দুসমাজের বিকৃত ও অবনত অবস্থার কারণ—অস্পৃশ্যতা জাতিভেদ, গোঁড়ামী, নারীজাতির অশিক্ষা ও অবরোধপ্রথা প্রভৃতি দূর করিলেই হিন্দুসমাজ আবার তাহার লুপ্তগৌরব ফিরাইয়া আনিতে পারিবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মানব-জীবনের আদর্শ পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৮২—৯৩

এখনকার দিনে ধর্ম শুধু পুঁথিগত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে—স্বামী অভেদানন্দের বাল্য জীবন হইতেই সত্যান্বেষণের আকুলতা—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দিব্যভাব ও ঐশ্বরিক শক্তির জীবন্তমূর্তি—শৈশবকালই ধর্মসাধনার উপযুক্ত সময়—সরলতা না থাকিলে ধর্মলাভ হয় না—বর্তমান কালে হিন্দুসমাজে ধর্মবিমুখতার আতিশয্য—এখনকার দিনে ধর্মবিহীন ও ভোগবাদমূলক শিক্ষা—পুস্তকপঠিত জ্ঞান জ্ঞানই নয়—ঈশ্বরলাভের ফলে দিব্যজ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান—শৌচ, পবিত্রতা, আত্মসংযম ধর্মসাধনার অপরিহার্য্য বিষয়—মানসিক শক্তি প্রবল না হইলে আত্মসংযম লাভ হয় না—বিচার ও পবিত্রতা একত্রে অভ্যাসের আতিশয্যেই ঈশ্বর অথবা নিজের দিব্যস্বরূপের সন্ধান পাওয়া যায়—মৃত্যুর পর মানুষের সমস্ত বিষয় সম্পত্তিই পড়িয়া থাকে—একমাত্র পাপপুণ্যের কর্মফলই মানুষের পরজন্মের সাথী হইয়া থাকে—দিব্যজ্ঞান লাভই জন্মমৃত্যু ও ভববন্ধন হইতে পরিত্রাণের কারণ—ব্রহ্মচর্য্য ও সত্যপরায়ণতাই ঈশ্বরলাভের প্রধান সাধন—আধুনিক যুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণই নিখিল ধর্মভাব ও ঐশ্বরিক মহিমার আদর্শ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভারতবাসী ও বর্তমান যুগ পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৯৪—১১৭

ভারতবর্ষই সমগ্র জগতের মধ্যে একমাত্র পুণ্যভূমি—পাশ্চাত্যদেশে স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি ও সনাতন ধর্ম-প্রচার আন্দোলনের সূচনা—খৃষ্টান

মিশনারী ও অন্যান্য দলের সঙ্ঘবদ্ধভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারের বিরুদ্ধে বাধা প্রদান —বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ দিব্যদ্রষ্টা মহাযোগী ও নব্যভারতে জাতীয়তার মন্ত্রগুরু—পাশ্চাত্যদেশের মনীষী সমাজে বিবেকানন্দের মহত্ত্ব প্রতিভা ও জ্ঞানের বিপুল স্বীকৃতি—স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মবাণীর বিচিত্রতা ও অপরূপতা—য়ুরোপ ও আমেরিকায় শিক্ষিত সমাজে স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক প্রভাব—স্বামী বিবেকানন্দই ভারতের একমাত্র প্রকৃত বাণীমূর্তি—বৌদ্ধযুগে পৃথিবীর দেশে দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসার—হিন্দুধর্মে বুদ্ধদেবের স্থান—সমুদ্রযাত্রা হিন্দুশাস্ত্রে অবৈধ নিয়ম ও পাপ নয়—আমেরিকার সভ্যতা ও জাতীয় জীবনের আদর্শ ঐহিক সুখসম্মান লাভ ও ভোগবাদ—হিন্দুধর্মের আলোকেই যীশুখৃষ্টের জীবন ও বাণীর প্রকৃত ব্যাখ্যা সম্ভব—ধর্মপ্রাণতাই হিন্দুজাতিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে—একতা, সঙ্ঘবদ্ধতা ও নিয়মানুবর্তিতাই ইংরাজ, আমেরিকান ও জাপানীদের সাফল্য ও অভ্যুদয়ের মূল কারণ—বাঙলা দেশে একতার অভাবই বাঙালী জাতিকে অবনত ও দুর্গতিগ্রস্ত করিয়াছে—একতা সঙ্ঘবদ্ধতা ও পরস্পর সহযোগিতা ভিন্ন ভারতবাসীর উন্নতি ও অভ্যুদয়ের আশা নাই—নিঃসম্বল, নির্বান্ধব অবস্থায় সুদূর পাশ্চাত্যদেশে স্বামী অভেদানন্দের বহুবর্ষব্যাপী ভারতের বাণী প্রচার—বাঙলার অধিবাসীদের সমগ্র জাতির প্রতি গুরুদায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য সাধন করিতে হইবে—প্রবল কর্মশীলতা ভিন্ন বর্তমান দুর্গতি হইতে বাঙালীর পরিত্রাণ অসম্ভব—আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে রামকৃষ্ণ মিশনের স্থায়ী আশ্রম ও প্রচারকেন্দ্র—শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে আদানপ্রদান একান্ত প্রয়োজন—বাঙলার সুশিক্ষিত চরিত্রবান কর্মঠ ও দেশপ্রেমিক যুবকদিগকে দেশে দেশে ভারতের সাংস্কৃতিক আদর্শের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে—সকল ধর্মেরই মূলনীতি এক—প্রত্যেক ধর্মেরই গন্তব্যস্থল এক অদ্বিতীয় সার্বজনীন শাশ্বত সত্য।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

তরুণ বাঙালীর আদর্শ পৃষ্ঠা-সংখ্যা—১১৮-১৫০

বর্তমান যুগে ভোগবাদ ও ত্যাগবাদ এই দুইটি বিভিন্ন বিরোধী আদর্শ ভারতবাসীদের উপরে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেছে—স্বাধীনতাই জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশের প্রধান উপায়—ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্যদেশে স্বাধীনতার আদর্শের সম্বন্ধে বিভিন্নতা—পৃথিবীর মধ্যে হিন্দুরাই সর্বাপেক্ষা ধর্মভীরু সংযত ও নীতিপরায়ণ জাতি —একতা, সঙ্ঘবদ্ধতা ও জাতির উন্নতি সাধনে সকলের একমন হইয়া আত্মোৎসর্গ করাই পাশ্চাত্যজাতিদের বিশেষ গুণ—ভারতবাসীদের মধ্যে জাতীয় একতার অভাবই তাহাদের সর্ববিধ উন্নতির অন্তরায়—ভারতবর্ষ বিশেষতঃ বাঙলাদেশে সর্বতোভাবে স্বার্থত্যাগী, সংগঠনশালী ও পবিত্রচিত্ত নেতার একান্ত প্রয়োজন—আমাদের দেশে

ইতিপূর্বে বহু মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে—বেদই হিন্দুধর্মের মূলভিত্তি—খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি অন্যধর্মে হিন্দুধর্মের পরে আর কোন নূতনত্ব দেখাইতে পারে নাই—সমাজ-সংস্কারক, রাষ্ট্রীয় নেতা সকলেরই সর্ব্বত্যাগী ও পরহিতব্রতী হওয়া চাই—প্রকৃত দেশনেতা ও ধর্মনেতার লক্ষণ—অযোগ্য ধর্মগুরুর শিক্ষায় শিষ্যের অবনতি—দেশনেতা হইবার অধিকারী ব্যক্তি—অজ্ঞ ও অসমর্থ নেতাদের অধীনে জাতি ও সমাজের অবনতি ও অকল্যাণ—রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা নয় আধ্যাত্মিক মুক্তিই প্রকৃতপক্ষে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা—ব্রহ্মচর্য, ত্যাগ সংযম ও পবিত্রতা দেশের যুবকদের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে—বাল্যবিবাহের কুফল—আমেরিকার সামাজিক জীবনের উন্নতি—বর্ত্তমানে হিন্দুসন্তান হইয়াও বাঙলাদেশে অসংখ্য ব্যক্তি ধর্মবিমুখ—চিত্তের একাগ্রতাই সর্ব্ববিষয়ে সাফল্যলাভের প্রকৃষ্ট উপায়—অন্যান্য দেশের নারীদের মত হিন্দু-নারীরাও দেশ ও সমাজের নানাবিষয়ে উন্নতি করতে পারে—বিবাহিতা স্ত্রীকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখা উচিত—নারীমাত্রেই জগজ্জননীর প্রতিমূর্তি—জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বিস্মৃত হওয়াতেই বর্ত্তমানে আমাদের এরূপ দুর্গতি ও অবনতি—পাশ্চাত্য-জাতিদের কাছে ভারতবাসী কি কি সদগুণ শিক্ষা করিতে পারে—ভারতে পাশ্চাত্য সভ্যতার আগমন ও কোন কোন বিষয়ে তাহার সুফল—ইংরাজী ভাষাই এখন জগতের বহুদেশে কথিত ভাষা—জাতীয় শ্রমশিল্প ও জাতীয় বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসার ভিন্ন স্বদেশী-আন্দোলনের কোনই সার্থকতা নাই—দেশীয় শিল্পের ও বাণিজ্যের উন্নতি ভিন্ন আমাদের অর্থনৈতিক দুর্গতি দূর হইবে না সততাই বাণিজ্যে কৃতকার্য লাভের মূল—বিদেশী কারখানায় প্রস্তুত অপেক্ষা দেশে নিজেদের কারখানাতেই প্রস্তুত যন্ত্রপাতি কলকব্জা ব্যবহার করিলে তবে জাতীয় বাণিজ্য ও শ্রমশিল্পের উন্নতি সম্ভব—দেশের প্রত্যেক নরনারীকে জাতিবর্ণ ও শ্রেণী নির্বিশেষে আপনার ভ্রাতা ও ভগ্নী বলিয়া ঐকান্তিক ভালবাসাই প্রকৃত স্বদেশপ্রেম—সমস্ত নরনারীর মধ্যে সেই একই পরমাত্মা বিরাজিত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিংশ শতকের ধর্ম পৃষ্ঠা-সংখ্যা—১৫১-১৭০

বর্তমান যুগ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারেরই যুগ—বৈজ্ঞানিক যুক্তিহীন কোনও কিছুর স্থান বর্তমান যুগে আদৌ নাই—মানুষের জ্ঞান-সাধনা ও সত্যান্বেষণে বিজ্ঞানই একমাত্র সহায়ক—বিজ্ঞানের নানাপ্রকার আশ্চর্য অবদান—জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে নূতন ধারণা বিজ্ঞানেরই দান—বাইবেল প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রের জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে অজ্ঞতা—ইলেকট্রিক, রেডিও টেলিগ্রাফ প্রভৃতির আশ্চর্য্য কার্যকরী শক্তি—ছয়দিনেই জগৎ সৃষ্টি

হয় নাই—বাইবেলের বর্ণিত সৃষ্টির মতবাদ যুক্তিহীন ও ভ্রান্তিপূর্ণ—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া এক অসীম প্রাণশক্তির লীলা চলিতেছে—আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্রমিক অভিব্যক্তি ও মানবজাতির উৎপত্তি—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্রতা ও বিশালতা—জড় ও চেতন একই নিত্যবস্তুর দুইটি বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র—মানবাত্মা পিতা মাতার সৃষ্টি নয়—মানবের পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্মের স্বপক্ষে বৈজ্ঞানিক যুক্তি—কর্মবাদের বৈজ্ঞানিক যুক্তি—বিজ্ঞান ও সাম্প্রদায়িক ধর্মের মধ্যে বিরোধ—বিজ্ঞানের যুক্তিবাদের আলোকে বহু ধর্মশাস্ত্রের অযৌক্তিকতা প্রমাণ—কোন ধর্মগ্রন্থই ঐশ্বরিক সূত্রে উৎপন্ন হয় নাই—এব্রাহাম প্রভৃতি ইহুদী প্রফেটদের অস্তিত্ব ঐতিহাসিক প্রমাণহীন—বাইবেলে বর্ণিত অলৌকিক ঘটনাবলী গল্পকাহিনী মাত্র—অধ্যাপক বেকনের এ সম্বন্ধে সমর্থন—খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের দ্বারা 'ধর্মবিশ্বাস' কথাটির অপব্যবহার—যুক্তিবাদ ও চিন্তার স্বাধীনতা বিংশ শতাব্দীর বিশেষত্ব—সত্যের অনুসন্ধান ও উপলব্ধিই এ'যুগের একমাত্র লক্ষ্য—প্রেততত্ত্ববিদ্যা অনুশীলনের দ্বারা আত্মার অমরত্ব প্রতিপাদন ও বাইবেলে বর্ণিত 'অনন্ত নরকভোগ'-এর মতবাদ খণ্ডন—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলতত্ত্ব প্লেটো, কান্ট, এমার্সন, স্পিনোজা প্রভৃতি মনীষীদের দ্বারা বিভিন্ন নামে অভিহিত—বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ—সকল দেশের দার্শনিকদের সমস্ত মতবাদের মধ্যে ঐক্যসূত্র আবিষ্কারই বিংশ শতাব্দীর লক্ষ্য—শুভকারী ঈশ্বর ও শয়তানে বিশ্বাস ভ্রান্তিপ্রসূত সিদ্ধান্ত মাত্র—আত্ম অনাদি অনন্ত অবিনাশী সত্ত্বা—ইহা 'বহু' বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও মূলতঃ এক ও অখণ্ড বস্তু—এক অসীম প্রাণসত্ত্বা হইতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত প্রাণী ও পদার্থের অভিব্যক্তি হইয়াছে—কর্মফল ও কার্য্যকারণবাদ—বিশ্বের বিপুল বৈচিত্র্যের পশ্চাতে অসীম একত্ব বিরাজিত—ব্যক্তিবিশেষের উপর ভিত্তিস্থাপিত ধর্ম সার্বজনীন হইতে পারে না—বেদান্তে বর্ণিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলতত্ত্ব—বিশ্বের মূলতত্ত্ব সর্ব্ববিধ আপেক্ষিকতার অতীত—পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার ঈশ্বর দান করেন না—বিশ্বজগতের কারণ সম্বন্ধে, বিজ্ঞান ও বেদান্ত—যুক্তিবাদই বেদান্তের মতে সত্যানুসন্ধানের প্রধান পদ্ধতি—বেদান্তে নীতিবাদের বৈজ্ঞানিক যুক্তি—সকলকে সমানভাবে ভালবাসার স্বপক্ষে বৈজ্ঞানিক যুক্তি—বেদান্তের সার্বভৌমিকতা ও অপক্ষপাতা সমন্ধে অধ্যাপক মোক্ষমুলারের অভিমত।

নবম পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মের লক্ষ্য পৃষ্ঠা-সংখ্যা—১৯১—১৯৬

ঈশ্বরলাভই পৃথিবীর সকল ধর্মেই সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য—স্বর্গ অথবা দেবলোকে অবস্থান ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য নয়—আত্মসাক্ষাৎকারের ফলে নিঃশ্রেয়স মুক্তিলাভই বেদান্তের লক্ষ্য—আত্মার অমরত্ব সমন্ধে যীশুখৃষ্টের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে আর্যঋষিগণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব জগৎকে শিক্ষা দিয়াছিলেন—বাইবেল বর্ণিত 'অনন্ত নরকভোগ'-এর শাস্তি

প্রভৃতি অযৌক্তিক মতবাদ বর্তমান যুগে সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা বিশ্বাস করিতে চায় না—শয়তান সম্বন্ধে খৃষ্টান প্রভৃতি জাতির মতবাদ ভ্রান্তি ও অজ্ঞতা মাত্র—পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার কে দেয়?—আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্রমিক উচ্চ অবস্থা—দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ—ব্রহ্মই একমাত্র অনাদি অপরিণামী অসীম সত্তা—জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন ও এক—যথাযথ সাধনার ফলে সাধক আত্মসাক্ষাৎকার করিলে তাঁহার সমস্ত ভ্রান্তি দূর, সকল সংশয়ের অবসান ও দিব্যজ্ঞান লাভ হয়।

পরিশিষ্ট

দার্জিলিঙে ছাত্রগণের প্রতি উপদেশ পৃষ্ঠা সংখ্যা—১৯৭—২০৩

প্রথম পরিচ্ছেদ

॥ শিক্ষার আদর্শ ॥

গত পঁচিশ বৎসর আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও য়ুরোপের বিভিন্ন প্রদেশের জনসভায় ভারতের প্রকৃত পরিচয় প্রদানে ও প্রচারে নিযুক্ত ছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল ভারতবাসীদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করিবার অসৎ অভিপ্রায়ে অর্থসংগ্রহকারী খৃষ্টীয় ধর্মযাজক ও সঙ্কীর্ণচেতা ধর্মাবলম্বীদের অন্যায়, অসঙ্গত ও মিথ্যা কুৎসাপ্রচার হইতে ভারতীয় সভ্যতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের আদর্শকে রক্ষা করা। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ও কানাডার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভারতীয় সভ্যতার প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত থাকিবাব সৌভাগ্য ও সুযোগ আমার হইয়াছিল। সেই সকল স্থানে পাশ্চাত্যের কয়েকজন প্রখ্যাতনামা মহামনীষীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। আচার্য ম্যাক্স-মূলরের সহিত আমি সংস্কৃতে আলাপ করিয়াছিলাম। আমার বিশ্ববিখ্যাত গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দ লণ্ডন মহানগরীতে জার্মানীর কিয়েল (Kiel) বিশ্ববিদ্যালয়ের বরেণ্য আচার্য পণ্ডিতপ্রবর পল্ ডয়সনের (Paul Deussen) সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দেন। ইনি আমাদের ৬০ খানি উপনিষৎ জার্মাণ ভাষায় অনুবাদ করেন ও বেদান্তদর্শন (System des Vedanta) উপনিষদের দার্শনিক মতবাদ (Philosophy of the Upanishads) নামক দুইখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। পণ্ডিতপ্রবর একবার ভারতে আসিয়া বোম্বাই নগরীতে সংস্কৃত ভাষায় এক বক্তৃতা দেন। সংস্কৃত

ভাষায় অনুরাগবশতঃ ইনি এক্কাচালকদের সহিতও সংস্কৃতে কথা কহিতেন। অবশ্য তাহারা সে'সব মোটেই বুঝিতে পারিত না। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ আমাকে লণ্ডন মহানগরীতে আহ্বান করিয়া লইয়া যান এবং আমার উপর সেখানকার বেদান্ত প্রচারের কার্যভার প্রদান করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। গৃহীত প্রচারকার্যের ভার কিছুকাল বহন করিবার পর নিউ ইয়র্ক সহরে প্রধান কেন্দ্র খুলিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া আমি আমেরিকা যাত্রা করি। স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমিতির তখন শৈশব অবস্থা। ইহার সভ্যসংখ্যাও মুষ্টিমেয়। প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া আমি সেই সংস্থাকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। নিঃসম্বল অবস্থায় আমি নিউ ইয়র্কে প্রথম উপস্থিত হই। আর এই সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে এক কপর্দকও গ্রহণ করি নাই। নিউ ইয়র্কবাসীরা আমার সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া সহরের বাহিরে আশ্রমের জন্য ৩২০ একর পরিমিত এক ভূখণ্ড ও নিউ ইয়র্ক সহরে অন্যূন দুই লক্ষ টাকা মূল্যের একটি বাসগৃহ আমায় দান করেন। বর্তমানে[১] শ্রীরামকৃষ্ণমিশনের চারিজন সন্ন্যাসী সেখানকার বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে প্রচারকার্যে নিযুক্ত আছেন।

আজিকার সন্ধ্যার সভায় আমার বক্তৃতার বিষয় হইতে স্বতঃই আমাদের পুণ্য মাতৃভূমির অতীত গৌরবের কথা মনে হইতেছে। আজ মনে পড়িতেছে সেই প্রাচীন ভারতের শিক্ষা, দীক্ষা, ধ্যান-ধারণার মহান্ কাহিনী ও সভ্যতার

১। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে।

গৌববময় ইতিবৃত্তের কথা। ভারত আপনার সভ্যতার ভাণ্ডার হইতে জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে পাশ্চাত্য জাতিসমূহকে অমূল্য সম্পদ দান করিয়াছে। ভারত হইতেই সমস্ত জগৎ সর্বপ্রথম জ্যামিতি (Geometry) ও বীজগণিতের (Algebra) বিষয় শিক্ষা লাভ করে। ইউক্লিডের (Euclid) ৪৭ সংখ্যক প্রতিজ্ঞা পিথাগোরসের নামেই জগতে প্রচারিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পিথাগোরাসেব জন্মেব শত শত বৎসর পূর্বে ইহা ভারতে প্রচলিত ছিল। বৈদিকযুগের শুল্ব্যসূত্রে ইহার উল্লেখ আছে। আরববাসিগণ কর্তৃক য়ুরোপে বীজগণিত প্রথম প্রচলিত হয়। কিন্তু ভারত হইতেই আরবীয়েরা এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা করিয়াছে। লিওনার্দো দা পিসা (Leonardo da Pisa) খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে ইতালী ও য়ুরোপের অন্যান্য প্রদেশসমূহে উহার বহুল প্রচার করেন। ফলকথা জ্যামিতি (Geometry), বীজগণিত (Algebra), ত্রিকোণমিতি (Trigonometry) প্রভৃতি অঙ্কশাস্ত্রের নানা শাখার সমুদয় শিক্ষা সর্বপ্রথম ভারতে প্রবর্তিত হয়। আরববাসীরা ভারত হইতে ঐ সকল বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া পরে পাশ্চাত্য দেশে উহার প্রচলন করে। দশমিক অঙ্কলিখন-প্রণালীর (Decimal Notation) প্রাথমিক শিক্ষায়ও সমগ্র বিশ্ব ভারতের নিকট ঋণী। রোম্যান ও গ্রীকদের নিকট সে সময়ে ইহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল এবং ইহা ব্যতীত ব্যবহারিক বিজ্ঞান হিসাবে পাটীগণিতের (Arithmetic) কোন সার্থকতা থাকিতে পারে না। চিকিৎসাবিদ্যাও ভারত জগতের আদিগুরু,—যদিও সাধারণের একটা ধারণা আছে যে, গ্রীসের নিকট য়ুরোপ ইহা প্রথম শিক্ষা করে। কিন্তু সুধী-

গণের আধুনিকতম গবেষণা হইতে আমরা জানিতে পারি হিপোক্রেটিস (Hippocrates, খ্রী° পূঃ ৪০০) আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক বলিয়া খ্যাত হইলেও ভৈষজ্য-বিজ্ঞান (Materia Medica) প্রণয়নে তিনি ভারতের নিকট ঋণী ছিলেন। শুশ্রুতসংহিতা পাঠে আমরা জানিতে পারি রসায়ন (Chemistry) ও অস্ত্রচিকিৎসা শাস্ত্রে (Surgery) ভারত অপরাপর দেশ হইতে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের (Megasthenes) লিখিত বিবরণী হইতে জানা যায় দিগ্বিজয়ী সেকেন্দার সাহের (Alexander the Great) শিবিরে কয়েকজন হিন্দু-চিকিৎসক নিযুক্ত ছিলেন। তিনি গ্রীক-চিকিৎসক অপেক্ষা হিন্দু-চিকিৎসক-দেরই অধিক পছন্দ করিতেন। নিয়ারকাস (Niarchus) ও আরিয়ান (Aryan) হিন্দু-চিকিৎসকগণের কঠিন রোগ নিরাময়কারী শক্তির প্রভূত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ের বহু বিভাগে হিন্দুরাই জগতের প্রথম শিক্ষক। গ্রীসীয় সঙ্গীতে প্রথমে মাত্র পাঁচ সুরের প্রচলন ছিল, কিন্তু হিন্দুরা তাহাদের বহুপূর্বে সপ্তস্বর ও তিন গ্রামের আবিষ্কার ও উৎকর্ষ সাধন করেন। বৈদিক যুগে সামবেদ পাঁচ হইতে সাত সুরের সাহায্যে গীত ও উচ্চারিত হইত। বিশিষ্ট রাগ-রাগিণীর গঠনপ্রণালী (models) সংযুক্ত ওয়াগ্নারের (Wagner) সঙ্গীত ভারতীয় সঙ্গীতকলার নিকটে ঋণী। বিখ্যাত জার্মাণ দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের (Schopenhauer) সহিত ওয়াগ্নারের (Wagner) এ' বিষয়ে যে একবার কথোপকথন হয় তাহা হইতে আমরা জানিতে

পারি সুপ্রসিদ্ধ জার্মাণ সঙ্গীতজ্ঞ ওয়াগ্নার (Wagner) সংস্কৃত সঙ্গীতবিজ্ঞানের ল্যাটীন অনুবাদ হইতে ভারতীয় সঙ্গীতকলার প্রচলিত প্রধান প্রধান রাগ-রাগিণীদের থাট বা গঠনপ্রণালীর বিষয় শিক্ষা করেন এইজন্য তাঁহার সঙ্গীত এত মৌলিক ও সুন্দর। জ্ঞানের অপরাপর বিভাগে ভারতবাসীদের গবেষণা সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy) ও সাংখ্যোক্ত জাগতিক শক্তি মূলাপ্রকৃতি হইতে বিশ্বের ক্রমবিকাশ-বাদের (evolution) কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। যীশু-খৃষ্টের আবির্ভাবের শত শত বৎসর পূর্বে ভারতে এই সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয়ের চরম-উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। য়ুরোপের সুধীমণ্ডলী একথা আজও স্বীকার করিয়া থাকেন। স্যর মনিয়র মনিয়র উইলিয়ামস্ (Sir Monier Monier Williams) তাঁহার 'হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম' (Hinduism and Brahminism) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন : "স্পিনোজার (Spinoza) জন্মের শত শত বৎসর পূর্বে হিন্দুরা তাঁহার প্রবর্তিত মতবাদসম্বন্ধে সুপরিচিত ছিলেন। ডারুইনের (Darwin) শত শত শতক পূর্বে ডারুইনের মতবাদ ভারতে পরিচিত ছিল। 'ক্রমবিকাশবাদ' (evolution) শব্দ জগতে অপর কোন ভাষায় স্থান লাভ করিবার বহুপূর্বে ভারতবাসীরা ক্রমবিকাশবাদী ছিলেন"। এই সুপণ্ডিত মনীষীর অভিমত ঠিকই। কারণ সাংখ্যদর্শনে আমরা দেখতে পাই এই বিশ্বের বাহিরে মেঘের উপর সিংহাসনে আসীন কোন ব্যক্তিবিশেষ বা ঈশ্বর-কর্তৃক সৃষ্টি হয় নাই। সমগ্র বিশ্বজগতের নিয়মিকা এক শাশ্বতী বিরাট শক্তি আছে। তাহাই প্রকৃতি (ইহার

ল্যাটীন প্রতিশব্দ Procreatix)। তাহাই বিশ্বের সৃজনীশক্তি। তাহা অনাদি ও অনন্ত অথচ পরিবর্তনশীল। তাহা এক ও অন্তহীন। বর্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতেও বিশ্বে একটিমাত্র শক্তি আছে। কোনদিন তাহার বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় না। সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তক মহামুনি কপিল খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে এই মতবাদ প্রবর্তন করিয়াছিলেন। আর্যভট্ট নিউটনের (Newton) মতন জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। পৃথিবী যে নিজ অক্ষরেখার উপর থাকিয়া সূর্যের চারিধারে ঘুরিতেছে এই সত্য তিনিই আবিষ্কার করেন :

> ভপঞ্জর স্থিরোভূবেবাবৃত্ত্যাবৃক্ত প্রতিদৈবসিকৌ।
> উদায়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহাণাম্।

ভপঞ্জর নক্ষত্রমণ্ডল বা রাশিচক্র স্থির অবস্থায় আছে। পৃথিবী বার বার আবর্তনের দ্বারা গ্রহ-নক্ষত্রগদের উদয়াস্ত সম্পন্ন করিতেছে। কোপার্নিকাসের (Copernicus) মতবাদ য়ুরোপে সুপরিচিত হইবার বহুপূর্ব হইতে আর্যভট্টের ভূগোলবিজ্ঞান সম্পর্কীয় মতবাদ ভারতে প্রচারিত ছিল। আর্যভট্টই প্রথম মাধ্যাকর্ষণশক্তির আবিষ্কার করেন : "আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী যৎ তয়া প্রক্ষিপ্যতে তৎ তয়া ধার্যতে", অর্থাৎ পৃথিবী আকর্ষণশক্তিবিশিষ্ট, যাহা প্রক্ষিপ্ত হয়, আকর্ষণ শক্তিদ্বারা পৃথিবী তাহাই ধারণ করে।

মহাকবি কালিদাসের মধ্যে আমরা সেক্সপিয়ারের (Shakespeare) মতো কবি, শঙ্করাচার্য ও বশিষ্ঠের মধ্যে ক্যাণ্ট (Kant), হেগেল (Hegel) ও বার্কলি (Berkeley) অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের সন্ধান পাইয়াছি। কণাদের

মতবাদে আমরা জড়বাদী দর্শনের সন্ধান পাই। কণাদের পরমাণুবাদ পাশ্চাত্য মনীষীদের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। কারণ সেই সুদূর প্রাগ্‌বৌদ্ধযুগে কণাদ প্রমাণ করিয়াছিলেন বহির্জগৎ 'অণু' নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবিনশ্বর জড়কণার দ্বারা সংগঠিত। কিন্তু এখানেও পরমাণুবাদের চরমমীমাংসা হয় নাই। পরে কপিল 'তন্মাত্র' নামে জড়জগৎ গঠনকারী পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্মতর আর একটি পরমাণুর আবিষ্কার করেন। আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত ইলেক্‌ট্রনস্ (Electrons) এবং আয়ন্‌সই (Ions) সেই তন্মাত্র। উহারা ক্ষুদ্রতম আকারের ইলেক্‌ট্রন বা বিদ্যুতিন ঋণাত্মক (negative) তড়িৎ-শক্তির বৈদ্যুতিন কেন্দ্র। আয়ন ধনাত্মক (positive) বৈদ্যুতিক শক্তির কেন্দ্র। প্রাগ্‌বৌদ্ধ যুগে (খ্রীঃ পূঃ ১৫০০-৬০০) জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিরাট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জগতের দিক দিয়াও হিন্দুরা আদিগুরু। খ্রীষ্টীয় যুগের পূর্বে এমন কি যাযাবর ইহুদীজাতি মোজেস্ (Moses) নির্দিষ্ট দশটি অনুশাসনের অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইবার বহুপূর্বে য়ুরোপীয় জাতিগণ যখন উল্কীদ্বারা দেহ চিত্রিত করিত এবং পশুচর্মে দেহ ঢাকিয়া পশুর কাঁচা মাংস খাইয়া বনে-জঙ্গলে, পর্বতকন্দরে জীবনধারণ করিত। সেই সুদূর অতীতেও ভারতীয় সভ্যতা আপন মহামহিমায় চির-সমুজ্জ্বল ছিল। মানবসভ্যতার প্রথম অরুণোদয় মিশর, গ্রীস, আরবদেশ কিম্বা য়ুরোপে হয় নাই, তাহা একমাত্র ভারতেই হইয়াছিল। ভারত একটি সুপ্রাচীন দেশ। মোজেসের (Moses) বহুপূর্বে ভারতে বেদান্তের মহান্ শিক্ষা ও ধর্ম প্রচারিত ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে

অর্জুনকে ভগবদ্গীতা শুনাইয়াছিলেন। ভারতের সংস্পর্শে আসিয়াছে এমন জাতিমাত্রের গীতার বাণী প্রভূত মঙ্গলসাধন করিয়াছে। সম্রাট অশোকের অনুশাসনলিপি হইতে আমরা জানিতে পারি সাইবেরিয়া হইতে সিংহল, চীন হইতে মিশর প্রভৃতি সে সময়ের সভ্য জগতের বিভিন্ন দেশসমূহে বৌদ্ধ প্রচারকগণ প্রেরিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষু বা সন্ন্যাসিগণ দেশে দেশে বিশ্বমৈত্রী সার্বজনীন প্রেম ও সেবাধর্মরূপ উচ্চ আদর্শ শিক্ষা দিয়া বেড়াইতেন। ভগবান বুদ্ধের ঐ সকল উপদেশদান কালে মহামানব খৃষ্টের উপদেশের মধ্য দিয়া মূর্ত হইয়াছিল।[১] খৃষ্টধর্মের বহুতর উপদেশে বা মতবাদে হিন্দু আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ খৃষ্টধর্মের প্রধান অঙ্গ ব্যাপ্টিজিম বা দীক্ষাভিষেক সে সময় ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। ভারতে গঙ্গাবারির অভিষেক হইতে উহার উদ্ভব একথা আর্নেস্ত্ রেণাঁ (Ernest Renan) তাঁহার খৃষ্টজীবনীতে প্রকাশ করিয়াছেন।

জাতির শিক্ষা তাহার সভ্যতার আদর্শের উপরই নির্ভর করে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে হিন্দুসভ্যতার আদর্শ ছিল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক। সুতরাং প্রাচীন ভারতের সভ্যতা বর্তমান যুগে প্রচলিত "দোকানদারী" নীতি বা রাজনৈতিক প্রাধান্যলাভ ও অপর জাতিরসমূহের উপর আধিপত্য বিস্তাররূপ স্বার্থপর আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া আধ্যাত্মিক আদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কেবল বুদ্ধির উৎকর্ষসাধন তখন উচ্চতম আদর্শরূপে গণ্য হইত না। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধজ্ঞানরূপ আধ্যাত্মিক

১। স্বামী অভেদানন্দ: 'ভারতীয় সংস্কৃতি', পৃঃ ৩১৩, ৩২২-৩২৭ দ্রষ্টব্য।

অনুভূতি ছিল তখনকার যুগে মুখ্য-উদ্দেশ্য। মনীষী হার্বার্ট স্পেন্সার (Hebert Spencer) বলিয়াছেন: "জীবনের পূর্ণতা সাধনের জন্য মনের উন্নতি সাধনই প্রকৃত শিক্ষা"। মানবে নিহিত সুপ্ত বীজরূপ জ্ঞান শিক্ষার দ্বারা বিকশিত হয়। কতকগুলি ভাব, ধারণা ও উপদেশের একত্র মিশ্রণে মস্তিষ্কের ভিতর বিপর্যয় আনয়ন করাই শিক্ষার প্রকৃত অর্থ নয়। অজ্ঞান অবস্থা হইতে জ্ঞানের পরিপূর্ণতার ক্রমপরিণতিই প্রকৃত শিক্ষা। প্রতিটি মানবাত্মা ঐ সুপ্ত ঐশীশক্তিসম্পন্ন জ্ঞানের আকর। তাহা অন্তরে নিহিত। বাহির হইতে জ্ঞানের কিছুই প্রবিষ্ট হয় না, বরং অন্তর হইতে বাহিরে তাহার বিকাশ হয় এবং এইরূপ আধ্যাত্মিক অনুভূতির উপরেই শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হওয়া উচিত। এ'সম্বন্ধে কেহ আমাদের শিক্ষা দান করিতে পারে না, আমরা নিজেরাই নিজেদের জীবনে শিক্ষা লাভ করি। শিক্ষক কতকগুলি সন্ধান ও ইঙ্গিত বলিয়া দেন মাত্র, শিক্ষক নূতন কিছু সৃষ্টি করতে পারেন না। কিন্তু শিক্ষার উক্ত আদর্শ প্রচলিত হওয়া দূরে থাক, আজকাল এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উহার বিপরীত রীতিই অনুসৃত হয়। বর্তমানে ছাত্রেরা শিক্ষকপ্রদত্ত টীকা (notes) ও টীপ্পনী কণ্ঠস্থ করিয়াই বেশীর ভাগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পোষণ করে। কিন্তু ইহা শিক্ষার আদর্শ নয়। শুধু প্রতিভার উৎকর্ষসাধনও শিক্ষার প্রকৃত অর্থ নয়। প্রকৃত শিক্ষা অর্থে জ্ঞানের সমস্ত বিভাগেই আমাদের আধ্যাত্মিক পরিণতি ও বিকাশসাধন বুঝিব।

আমেরিকায় বর্তমানে অনুসৃত শিক্ষার আদর্শ প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর আমূল পরিবর্তন সাধন করিতেছে। সেখানে

বালকবালিকাদের কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ে লইয়া যাওয়া হয়। বিদ্যালয়ে খেলনা, বাজনা, ছবি প্রভৃতি সজ্জিত থাকে এবং ছাত্র ও ছাত্রীদের মনের স্বাভাবিক গতি জানিবার জন্য তাহাদের পছন্দ অনুযায়ী কোন দ্রব্য লইতে বলা হয়। যদি কেহ বাদ্যযন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয় তাহা হইলে সে সঙ্গীতে উৎকর্ষ লাভ করিবে, আর এই আশা করিয়া তাহাকে সেই প্রকার শিক্ষাই দেওয়া হয় যাহাতে ভবিষ্যতে সে একজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ হইতে পারে। সাধারণভাবে সাহিত্য বিভাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি-এ., এম-এ. উপাধি লাভ করিবার জন্য তাহাকে কলেজে পাঠানো হয় না। এইরূপ শিক্ষায় কেহ চিত্রকর, কেহ ব্যায়ামনিপুণ হয় এবং প্রত্যেকে এক একটি বিষয় উৎকর্ষ লাভ করে।

গতানুগতিক পথে বি-এ., এম-এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কেরাণী হওয়া শিক্ষার আদর্শ নয়। কিন্তু এই প্রণালী অনুসরণ করিয়া বর্তমানে আমরা যুবকদের যথেষ্ট সর্বনাশসাধন করিতেছি। সুতরাং প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মনের স্বাভাবিক গতি অনুসারে তাহাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্মরণ রাখা চাই যে, জ্ঞান কখনও কাহারও মনে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া যায় না। পুস্তকসমূহ কতকগুলি ভাবের ধ্যান ও ধারণারই ইঙ্গিত দেয় মাত্র। কিন্তু আমরা এই নীতি অনুসরণ করি না, সেজন্য প্রতিক্রিয়ারূপে আমরা কেবল পুস্তকের জ্ঞানই লাভ করি। বাস্তবিক কোন পুস্তকে জ্ঞাতব্য বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে পাঠক ও গ্রন্থকারের মন সমভাবে ও সমান স্তরে স্পন্দিত হওয়া উচিত। গ্রন্থকার যেভাবে ভাবিত হইয়া পুস্তক লিখিয়াছেন পাঠককেও ঠিক

সেইভাবে ভাবিত হইতে হইবে। এইরূপে আমরা স্বতঃই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি, কারণ এই প্রণালীর নাম সঞ্চারণপ্রণালী। আমাদের মন গ্রন্থকারের মনের অনুরূপ স্পন্দিত করিতে পারিলে বেতারবার্তার ন্যায় গ্রন্থকারের জ্ঞান আমাদের মনে সংক্রামিত হয়। প্রকৃত শিক্ষার ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। এখন আমরা এই প্রণালীর অনুসরণ না করিলেও প্রাচীন ভারতে ইহাই অনুসৃত হইত। বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী বর্তমানে পুরাতন ও অচল বলিয়া গণ্য হইতেছে। কারণ ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার শিক্ষানায়কেরা আমাদের দেশে প্রচলিত ব্রহ্মচর্য বিদ্যাপীঠের শুভফলপ্রদ শক্তিসম্বন্ধে এখন সচেতন হইয়াছেন। বাস্তবিক পবিত্র চরিত্র নিখুঁৎ আদর্শের একজন আচার্যের কাছে মাত্র কয়েক জন ছাত্র থাকিবে এবং তিনিই তাহাদের অভিভাবক-রূপে অবস্থান করিবেন। তাঁহার চরিত্র উচ্চ বেতনভোগী উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযত জীবনযাত্রানির্বাহ কোন ব্যক্তির মতো না হইয়া সংযত, ধীর ও নীতিপরায়ণ হইবে। এইরূপ ব্যক্তিই শিক্ষাদানের আদর্শ শিক্ষক হইতে পারেন। ভবিষ্যতে য়ুরোপ ও আমেরিকায় এই শিক্ষাদানপ্রণালী অনুসৃত হইবে। এই প্রণালীতে ছাত্রগণও একটি আদর্শের সন্ধান পায়। মৌখিক উপদেশ অপেক্ষা জীবন্ত দৃষ্টান্ত অধিকতর ফলপ্রসূ। জীবন্ত একটি উদাহরণ ছাত্রের সমগ্র চরিত্রের আমূল পরিবর্তন সাধিত করিয়া আদর্শ অনুযায়ী তাহাকে পুনর্গঠিত করে। কিন্তু বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে এই নীতি অনুসৃত হয় না। এই সব নানা কারণেই বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়।

জাতির শিক্ষার আদর্শ জাতীয় আদর্শের অনুরূপ হওয়া উচিত। এই যে আমাদের (ভারতবাসীর) মন স্বতঃই আধ্যাত্মিক আদর্শের দিকে ধাবিত ইহার কারণ আমরা ধর্ম হইতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগগুলি শিক্ষা করিয়াছি। য়ুরোপে খৃষ্টধর্ম এককালে সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক গবেষণা, জ্ঞানচর্চ্চা ও উন্নতির বিরোধী ছিল। পৃথিবীর গতি-আবিষ্কারক গ্যালিলিও-র (Galileo) শোচনীয় অবস্থার কথা ভাবিয়া দেখুন! রোমীয়-চার্চ (Roman Church) বা ধর্মসম্প্রদায় তাঁহাকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিয়া সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর গতিসম্বন্ধে তাঁহার উক্তি প্রত্যাহার করিতে বলেন। কিন্তু তিনি উত্তর করেন ঃ "তোমরা আমায় যন্ত্রণা দিতে পার, কিন্তু পৃথিবী যে ঘুরিতেছে একথা সত্য। সুতরাং এত বড় একটি সত্যের অপলাপ করিতে আমি পারি না"। জ্যোতির্বিজ্ঞান বর্তমানে এই মত নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করিয়াছে। বহুকাল ব্যাপিয়া য়ুরোপে ধর্মবিজ্ঞানের এই বিরোধ চলিয়াছিল। আজও ইহার নিবৃত্তি হয় নাই। ভিন্ন মতাবলম্বীদের দোষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত খ্রীষ্টীয় ধর্মাধিকরণ ইহার জন্য বিচার করিয়া শত শত ব্যক্তিকে যূপকাষ্ঠে হত্যা ও জীবন্ত দগ্ধ করিয়াছে। কেননা নিজেদের বিচারবুদ্ধির আলোকে চার্চ্চের বিধিব্যবস্থা ও গোঁড়ামীর প্রাধান্য তাঁহারা স্বীকার করেন নাই।

গিয়োর্ডানো ব্রুণোকে (Giordano Bruno) ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে রোমনগরীর প্রকাশ্য রাজপথে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। তাঁহার অপরাধ ছিল—পরমাত্মা এক এবং এই বিশাল জড়-জগৎ তাঁহার দেহ ও বিশ্বের আভ্যন্তরীণ শক্তি তাঁহার মন

একথা তিনি বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং এই সকল ব্যাপার হইতে প্রতীয়মান হয় খ্রীষ্টানধর্ম আজ য়ুরোপে প্রবল থাকিলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, উন্নতি বা আবিষ্কার কিছুই সাধিত হইত না কারণ খ্রীষ্টানধর্মের মতে অসৎ বা শূন্য হইতে মাত্র ছয় দিনে বিশ্ব সৃষ্টি হইয়াছে। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত কিন্তু ক্রমবিকাশবাদ স্বীকার করে। খ্রীষ্টানদের ধর্মের মতে ছয় সহস্র বৎসর হইল সূর্য সৃষ্টি হইবার পূর্বে পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান জ্যোতির্বিজ্ঞানের মতে পৃথিবীর পূর্বে সূর্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। অপর পক্ষে ভূবিজ্ঞান (Geology) প্রমাণ করিয়াছে আমাদের এই পৃথিবীর বয়স কোটী কোটী বৎসর। প্রায় ছয় কোটি বৎসর হইল এই পৃথিবীতে মানবের প্রথম আবির্ভাব হইয়াছে। এক্ষণে এই সকল পরস্পরবিরোধী যুক্তিসমূহের সামঞ্জস্য কিরূপে সম্ভব! একটি মত মানিলে অপরটি ত্যাগ করিতে হয়। আমাদের দেশে কিন্তু সনাতন ধর্ম কখনও বিজ্ঞান কিম্বা স্বাধীন চিন্তার বিরুদ্ধাচরণ করে নাই। তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করো অথবা না করুন, আপনি যদি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন হন তবেই লোকে আপনাকে জাতীয় আদর্শরূপে পূজা ও সম্মান করিবে। ভগবান বুদ্ধ ব্যক্তিত্ববান ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না, তথাপি আমরা তাঁহাকে অবতার বলিয়া ভক্তি করি।[১] মহামুনি কপিলও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি তাঁহার সাংখ্যদর্শনে বলিয়াছেন: "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ", অর্থাৎ বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না;

১। অনেকের মতে গৌতম-বুদ্ধ দশ অবতারের অন্তর্ভুক্ত নন। গৌতমের পূর্বেও বহু বুদ্ধ ছিলেন। অবতাররূপে যে বুদ্ধের কথা আমরা জানি তিনি গৌতম বুদ্ধ অপেক্ষাও নাকি প্রাচীন বুদ্ধ।

কিন্তু তথাপি কপিলকে আমরা 'মহর্ষি' বলিয়া সম্মান করি। ইহা ছাড়া শত শত এইরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের এই দেশে বিদ্যমান। স্বাধীন চিন্তাপ্রণালী প্রাচীন হিন্দুদের মূলমন্ত্র ছিল। গোঁড়ামী বা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা হইতে তাঁহারা সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। হিন্দুরা বেদ অর্থে কতকগুলি পুস্তক এবং তাহার প্রতি অক্ষর অভ্রান্ত সত্য এরূপ বুঝেন না। 'বেদ' অর্থে তাঁহারা জ্ঞান বুঝেন। ঈশ্বর জ্ঞানসমুদ্র বিশেষ, অনন্ত ও অবিনশ্বর। জ্ঞানের মাত্র একটি উৎসই আছে। কখনও কখনও ইহাই মানবেব মনে উৎসারিত হয়। এই সকল মহামানবদিগের বাণী হইতেই বিশ্বের কারণ সেই অনন্ত সত্যের কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাস্তবিকপক্ষে ঈশ্বর মানবের মনে স্বয়ং প্রকাশিত না হইলে কী প্রকারে মানব তাঁহার ধারণা কবিতে পারে। হজরৎ মহম্মদের জীবনী হইতে জানা যায় হীরাপর্বতে প্রার্থনাকালীন তিনি প্রত্যাদেশ পাইয়াছিলেন। ঐশ্বরিক জ্ঞানলাভেব জন্য ব্যাকুল হইয়া তিনি তখন আরবের মরুভূমিতে এক গিরিগুহায় বাস ও সাধনা করিতেন। সে সময়ে তাঁহার নিকট সত্য প্রকাশিত হইল। কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা জাতিতে সত্য আবদ্ধ নয়। প্রত্যেকের উহাতে সমান অধিকার। সূর্য যেমন প্রত্যেক জাতির মস্তকে কিরণ বর্ষণ করে, অনন্ত সত্যরূপ সূর্যও তেমনি সমস্ত জাতিব অন্তরে আপনাকে প্রকাশিত করিয়া থাকে। যে কেহ এই প্রকার অনুভূতির জন্য ব্যাকুল হইবে সেই এই সত্য লাভের একটি পথ খুঁজিয়া পাইবে। এই ধারণার জন্য হিন্দুর মন উদার ও পরমতসহিষ্ণু। এরূপ উদারতায় ঘৃণার স্থান নাই। ইহাতে হিন্দু মুসলমানকে

আলিঙ্গন করিয়া থাকে, কারণ ইসলামধর্মও সত্যানুভূতির অন্যতম পথ। হিন্দু খৃষ্টধর্মেও শ্রদ্ধাবান কাবণ সে জানে যে, যীশুখৃষ্ট সাম্প্রদায়িকাতার মোহে অন্ধ ইহুদীদের ভিতর সার্বজনীন সত্যই প্রচার করিয়াছিলেন। যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন: "সত্যকে জান, সত্যই তোমাদের মুক্তি দিবে"।[১] বেদের উক্তিও ঠিক ইহার অনুরূপ। তাহা হইলে এখানে পার্থক্য কোথায়?

মূলতঃ সকল ধর্মের প্রধান শিক্ষা ও আদর্শ একই প্রকাবের। ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, আত্মসংযম ও পবিত্রতা এইগুলিই ধর্মেব আদর্শ। যিনি পবিত্র ও নিঃস্বার্থ জীবন যাপন করেন, যিনি ধর্বভূতে দয়ালু, প্রেমবান ও সহানুভূতি-সম্পন্ন, যিনি ভালবাসার দ্বারা ঘৃণা ও বদান্যতার দ্বারা লোভ জয় করেন, তিনিই হিন্দুর আদর্শে প্রকৃত বিশ্বাসী। যে নিজের স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত অপরের দ্রব্য চুরি করে সে হিন্দুর দৃষ্টিতে প্রকৃত সভ্য পদবাচ্য নয়। আমার বিশ্বাস যে, মুসলমান আদর্শের দিক দিয়াও তাঁহাকে সত্য বলা যায় না। বিশ্বের সকল ধর্মের আদর্শ একই হয়। মানবের বহিঃপ্রকৃতির দিকে মনোযোগ না দিয়া অন্তঃপ্রকৃতির দিক দিয়া তাহার সমালোচনা করা উচিত। কারণ বাহিরের স্বভাব, পোষাক-পরিচ্ছদ, স্বভাব, শিষ্টাচার ও ভদ্রতা প্রভৃতি বলিতে গেলে কিছুই নয়, ঈশ্বরের নিকট একমাত্র অন্তরের পবিত্রতাটুকু সমস্ত। "পবিত্রচিত্ত ব্যক্তিরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে"।[২] ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে

১। সেণ্ট জন, ৮।৩২

২। সেণ্ট ম্যাথু ৫।৮

হইলে অন্তরের পবিত্রতা ও শুচিতা অবশ্যই চাই। পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আমরা জাতি, ধর্ম ও বর্ণনির্বিশেষে সকলকে ভালবাসিব। যে শিক্ষায় মানবজাতির মধ্যে বিরোধ ও পার্থক্যের ভাব সৃষ্টি করে, ভ্রাতৃগণের ভিতর একতাবন্ধন শিথিল করে তাহাকে কিছুতে উন্নতি বিধানকারী ও লোকহিতকর শিক্ষা বলা যায় না। তাহা কিছুতেই জাতির আদর্শ হইতে পারে না। আমার মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র প্রতিযোগিতার সংগ্রামে ও জীবিকার্জনের সহায়ক ব্যবসায়রূপ আদর্শসংযুক্ত মানসিক বুদ্ধির উৎকর্ষসাধন নয়। যাহা নিতান্ত সাধারণ স্বার্থসর্বস্বতার পঙ্কিল অবস্থা হইতে মানবকে উদ্ধার করে এরূপ ঈশ্বরীয় ভাবের সার্বজনীন নিঃস্বার্থ আদর্শের উপরেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। যাহা-কিছু এই মহান্ ও বিরাট আদর্শের সমক্ষে শ্রদ্ধায় আমাদের মস্তক নত করিতে প্রণোদিত করে তাহাই প্রকৃতপক্ষে আমাদের শিক্ষার উন্নত আদর্শ।

গ্রীস দেশে (Greece) একজন হিন্দু দার্শনিক সোক্রেটিশকে (Socrates) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন: "আপনার শিক্ষনীয় বিষয় কী?" সোক্রেটিশ উত্তর করিলেন: "মানব"। মৃদু হাসিয়া হিন্দু দার্শনিক বলিলেন: "ঈশ্বরকে না জানিয়া মানব সম্বন্ধে কিছু জানিবার আশা আপনি কী প্রকারে করিতে পারেন?" এইরূপ উত্তর একমাত্র কেবল হিন্দু-দার্শনিকদের কাছ হইতেই আশা করা যায় কারণ স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দুরা জীবাত্মাকে স্বরূপতঃ পরমাত্মার সহিত এক ও অভিন্ন বলিয়া আসিতেছেন। আমাদের মধ্যে যে ঐশীশক্তি বিদ্যমান, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রণালীর সাহায্যে সেই

পরমসত্য জানিয়া লইতে হইবে। নবজাত শিশু ঈশ্বরের জীবন্ত রূপ। আত্মা উহার জড়দেহের স্রষ্টা। অসৎ বা শূন্য হইতে উহার সৃষ্টি হইয়াছে ও বাহির হইতে আত্মা উহাতে অনুপ্রবিষ্ট এইরূপ মত ভ্রান্ত। আত্মা অনাদি ও অনন্ত। আত্মার সৃষ্টি হইতে পারে না, কেবলমাত্র দেহই সৃষ্ট হয় এবং এই কথা কেবলমাত্র হিন্দুদের বেদান্তদর্শনই শিক্ষা দিয়া থাকে। প্রতীচ্যের মনীষীরাও বর্তমানে এইকথা স্বীকার করেন। "স্বর্গরাজ্য তোমারই মধ্যে"—যীশুখৃষ্টের এই বাণী বোধহয় উপরি-উক্ত অর্থে কথিত হইয়াছে। কিন্তু প্রতীচ্যের অধিবাসিগণ এই অর্থ প্রকৃতরূপে বুঝিতে পারেন না। প্রাচ্যবাসী আমরা উঁহাদের অপেক্ষা যীশুখৃষ্টের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে অধিকতর সক্ষম। কলিকাতা সহরে একবার এক ইংরাজ ভদ্রলোক আমাকে বলিয়াছিলেন: "পাশ্চাত্যদেশবাসী অপেক্ষা হিন্দুরা সহজে যীশুখৃষ্টকে অধিকতর ও সর্বতোভাবে বুঝিতে পারে এই মত কি আপনি পোষণ করেন?" উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম: "ইহার কারণ পাশ্চাত্য মনের স্বভাব যে, উহা সমস্ত জিনিষ অতিমাত্রায় বাহ্যতঃ ও শব্দানুযায়ী অর্থে গ্রহণ করে"। ভগবান যীশুখৃষ্টের উপদেশে উপমা ও রূপকের প্রাচুর্য দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ ও গৌতমবুদ্ধের রূপক ও উপমাপূর্ণ উপদেশ যে উপায়ে বুঝিতে হয়, ইহাতেও সেই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে"। উক্ত ইংরাজ ভদ্রলোকটি কিন্তু আমার কথা অনুমোদন করেন। বেদান্তের উচ্চতম আদর্শের দিক হইতে আমরা যীশুখৃষ্ট ও জগতের অপরাপর মহামানবদের ধর্মসমূহের মূলতত্ত্বগুলির এক অভিনব ব্যাখ্যা দিতে পারি।

বেদান্ত বলিতে কোন পুস্তকবিশেষকে বুঝায় না, ইহার অর্থ 'চরমজ্ঞান'। 'বেদ' অর্থে 'জ্ঞান'। ইহার ইংরাজী প্রতিশব্দ 'wisdom'। এর অর্থও ঐ একই। সংস্কৃত 'বিদ্'-ধাতু হইতে ইহা নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'অন্ত' অর্থে শেষ এবং ইহার ইংরাজী প্রতিশব্দ 'end' ঐ একই সংস্কৃত শব্দজাত 'অন্ত'-এর তুল্য অর্থবোধক। ইংরাজী কথোপকথনে আমরা সচরাচর যে সকল কথা ব্যবহার করি উহার অধিকাংশ সংস্কৃত হইতে সিদ্ধ। ইংরাজী 'ফাদার' (father) শব্দ, ল্যাটীন্ pater, গ্রীক্ pitar, সংস্কৃতে 'পিতৃ' শব্দ ও বাচক। ইংরাজী 'মাদার' (mother) ল্যাটীন্ mater, সংস্কৃত 'মাতৃ' শব্দবাচক। ইরাজী name সংস্কৃতে নামন্; ইংরাজী serpent সংস্কৃতে 'সর্প'; ইংরাজী path সংস্কৃতে 'পথ'; ইংরাজী soup সংস্কৃতে 'সূপ'; ইংরাজী bond সংস্কৃতে 'বন্ধ'; এবং ইংরাজী punch সংস্কৃতে 'পঞ্চ'—ইহার অর্থ পাঁচ। য়ুরোপীয়ানরা যে punch পান করে, পাঁচটি পানীয়ের সংমিশ্রণে উহা প্রস্তুত বলিয়া উহার নাম punch। এইরূপ অনেক ইংরাজী শব্দের মূলশব্দ (root) সংস্কৃতে পাওয়া যায়। ঈশপ্ (Aesop) ও পিল্‌পের (Pilpay) নীতি গল্পের মূল-সংস্কৃত গ্রন্থ 'হিতোপদেশ'। ভারতে উহাদের উৎপত্তি। পরে উহারা য়ুরোপে প্রসার লাভ করে।'[১]

এখন আপনারা ভাবিয়া দেখুন যে প্রাচীন হিন্দুদের শিক্ষা, দীক্ষা ও সভ্যতা কিরূপ মহান ছিল। বৌদ্ধযুগে এই নানা বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এই বিহার প্রদেশেই

১। স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত 'ভারতীয় সংস্কৃতি', পৃষ্ঠা ২৯৪-৩৪০ দ্রষ্টব্য

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত ছিল। চীন পরিব্রাজক য়ুয়ান চুয়াঙ (Huien Tsang) ভারতে বহুকাল অবস্থান করেন। তাঁহার লিখিত বিববণী হইতে জানা যায় দশ হাজার ছাত্র নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান কবিত এবং প্রতিদিন এক শত শিক্ষাবেদী হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদেব শিক্ষা দেওয়া হইত। ইহার সাতশত বৎসরব্যাপী অস্তিত্বের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ বা অবাধ্যতা অভিযোগে কখনো কোন ছাত্র অভিযুক্ত হয় নাই এবং এরূপই সুনিয়ন্ত্রিত শাসনতন্ত্র ইহাতে প্রচলিত ছিল। আমি তক্ষশীলার (Taxila) ধ্বংসাবশেষ দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানেও কয়েক সহস্র ছাত্র বাস করিত। হিন্দু-আচার্যদেব নিকটে দর্শন ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষা লাভ করিবার জন্য চীনদেশীয় বিদ্যার্থীরা সেখানে গমন করিত। নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন বাংলার তদানীন্তন রাজধানী গৌড়নিবাসী একজন মহামনীষী বাঙ্গালী—নাম 'শীলভদ্র'। ইনি য়ুয়ান চুয়াঙ-এর শিক্ষক ছিলেন। পূর্ববাংলার বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামের বিখ্যাত দার্শনিক 'অতীশ দীপঙ্কর' বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে তিব্বতে গিয়াছিলেন। মিশব, তিব্বত, চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধ প্রচারক প্রেরিত হইত। এক সময় বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার অধিবাসীগণ সমস্তই প্রায় বৌদ্ধ ছিলেন। বাংলা ও বিহারে একই মাগধীভাষা প্রচলিত ছিল। পুরীধামের জগন্নাথদেবের মন্দিব মূলতঃ একটি পূর্ব্বতন বৌদ্ধ মন্দির ছাড়া কিছু নয়। সেই সময়ে জাতির বিচার ছিল না, সকল ব্যক্তিই ভ্রাতৃভাবে অনুপ্রাণিত ছিল। এই ভাবটির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। যদিও তখন ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের

উদ্ভব হয় নাই তথাপি বুদ্ধদেব সার্বজনীন ভ্রাতৃভাবে সর্বত্র প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এমন কি বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী শ্রীকৃষ্ণও জগতে জলদগম্ভীর স্বরে এই কথাই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন ঃ

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনিচৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥[১]

বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ হইতে গরু, কুকুর, চণ্ডাল প্রভৃতির মধ্যেও যিনি সার্বজনীন অদ্বিতীয় আত্মার অধিষ্ঠান দেখেন তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত, সমদর্শী ও বিদ্বান জ্ঞানী। এক সময়ে ইহাই ছিল আমাদের ভারতের আদর্শ। বর্তমানে জনসাধারণ উহা বিস্মৃত হইয়াছে এবং নিঃস্বার্থপরতা ও ভ্রাতৃভাবের স্থান আজ স্বার্থপরতা অধিকার করিয়া বসিয়াছে। প্রাথমিক সংস্কৃত পুস্তকেও আমরা পাঠ করি যে,

অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্ ॥

ইহা 'আমার' বা 'তোমার' এই পার্থক্য শুধু ক্ষুদ্রচেতা মানবেরা করিয়া থাকে। যাঁহাদের মন উদার ও প্রশস্ত তাঁহারা সমগ্র সংসারকে আত্মীয় ভাবেন। "তোমার প্রতিবাসীদের ভালবাস"—ইহাই কি যীশুখৃষ্টের শিক্ষা নয়? তোমার প্রতিবাসী ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, খৃষ্টান, মুসলমান অথবা যে কোন ধর্মের লোক হউক্ না কেন, তাহাকে ঠিক নিজের মত দেখিতে হইবে। মানুষ আপনাকে যেমন ভালবাসে, অপরকেও ঠিক সেইরূপ ভালবাসিবে। ইহাই আমাদের ধর্ম। সার্বজনীন ধর্মের এই

১। গীতা ৫।১৮

আদর্শ পরিহার করিয়া যদি আমরা ব্যবসায়বুদ্ধি ও বাণিজ্য-বাদের মোহে মত্ত হইয়া সে উদ্দেশ্যে অর্থকরী বিদ্যার চর্চা করি তাহা হইলে কি উহাকে শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ বলিতে পারা যায়? শিক্ষাব্যাপারে এবং সার্বজনীন ধর্মের আসনে অর্থনীতি ও ব্যবসায়বুদ্ধিকে প্রতিষ্ঠিত করা মনুষ্যত্বের অধোগতির পরিচায়ক। বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার প্রত্যেক বিভাগে আমাদের জাতীয় আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ধর্ম বলিতে আমি এখানে প্রতিমাপূজা বা প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধবাদী কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মের কথা বলিতেছি না। আমি বলিতেছি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল সাম্প্রদায়িক ধর্মের মধ্যেই অন্তর্নিহিত একটি সার্বজনীন ধর্মভাব বিদ্যমান। সকল বিশেষ বিশেষ ধর্মের মধ্যে অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় প্রকৃত সত্য বিদ্যমান। ইহা নাম ও আকারহীন। এই নাম ও আকারের অতীত বিশ্বধর্মকে আমাদের প্রচার করিতে হইবে।

বিধিব্যবস্থা, মতবাদ ও ক্রিয়াকাণ্ড প্রভৃতি ধর্মের গৌণ বিভাগগুলির ভিতর অল্প-বিস্তর প্রভেদ দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ পোষাক-পরিচ্ছদের কথা ধরুন। যেমন আমি মাথায় পাগড়ী পরিধান করিলাম অপরে টুপী, ফেজ্ বা অন্য কিছু ব্যবহার করিলেন। এই বিভিন্নতার দরুন ঈশ্বরের স্বরূপ বা আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না। এজন্য সাম্প্রদায়িক ধর্মের আদর্শে শিক্ষাপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত না হইয়া সার্বজনীন ধর্মের আদর্শে উহা বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত। তাহা না হইলে এই শিক্ষা মনুষ্যত্বের অধোগতির কারণ ও নিদর্শন হইয়া দাঁড়াইবে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য পরিপূর্ণতা লাভ। ইহাই শিক্ষার চরমলক্ষ্য। বেদে দুই প্রকার বিদ্যার উল্লেখ আছে: পরা ও অপরা। অপরা বিদ্যা প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যাখ্যা ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার নির্দেশ করিয়া থাকে। পরাবিদ্যা অর্থে যাহা দ্বারা মানব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে। তাই ব্রহ্মজ্ঞানকে পরা বিদ্যা বলে। অপরা বিদ্যার ইহা লক্ষ্য হওয়া উচিত, আর সেজন্য আমরা জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা করিয়া থাকি। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহের মূল-উপাদান কি রাসায়নিক পরীক্ষাগারে আমরা উহার গবেষণা করিয়া থাকি। পৃথিবীর কিরূপে সৃষ্টি হইল তাহা নিরূপণের জন্য আমরা পদার্থবিদ্যা (Physics) ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-সমূহের আলোচনা করিয়া থাকি। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবকোষ হইতে কিরূপে দেহের সৃষ্টি হইল, কিরূপে শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রসমূহ কার্য করিতেছে, কিরূপেই বা উহারা সমান ও সুসঙ্গতভাবে পুষ্ট হইতেছে, আমরা শরীরবিজ্ঞান (Anatomy) হইতে এই সকল তত্ত্ব শিক্ষা করি। উদ্ভিদ্-জীবনের গবেষণা করিয়া বৈজ্ঞানিক মনীষী আচার্য জগদীশ-চন্দ্রের অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের কথা আপনারা নিশ্চয় শুনিয়াছেন। তিনি বলেন বিশ্বব্যাপী একটি মাত্র প্রাণশক্তি আছে। আমাদের মধ্যে যে প্রাণশক্তি আছে গাছপালা এমন কি এক গুচ্ছ তৃণেও উহাই বিদ্যমান। আমাদের ন্যায় উহারাও আহার করে ও নিদ্রা যায়। খনিজ, উদ্ভিজ্জ ও জীব জগতে নিম্ন হইতে উত্তোরত্তর উচ্চস্তরেও এই প্রাণের ক্রমবিকাশ দেখা যায়। জ্ঞানের পরিপূর্ণতা সাধনে এই সকল বিষয় আমাদের শিক্ষা করিতে হইবে।

এইরূপ পদ্ধতিতে দেহ গঠিত করিতে হইবে যেন আমাদের স্নায়ু ও পেশীসমূহ ইস্পাতের ন্যায় সহনশীল ও লোহের মতে কঠিন ও দৃঢ় হয়। তাহা হইলেই আত্মজয়ের নিমিত্ত মনেরও গঠন আরম্ভ হইবে। তখনই আমরা বাসনারূপ রিপুর অধীনতার পাশ ছিন্ন করিতে পারিব। মনোবিজ্ঞান হইতে শিক্ষা লাভ করি যে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও আত্মসংযম আমাদের আদর্শ। পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত মনোবিজ্ঞানে (psychology) psyche বা আত্মার স্থান নাই। হিন্দু-মনোবিজ্ঞান উহা হইতে অনেক উন্নত। আমাদের এমনভাবে মনকে শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে সর্বব্যাপক আত্মার উপলব্ধি হয় ও সৃষ্টিবৈচিত্র্যের আপাতপ্রতীয়মান বহুত্বে একত্বের জ্ঞান হয়। বহুত্বে একত্বের প্রতিপাদনই প্রকৃতির ধারা। শিক্ষার দ্বারা আমাদের এই ধারার আবিষ্কাব করিতে হইবে। তাহা ছাড়া কোন্‌টি অনন্ত, কোন্‌টি সান্ত, কোন্‌টি পরিবর্তনশীল, কোন্‌টি অপরিবর্তনীয় তাহাও আমাদের হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। এ' সকল সংযতচিত্ত ও আদর্শ শিক্ষাপ্রাপ্ত ধীর বুদ্ধির কার্য।

প্রকৃত শিক্ষার ব্যাপারে নৈতিক শিক্ষার একটি স্থান থাকা চাই। সমগ্র নীতিবিজ্ঞান (ethics) ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত। যে ভালবাসা বা প্রেম নিঃস্বার্থ তাহা সকলের মধ্যে একত্বের ভাব প্রতিপাদন করে। প্রেমাস্পদের সহিত এক হইয়া যাওয়াই ভালবাসা, নচেৎ উহাকে ভালবাসা বা প্রেম বলা যায় না। প্রেমের অর্থ সমানভাবে ভাবিত দুইটি হৃদয়ের বিনিময়। একই সুরে বাঁধা দুইটি বাদ্যযন্ত্রের মতো একের স্পর্শে অপরটি বাজিয়া উঠে। প্রেমিকের চিন্তা ও ধারণা

প্রেমাস্পদের মনে সংক্রমিত হইয়া যখন অনুরূপ চিন্তা ও ধারণার উদ্রেক করে তখনই বুঝিতে হইবে তাহাদের প্রেম সত্য এবং তাহারা মনে ও প্রাণে এক। প্রকৃত প্রেমে স্বার্থপরতার স্থান নাই। প্রেমিক প্রেমাস্পদের জন্য নিজের সমস্ত উৎসর্গ করিতে পারে, কারণ সে জানে তাহার সর্বস্বই প্রেমাস্পদের। সে বলেঃ "বন্ধু তোমার প্রয়োজন আমার অপেক্ষা অধিক। আমার যাহা-কিছু সবই তোমার"। বিশ্বমানবতার বিরাট ব্যক্তিত্বে আমাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব ডুবাইয়া দেওয়াই নৈতিক শিক্ষার আদর্শ। শিক্ষার্থীরা যখন মন ও বুদ্ধির সীমা অতিক্রম করিয়া একমাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্বে উদ্বুদ্ধ হইয়া "আমি ও আমার বিশ্বপিতা অভিন্ন" এই মহাসত্যের উপলব্ধি করিতে পারে তখনই আধ্যাত্মিক শিক্ষা চরমলক্ষ্যে পৌঁছে। যীশুখৃষ্টের ন্যায় দিব্যশক্তি সকল মানুষে সুপ্ত। প্রত্যেক মানব ঈশ্বরের অংশ বা স্বরূপ। সকলেই ব্রাহ্মণত্বের অধিকারী। মানবের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাসরূপ মূলতত্ত্বের উপর যে শিক্ষাপ্রণালী স্থাপিত তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে আমাদের সামাজিক জীবনে শিক্ষার ঐ আদর্শের প্রয়োগ কিরূপে সম্ভব? আমি বলি উহাতে অসম্ভব কিছুই নাই। মনের সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া বহুত্বের ভিতর একত্বরূপ আদর্শকে আমাদের সামাজিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে দুইটি মুখ যেমন কখনও একই প্রকারের হয় না, দুইটি মনও সেরূপ এক নয়। তোমার

পথ ঈশ্বর-কর্তৃক নির্দিষ্ট আছে এবং আমাকেও উহা মানিয়া লইয়া সহিষ্ণু হইতে হইবে। তোমার পথই তোমায় উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি আনিয়া দিবে। বাগানে বিভিন্ন শ্রেণীর বৃক্ষের মধ্যে কেহ কি দুইটিকে একই প্রকার দেখাইবার বা একই ফল উৎপন্ন করাইবার জন্য চেষ্টা করে? না, তাহা করে না, কারণ তাহা হইলে বাগানের সমস্ত বৃক্ষ নষ্ট হইয়া যায়। এই পৃথিবী যেন একটি বাগান ও প্রত্যেক মানব এক একটি বৃক্ষ প্রত্যেককে তাহার নিজের মতো করিয়া বাড়িতে ও ফলদানের অবসর দেওয়া আমাদের আদর্শ। একজন কেন অপরের শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতির অন্তরায় হইবে? নিষেধের হাত সরাইয়া ও প্রতিবন্ধকের বেড়া অপসারিত করিয়া লও। চারিপার্শ্বে যথাযোগ্য অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি করিয়া তাহাকে অবাধ স্বাধীনতায় বাড়িতে দাও, দেখিবে সে সর্বোৎকৃষ্ট ফল দান করিবে। বৃক্ষ যেমন যথাযোগ্য আলোক, উত্তাপ, ভূমি জল ও বাতাস প্রভৃতির সাহায্য ছাড়া সুফল দান করিতে পারে না, পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল না হইলে মানব তেমনি উন্নতি লাভ করিতে পারে না। মানবকে জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শের বিকাশে সহায়তা করিতে হইলে তাহাকে যথাযোগ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার বেষ্টনীর মধ্যে রাখিতে হইবে। ইহাই আমাদের কর্তব্য। চণ্ডালকে অনেকে ঘৃণা করে। কিন্তু ভাবিয়া দেখে না কেন সে আজ চণ্ডাল। কেই বা তাহার এরূপ অবস্থার জন্য দায়ী। আজ তাহাকে ব্রাহ্মণের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে রাখিয়া দিন, দেখিবেন কাল সে ব্রাহ্মণ হইবে। সে আবর্জনা-

স্তূপের মধ্যে বাস করে বলিয়া তাহার দোষ দিবেন না। সর্বনিকৃষ্ট শ্রেণীতে ফেলিয়া তাহাব চারিপার্শ্বে অধোগতির আবেষ্টনী দিয়া আপনারাই তাহাকে ঐ অবস্থায় আনিয়াছেন ও আবার আপনারাই তাহাকে ঘৃণা করেন। দোষী সে নয়, দোষী বরং সমাজের নেতারা। সমস্ত দোষ নিজেদের স্কন্ধে লইয়া তাহাদের সংশোধন করিয়া সভ্য ও সাধু করিয়া তুলুন। যোগ্য শিক্ষা, দীক্ষা, ও ভালবাসা দান কবিয়া তাহাদের নিজের পায়ে দাঁড়াইবার সুযোগ-সুবিধা দিন। আমেবিকার যুক্তরাজ্যের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি এব্রাহাম লিঙ্কন (Abraham Lincon) দাসত্বপ্রথা রোধ করেন। তিনি একবাব ওয়াশিংটন সহরের রাজপথে এক বন্ধুর সহিত ভ্রমণ করিবার সময় দেখিতে পান যে, একটি গুব্‌রে পোকা চিৎ হইয়া পড়িয়া উপুড় হইবাব চেষ্টা করিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ উহাকে ধরিয়া সোজা করিয়া বসাইয়া দেন এবং বন্ধুর প্রশ্নের উত্তরে বলেনঃ "আমি বেচাবাকে পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে সাহায্য করিলাম"। আমি আশা করি আপনারা পতিত, দুর্গত ও অসহায় মানবদের উপব অত্যাচার বা ঘৃণা না করিয়া এবং তাহার দোষ না দেখিয়া এব্রাহাম লিঙ্কনের মতো সুযোগ-সুবিধা দানে তাহাদিগকে তাহাদের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে সাহায্য করিবেন এবং তাহাদের ঠিক নিজের মতো ভালবাসিবেন। স্কুল ও কলেজে এইরূপ শিক্ষার প্রবর্তন করিলে শিক্ষকমণ্ডলীর সম্মুখে সকলেই শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিবে এবং তাঁহারাও তদলঙ্কৃত পদের উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। ঈশ্বরও এইরূপ মানবপূজায় পরমসন্তুষ্ট হইবেন। মানবসমাজেব বাহিরে

কোথায় ঈশ্বরকে খুঁজিয়া পাইবেন? ঈশ্বর মেঘের উপর আসীন হইয়া নাই। তিনি সর্বদা সর্বত্র বিরাজিত। আপনাদের মুখমণ্ডলে আমি তাঁহার পবিত্র প্রকাশের দীপ্তি ও প্রতিচ্ছবি দেখিতেছি। তিনি সর্বব্যাপী ও বিরাট পুরুষ। তিনি "সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ,"—তাঁহার অসংখ্য চক্ষু, অসংখ্য কর্ণ, অসংখ্য হস্ত ও অসংখ্য পদ। তিনি সমস্ত চক্ষু দিয়া দেখেন সমস্ত কর্ণ দিয়া শ্রবণ করেন এবং সমস্ত মন দিয়া চিন্তা করেন। ঈশ্বর আধ্যাত্মিকতার ঘনীভূত জ্যোতির্ময় প্রকাশবিশেষ। সমষ্টি হইতে ব্যষ্টিকে পৃথক করিলে ব্যষ্টির সহিত জগতের ও মানবের সহিত ঈশ্বরের সকল সম্বন্ধ নষ্ট হইয়া যায়। স্ত্রী ও পুরুষ সকলের ভিতরে ভগবানকে মূর্ত্ত দেখিতে শিক্ষা করিয়া তাহাদের শ্রদ্ধা করা ও ভালবাসা উচিত। স্ত্রীলোকের ও পুরুষের সমান অধিকার ও সমান সুবিধা থাকা কর্তব্য। শিক্ষার আদর্শ এক এবং এইরূপই জগতের সর্বশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। এইরূপ হইলেই সর্বমানবের সুপ্ত আত্মার অনুভূতি হইবে। শিক্ষার ইহাই আদর্শ শিক্ষা অর্থকরী বা স্ত্রী-পুরুষের অধোগতিব সহায়ক হইয়া যেন না দাঁড়ায়, কেননা সার্বজনীন কল্যাণে আত্মার উন্নতিসাধনই প্রকৃত শিক্ষা। এই আদর্শ শিক্ষা লাভ করিলে মানব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং ইহাই মানবজীবনের ও শিক্ষার আদর্শ। জগৎ এই শিক্ষায উপকৃত হইবে। আমি সেই শুভদিনের প্রতীক্ষাই করিতেছি যখন ভারতের উচ্চ ও প্রাথমিক স্কুল ও কলেজসমূহ এই পবিত্র আদর্শে শিক্ষা দিবার সুযোগ পাইবে। তখনই ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে এবং তখনই আমরা ইহলোক ও পরলোকে পরম সুখ ও শান্তি উপভোগ করিব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ ব্যবহারিক শিক্ষা ॥

সভাপতি মহাশয় এবং কুয়ালালামপুর নিবাসী ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ, আমি এই উপলক্ষে আজ এখানে উপস্থিত হইবার সুযোগ পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। সাত বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ের এরূপ উন্নতি দেখিয়া আমিও আনন্দিত হইয়াছি। স্বামী বিদেহানন্দের পরিচালনায় ইহা বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। আপনারা বোধহয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, অল্পবয়স্ক বালক ও বালিকারা কী নিপুণতার সহিত গান গাহিয়াছে ও কবিতা আবৃত্তি করিয়াছে। যদি তাহাদিগকে বিদেশীয় ভাষায় এই সকল অভিনয় করিতে হইত তাহা হইলে আমার মনে হয় না যে আপনারা কিংবা তাহারা ইহাতে এতটা আনন্দ লাভ করিতে পারিতেন। কারণ মাতৃভাষা অপেক্ষা আমাদের নিকট প্রিয়তর আর কিছুই নাই। মাতৃভাষা ও মাতৃভূমিকেই আমরা সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মান করি ও ভালবাসি।

"মাতৃভাষা"-শব্দের অর্থ কি তাহা আপনারা জানেন? কেবল যে জন্মের পরে তাহা নহে, জন্মের পূর্বে মাতৃ-গর্ভে অবস্থান কালেও যে ভাষা শিশুগণ তাহাদের জননীর নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করে তাহাই 'মাতৃভাষা'। মাতৃ-গর্ভে বাসকালে শিশু তাহার জননীর সমস্ত চিন্তার ও ভাবের

ধারা উত্তরাধিকারীরূপে মাতার নিকট হইতে লাভ করে। যে ভাষায় জননী কথা বলেন, শিশুও সেই ভাষাতে সেই সমস্ত চিন্তা করিতে শিক্ষা করে। আপনারা অবশ্যই স্মরণ রাখিবেন যে, ভাষার সাহায্য ব্যতীত আমাদের সকল রকম চিন্তা প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়। কোনও বিষয় চিন্তা করিবার সময় একান্তরূপে ভাষার প্রয়োজন হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যদি আপনি এই টেবিল-সম্বন্ধে চিন্তা করেন তাহা হইলে আপনাকে মনে মনে "টেবিল," "টেবিল", "টেবিল" শব্দটি বার বার উচ্চারণ করিতে হইবে। চিন্তার সহিত বাক্যের এক নিত্য সম্বন্ধ আছে। ভাষাবিজ্ঞান (philology) হইতে আমরা জানিতে পারি এখানেই শিশুর চিন্তাশক্তির অব্যক্ত গোপন তথ্য জানিতে পারা যায়। শিশুকেও অবশ্য বাক্যের সাহায্যে চিন্তা করিতে হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে কোন্ বাক্যগুলি শিশুর পক্ষে উচ্চারণ করা সর্বাপেক্ষা সহজ। বিদেশী ভাষার পরিবর্তে যে বাক্যগুলি সে তাহাব মাতার নিকট শিক্ষা করিয়াছে সেগুলি উচ্চারণ করাই তাহার পক্ষে অতীব সহজ। কারণ জননী শিশুর সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রকে ও মস্তিষ্কের সমস্ত কোষগুলিকে গঠন করেন। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই নয়, শিশুর জন্মের পূর্ব হইতে অর্থাৎ মাতৃগর্ভে থাকার সময়েই তাহার স্নায়ুরাশি ও মস্তিষ্কের কোষগুলি গঠিত হয়। সেইজন্য মাতৃভাষাই আমাদের নিকট সর্বপ্রথম শিক্ষণীয় ভাষারূপে পরিগণিত। সুতরাং আপনারা নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটিকে অবহেলা করিবেন না। সভাপতি মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন যে, শিক্ষার ব্যাপারে মাতৃভাষাকে

উপেক্ষা করিলে কিরূপে আপনাদের বিচারবুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হইবে ?

এখন আমি আপনাদের নিকট ইংরাজীভাষায় কথা বলিতেছি। উনত্রিশ বৎসর পূর্বে (১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে) ভারতবর্ষ হইতে পাশ্চাত্যদেশে যাইবার আগে আমি কখনও ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করি নাই। কিন্তু যখন আমি ইংলণ্ডে বক্তৃতা দিতেছিলাম তখন অনেক ইংরাজ বলিতেন আমি তাঁহাদের অপেক্ষা ভাল ইংরাজী বলিতে পারি। সে সময়ে ইংরাজীভাষার উচ্চারণপদ্ধতি আমার ভাল জানা ছিল না। ইংরাজরা কীভাবে তাঁহাদের ভাষার শব্দগুলি উচ্চারণ করেন তাহা আপনারা জানেন। যখন তাঁহারা কথা বলেন তখন তাঁহারা তাঁহাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক প্রকার পদ্ধতিতে কথা বলেন এবং তাঁহাদের ঠোঁট দুইটিকে বন্ধ রাখেন। ভাষার উচ্চারণজ্ঞান সম্বন্ধে ইংরাজেরা এতই গর্বিত যে, তাঁহাদের খুসী অনুযায়ী ভাষাকে তাঁহারা মোচড় দিয়া থাকেন। ইহাতে শুনিবার দিক্ দিয়া সে সমস্ত শব্দ যতই খারাপ হউক্ না কেন, তাঁহারা সেই সব গ্রাহ্য করেন না। কিন্তু কোন ইংরাজের কথাবার্তার সময়ে তাঁহার ইংরাজী-উচ্চারণের পদ্ধতি লক্ষ্য করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, তিনি একজন ইংল্যাণ্ডবাসী। ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন দেশে আপনারা গমন করুন এবং মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করুন ঐসব বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীদের অনেকে কীভাবে কথা কহিতেছে। যদি আপনারা আরও কয়েক মাইল অতিক্রম করিয়া ওয়েল্স্ (Wales) দেশে কিম্বা স্কটল্যাণ্ডে গমন করেন তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেকের

উচ্চারণপদ্ধতির মধ্যে কোন-না-কোন প্রকার পার্থক্য দেখিতে পাইবেন। স্কটল্যাণ্ডে এই পার্থক্য আরও বেশী। সেখানকার কোন লোক বলিবে সে "চার্-র্-চে" (church) যাইবে। লণ্ডননিবাসী ইংরাজগণেব উচ্চারণ আর এক প্রকার। আবার যাঁহারা লণ্ডন সহরের বাহিরে থাকেন তাঁহাদের উচ্চারণ অন্য প্রকাব। লণ্ডনের বাহিরে যে উচ্চারণবিধি প্রচলিত তাহাকে কক্‌নি (cockney) বলে। যদিও আপনি ইংরাজী বুঝিতে পারেন তবুও ঠিক ঐ প্রকারের উচ্চারিত ভাষা বুঝিতে পারিবেন না। অতএব ইংরাজীভাষায় ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ ও ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্টতা আছে। আমি ঐ প্রকার উচ্চারণপদ্ধতি ত্যাগ করিয়াছি। আবার আমেরিকাতে সেখানকার লোকদেরও নিজস্ব উচ্চারণের ভঙ্গিমা আছে। তাহার ধ্বনি অনুনাসিক। আমেরিকাবাসীদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উচ্চারণভঙ্গিমা (nasal) আমার আয়ত্তে নাই। আমি আমার মাতৃভাষায় আমার চিন্তাশক্তিকে বর্দ্ধিত ও বিকশিত করি।

পাশ্চাত্য দেশে গমন করিবার পূর্বে আমি কয়েক বৎসর ধরিয়া সংস্কৃতভাষায় বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতাম। সে সময়ে সংস্কৃতচর্চাতে আমার অধিকাংশ সময় ব্যয় হইত। সেই সময় আমি যদি সংস্কৃতভাষায় শাস্ত্রাদি পাঠ না করিতাম তাহা হইলে বিদেশী ভাষায় এত সুন্দরভাবে কথা কওয়া আমার পক্ষে অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার হইত। কারণ ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় সংস্কৃতই ইংরাজীভাষার জননী। ইংরাজীভাষার বহু শব্দকে সংস্কৃত ভাষায় খুঁজিয়া পাওয়া যায়। সংস্কৃতই হইল মূল-

ভাষা এবং যদি আপনারা সংস্কৃত ভাষাকে অবহেলা করেন তবে জগতের মূলভাষাকেই অবহেলা করা হইবে। আপনারা কি মনে করেন বৃক্ষের শিকড় অথবা মূলকে উচ্ছেদ করিয়া তাহার শাখা-প্রশাখায় জল সেচন করিলেই বৃক্ষটি বাঁচিয়া থাকিবে? না, ইহা কখনই হইতে পারে না। বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপারে মাতৃভাষাকে কখনই অবহেলা করা উচিত নয়। শিশুর মস্তিষ্ক এইরূপভাবে গঠিত হইবে যাহাতে সে তাহার মনোভাব প্রকাশের অবলম্বনস্বরূপ বাক্যের মূলকেন্দ্রকে সচল ও সক্রিয় করিতে পারে। স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্কের প্রতি লক্ষ্য করিলে আপনারা বুঝিতে পারিবেন মস্তিষ্কের মধ্যেই কথা কহিবার শক্তি ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া উঠে এবং তাহার মূলে অবশ্য চৈতন্যস্বরূপ আত্মা থাকেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে লোক প্রতিদিন নিয়মিতভাবে তাহার ডান হাতখানি ব্যবহার করে সে মস্তিষ্কের বামভাগে বাক্য-কেন্দ্রটিরই বিকাশসাধন করে এবং যে ব্যক্তি বাম হাতখানি ব্যবহার করে সে মস্তিষ্কেব ডানদিকে বাক্যকেন্দ্রের বিকাশ সাধন কবে। মানুষের মস্তিষ্ক দুইটি অর্দ্ধগোলকের আকারে বিভক্ত। দক্ষিণ হস্তের কেন্দ্রটি শরীরের বাম ভাগে এবং বামহস্তেব কেন্দ্রটি দক্ষিণভাগে অবস্থিত। আত্ম-চৈতন্যই বাক্যকেন্দ্রকে গঠন করে এবং ইহা প্রথম হইতে মাতৃভাষার সহিত সমতা রক্ষা করে। যাহা আপনাদের মাতৃভাষা নয়, বিশেষতঃ যাহা আপনাদেব মাতৃভাষাকে অবহেলা করিতে শিক্ষা দেয় এমন বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিয়া কি লাভ হইবে? মনে রাখিবেন যে, অন্তর্নিহিত ও নিজস্ব অর্জিত ভাবরাশি এবং চিন্তাধারার উপরেই

আপনাদের সমগ্র জীবন ও পারিবারিক ব্যাপারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

যিনি যে রকম স্তরের লোকই হউন্ না কেন, প্রত্যেক ব্যক্তিরই একটি বিশিষ্ট চিন্তাপ্রণালী আছে। সেই চিন্তা তিনি তাঁহার মনের মধ্যে রাখিয়া দেন এবং বাক্যের সাহায্যে তাহা বাহিরে প্রকাশ করেন। এইজন্য মাতৃভাষাতেই আপনাদের সমস্ত-কিছু ভাবিতে ও কল্পনা করিতে শিক্ষা করা উচিত। তাহা না হইলে স্বাভাবিকভাবে আপনাদের চিন্তাশক্তি বিকশিত হইবে না। য়ুরোপে ভিন্ন ভিন্ন জাতি বাস করে। সুইজারল্যাণ্ডে প্রত্যেক ব্যক্তিকে পাঁচটি বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করিতে হয়। আপনারা জানেন সুইজারল্যাণ্ড মধ্যয়ুরোপের অন্তর্গত একটি দেশ। সুইজারল্যাণ্ডে নানা ভাষায় কথাবার্তা বলে এমন সমস্ত লোকের বাস। আশে-পাশে নানাদেশ সুইজারল্যাণ্ডকে বেষ্টন করিয়া আছে। ইহার একদিকে জার্মানী এবং অন্যান্যদিকে অষ্ট্রিয়া, ইটালী এবং ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ। এই সকল প্রদেশ ইংরাজের বাণিজ্য-ব্যাপারেই ব্যবহৃত হয়। বাজারে জিনিষ কেনাবেচার জন্য সুইস্‌দের ইংরাজীভাষা লিখিতে হয় আর সেজন্য সুইস্ বালককে সর্বপ্রথম সুইস্‌ভাষা শিক্ষা করিতে হয়। তাহার পর জার্মান, ফরাসী, ইটালীয় এবং ইংরাজী ভাষাও তাহাকে জানিতে হয়। কোন বিদেশীয় ভাষা শিখিবার পূর্বে একজন জাপানীকেও তাহার মাতৃভাষা প্রথম আয়ত্ত করিতে হয়। ঠিক এইভাবেই একজন ইংরাজ বালক বা বালিকাকে সর্ব-প্রথমে ইংরাজী ভাষা শিখিতে হয়। বর্তমানে জগতে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে ইংরাজী ভাষাতে বিভিন্ন

জাতিদের মধ্যে কথাবার্তা ও চিঠিপত্র লেখা হয়। ইংরাজীতে কথাবার্তা কহিতে পারিলে যে কোন লোক সহজেই পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে পারে। অবশ্য ভারতবাসী আমাদের পক্ষে ইহা এক্ষণে আবার একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমানে আমরা ব্রিটিশজাতির অধীনস্থ প্রজা, ব্রিটিশ সরকারের চাকুরী করিয়া আমাদের অধিকাংশ ব্যক্তিকেই উদরান্নের সংস্থান করিতে হয়। অতএব বাধ্য হইয়া তাহাদের ভাষাতেই আমাদের কথা বলা শিক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমাদের নিকট ইংরাজী-ভাষা গৌণভাষা হিসাবে পরিগণিত হওয়া উচিত। যদি ইংরাজ-সরকারের চাকুরী করিয়া আমাদের জীবিকা উপার্জন করিতে না হইত তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে ইংরাজী-ভাষা শিখিতে হইত না। আমাদের মাতৃভাষা সংস্কৃত এবং ভাষা হিসাবে তাহা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। যে কোন য়ুরোপীয় ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃতভাষা প্রাচীন ও উত্তম। বিদেশীয় ভাষায় চিন্তা করিতে অভ্যস্ত হইতে যে কোন মানব-মনের সাধারণতঃ দুই বৎসর সময় লাগে। কিন্তু যে কোন লোক তাহার মাতৃভাষায় সহজেই চিন্তা করিতে পারে।

ভাষা হিসাবে ইংরাজীভাষা অসম্পূর্ণ এবং ইহার ব্যাকরণের নিয়মে নানা দোষ ত্রুটি দেখা যায়; কারণ ইংরাজীতে ব্যাকরণের অনেক নিয়মই সকল ক্ষেত্রে সমান-ভাবে লক্ষ্য করা হয় না। কোন বিদেশী ব্যক্তি ইংরাজী-ভাষা শিখিবার সময়ে তাহা অত্যন্ত দুরূহ বলিয়া অনুভব করেন। বাস্তবিক ইংরাজীভাষার কোন শব্দের সঠিক

উচ্চারণবিধি ও বাক্য-রচনাব নির্দিষ্ট নিয়ম সকল সময় দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব ভাষা হিসাবে ইহা অসম্পূর্ণই বলিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে "to" (টু) এই বাক্যে অক্ষব "o" যখন এক ভাবে উচ্চারিত তখন হয়, "go" (গো) এই বাক্যের অক্ষর "o" সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়। বিভিন্ন বাকা অনুযায়ী "o"-এর উচ্চারণেব তারতম্য ঘটিয়া থাকে। আবার আমরা "though" (দো) শব্দটি এক ভাবে উচ্চারণ করি এবং "cough" (কাফ্) শব্দ উচ্চারণ করি সম্পূর্ণ অন্য ভাবে। কোনও ফবাসী ব্যক্তি ও ইংরাজীভাষা শিখিবার সময়ে ইংরাজীকে অত্যন্ত কঠিন ভাষা বলিয়া মনে করেন। যদিও ইংরাজী ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে "low German" ভাষা হইতে তথাপি কোন জার্মাণ ভদ্রলোকও ইংরাজী শিখিবার সময় নানাপ্রকার অসুবিধা অনুভব করেন। "low German" হইতে প্রায় সমস্ত ইংরাজী কথারই সৃষ্টি হইয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যেমন জার্মানভাষার "wasser" ইংরাজী ভাষায় "water"-এ পরিণত হইয়াছে ; "S" এই অক্ষর "T" অক্ষরে পরিণত হইয়াছে। আবার ইংরাজী ভাষায় father, mother, brother, sister প্রভৃতি শব্দের ন্যায় অনেক শব্দ আছে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষা হইতেই এই সকল ইংরাজী শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। গ্রীসের এবং লাটিন দেশগুলির মধ্য দিয়া সংস্কৃত ভাষা ভারত হইতে বিস্তার লাভ করিয়াছিল এবং এইভাবে সকল অ্যাংলো-স্যাক্সন্ (Anglo-Saxon) ভাষাগুলির মধ্যে এই সংস্কৃত শব্দগুলি প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।

দৃষ্টান্তস্বরূপে এখানে কয়েকটি সংস্কৃতশব্দ ও ইংরাজীতে তাহাদের পরিবর্তিত রূপ দেওয়া হইল :

ইংরাজী	সংস্কৃত
Mother	মাতর্
Father	পিতর্
Brother	ভ্রাতর্
Daughter	দুহিতর্
Sister	স্বসর্
Serpent	সর্প
Path	পথ

অতএব দেখা যাইতেছে ইংরাজীভাষার মূলস্বরূপ আমাদের মাতৃভাষা সংস্কৃতকে যখন আমরা অবহেলা করি তখন আমরা একটি অপরিহার্য বিষয়েই ভুল করি। সত্যই আপনারা আপনাদের মাতৃভাষাকে অবহেলা করিতেছেন। ইংরাজীভাষার পরিবর্তে সংস্কৃতভাষাতেই নিজেদের সন্তানদের গড়িয়া তুলিবার আপনাদের চেষ্টা করা উচিত। জননীর নিকট হইতে প্রাপ্ত নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন চিন্তা-ধারাযুক্ত বিদেশীয় কথায়, বিদেশীয় অভিধানে এবং বিদেশীয় ভাবে শিশুর মনকে ভারাক্রান্ত করিবার প্রয়োজন কী? বৈজ্ঞানিক যুক্তির সহায়ে প্রথম হইতেই পুত্রকন্যাদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষিত করিবার প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেক পিতামাতারই হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। মাতৃভাষাতেই অন্ততঃ পুত্রকন্যাদের শিক্ষার প্রাথমিক সূচনা করা উচিত। যেকোন ভাষাতত্ত্ববিদের নিকট গমন করুন, তিনি আপনাদের এই

কথাই বলিবেন। সুতরাং যে সকল পিতামাতা তাঁহাদের সন্তানদের মাতৃভাষাকে অবহেলা করিবার সুযোগ দেন তাঁহারা অত্যন্ত ভুল করেন। সাধারণতঃ এইজন্ম তাঁহারা তাঁহাদের সন্তানদের চিন্তাশক্তি বিকাশের দিক দিয়া অযোগ্য করিয়া তোলেন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য কী? যাহাতে ঠিকভাবে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া মানব প্রকৃতির সমস্ত নিয়মকে বুঝিতে পারে এবং কেবল স্থূল প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম নহে—মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিসম্বন্ধীয় নিয়মগুলিও বুঝিতে সমর্থ হয়, তাহাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। আপনারা কোন জিনিষ যদি চিন্তা করিতে সমর্থ না হন তাহা হইলে তাহার চিন্তাগুলিকেও ভাষায় প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইবেন। কিন্তু যখন আপনারা একটি ভাষায় আপনাদের মনের ভাবগুলিকে প্রকাশ করিতে পারিবেন তখন অন্য ভাষায়ও সেইগুলিকে প্রকাশ করিতে আপনারা সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দতা বোধ করিবেন। এই চেষ্টায় অভ্যস্ত হইলে ইংরাজীভাষায় কথা কহিবার দক্ষতা শিক্ষা করিতেও অল্প সময় লাগে। যে বয়সে আপনারা আপনাদের মাতৃভাষায় পঞ্চম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন তখন যদি আপনারা ইংরাজী বলিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে তাহাতে সফল হইবার জন্য আপনাদের অতি অল্পই সময় লাগিবে। যদি আপনারা আপনাদের মাতৃভাষায় চিন্তা করিতে অভ্যস্ত হইয়া থাকেন তাহা হইলে ইহা কঠিন বলিয়া মনে হইবে না। কেবল কোন-কিছু চিন্তা করা নয়, পরন্তু স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে অসমর্থ ও অচেতন ফোনোগ্রাফের (phonograph) মতো হওয়া হইল যেন

এখানকার স্কুল কলেজের শিক্ষার উদ্দেশ্য। শুধু অপরের চিন্তারাশিকে ধরিয়া রাখিতে অভ্যস্ত থাকা আপনাদের উচিত নয়, পরন্তু নিজস্ব চিন্তায় ভাবধারায় অপূর্বতা (originality) ও বৈশিষ্ট্য থাকা অবশ্য উচিত, আর ইহাই হইল শিক্ষাসম্বন্ধে প্রধান কথা। আমাদের চিরবরেণ্য ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখুন। তাঁহার মধ্যে আমরা পরিপূর্ণরূপে ভাব ও চিন্তা-রাশির অপূর্বতা দেখিতে পাই। তিনি কোনও স্কুল বা কলেজে অধ্যয়ন করেন নাই; কারণ তিনি কখনও ফোনো-গ্রাফের মতন অন্যের চিন্তাধারাকে নিজের মনে ধরিয়া রাখিবার উপযোগী অচেতন যন্ত্রের ন্যায় হইতে চাহেন নাই। যখন আপনারা কোনও গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন তখন আপনাদের মন লেখকের চিন্তাগুলিকেই নিজস্ব করিয়া ফেলে। আপনাদের অবশ্য জানা উচিত যে, ঐ সকল চিন্তা আপনাদের চিন্তাধারাকে ঐ পথে চলিতে সাহায্য করিবার জন্য সঙ্কেত মাত্র। প্রকৃতপক্ষে বাহিব হইতে আমরা কোন জ্ঞান লাভ করি না। শিক্ষার্থী শিশুর মস্তিষ্কে বাহির হইতে জ্ঞান ঢালিয়া দেওয়া যায় না। গ্রন্থসকল শুধু আমাদের জ্ঞানলাভের সঙ্কেত অর্জন করিতেই সাহায্য করে। গ্রন্থ-পাঠকে সেইজন্য পুষ্করিণীতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই প্রস্তরখণ্ডগুলি পুষ্করিণীতে পড়িয়া অনেকগুলি ক্ষুদ্রতরঙ্গ সৃষ্টি করে এবং তাহারাই ফলে প্রতিঘাতের উৎপত্তি হয়। এইরূপ যখন কোন শিশুর মনে একটি ইঙ্গিত (suggestion) ছাড়িয়া দেওয়া হয় তখন ইহা একটি প্রতিঘাত সৃষ্টি করে এবং ঐ প্রতিঘাতের ফলে শিশু যাহা আহরণ করে তাহাকেই "জ্ঞান"

বলে। জ্ঞানের সৃষ্টিস্থান জ্ঞানস্বরূপ আত্মায়। আমাদের আত্মা অনন্তের এক একটি প্রতিবিম্বস্বরূপ এবং সর্বজ্ঞ। নিখিল জ্ঞানরাশি অনাদিকাল হইতে আমাদের আত্মায় নিহিত। কিন্তু কী প্রকারে এই অসীম জ্ঞানকে বাহিরে প্রকাশ করিতে পারা যায় তাহার কৌশল আমরা জানি না। কিন্তু বিদেশী ভাষার অবলম্বনে শিক্ষার্থীর মনে জ্ঞানলাভের ইঙ্গিত (suggestion) দিয়া আপনারা ভুল করিতেছেন। কারণ মাতৃভাষায় শিক্ষার্থীর মনে জ্ঞানলাভের জন্য ইঙ্গিত (suggestion) দিলে তাহা যত সহজে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে বেদেশী ভাষায় দেওয়া ইঙ্গিতের দ্বারা সে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি তত সহজে হইবে না।

আমেরিকায় কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়গুলিতে (schools of Kindergarten system) সেখানকার শিক্ষানায়কগণ বালক-বালিকাদের শিক্ষাদানব্যাপারে এখন কি উপায় অবলম্বন করিতেছেন তাহা কি আপনারা জানেন ? সেই সমস্ত বিদ্যালয়ে তাঁহারা সাধারণভাবে প্রচলিত ইংরাজী অক্ষরের ব্যবহার করেন না। এই ব্যাপারে তাঁহারা সংস্কৃত-ভাষায় পরিলক্ষিত হিন্দুদিগের উচ্চারণ পদ্ধতিই গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন সংস্কৃতে আমরা "জী"—"ও" এই অক্ষরগুলি ব্যবহার করিয়া "গো" উচ্চারণ করিব না ; কারণ এরূপ পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত নহে। ইহা বৈজ্ঞানিক প্রণালী নহে এবং শব্দের প্রকৃত উচ্চারণবিধিসঙ্গতও নহে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলি অসম্পূর্ণ নহে। ব্যঞ্জনবর্ণের প্রত্যেক বর্গের প্রথম পাঁচটি অক্ষরকে (ক, চ, ট,

ত, প) দেখা যাক। এই অক্ষরগুলির প্রত্যেকটি জিহ্বা ও মুখের নানাপ্রকার ভঙ্গিমার জন্য উচ্চারণের সময়ে বিভিন্নরূপ ধ্বনিবিশিষ্টরূপে শোনা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যখন আপনি আপনার মুখ খুলিয়া স্বরবর্ণ ব্যতীত কণ্ঠগত ধ্বনি করেন তখন তাহারা পাঁচটি অক্ষর হয়, যথা ক, খ, গ, ঘ, ঙ। মুখ সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া কোন্ কোন্ শব্দ উচ্চারণ করা যায়? ঐ পাঁচটির মধ্যে মাত্র চারটি যেমন ক, চ, ট, ত উচ্চারণ করা যায়। সর্বশেষ অক্ষরটি 'প' ঠোঁট দুইটি বন্ধ করিয়া আবাব খোলা হয়। আবার মুখ বন্ধ করিয়া পুনরায় দন্তমূল হইতে যখন উচ্চারণ করা হয় ট, ঠ, ড, ঢ, ণ। পুনরায় আপনারা পাঁচটি ধ্বনি পান যেমন—প, ফ, ব, ভ, ম। এইগুলি কেবল ঠোঁটের সাহায্যে উচ্চারিত হয়। ইহা বিশেষরূপে একটি নিখুঁৎ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। ইংরাজী ভাষায় উচ্চারণের নিয়মাবলীকে অবহেলা করা হয়, যেমন "h" (এইচ্) উচ্চারিত হয় "হ" রূপে। এক্ষণে আমেরিকার কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়গুলিতে এই উচ্চারণপদ্ধতি গৃহীত হইতেছে যে, যে ধ্বনিগুলি হইতে উচ্চারিত হয় তাহাদের তাহাই বলা হইবে এবং ইহাই বিধিসঙ্গত পদ্ধতি। আমেরিকায় ইংরাজীভাষার সমস্ত গঠনভঙ্গিমা তাহারা পরিবর্তন করিয়া লইতেছে। যে কোন বাক্যের মধ্যে যে সমস্ত অক্ষর উচ্চারিত হয় না, যেমন hour (আওয়ায়) কথাটিতে "h" শব্দের উচ্চারণ হয় না সেইগুলিকে তাহারা বাদ দিতেছে। আমেরিকায় কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি অনুযায়ী কোনও বিষয়ে একটি শিশুকে শিক্ষা দিবার পূর্বে শিক্ষকগণ সেই শিশুর মন লক্ষ্য

করিয়া থাকেন। কোনও কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ে মৃত্তিকার তাল, পেন্‌সিল, শ্লেট প্রভৃতি কার্যকরী শিক্ষাদানের বিভিন্ন রকমের সাজসরঞ্জাম রাখা হয়। সেখানে অনেক ছবি এবং অক্ষরগুলির অনেক ব্লক্ আছে। শিশুদিগকে সেই গৃহে আনিয়া প্রশ্ন করা হয় যে বিড়াল, সর্প বা এই জাতীয় অন্য কোন্ প্রাণীর কিম্বা তাহারা আর কিসের মূর্তি গড়িতে চায়? ইহা হইল একটি পরীক্ষার কার্য। শিশুদিগকে কোন প্রকার শিক্ষা দিবার পূর্বে এইরূপ পরীক্ষা করা হয়। যদি কোন শিশুর ছবি আঁকিবার দিকে ঝোঁক থাকে তাহা হইলে তাহার বুদ্ধি ও কর্মশক্তিকে সেই দিক দিয়াই বিকশিত করিতে হইবে। যদি সঙ্গীতের প্রতি তাহার ঝোঁক থাকে তাহা হইলেই সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা হইবে তাহার প্রতিভা প্রকাশের পথ। আমাদের কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়গুলিতে যে শিক্ষা আপনারা পান তাহা যথার্থ প্রকৃতির শিক্ষা নহে। শিক্ষার এই বিরাট সমস্যাসম্বন্ধে আমি চিন্তা করিয়াছি। নিজেদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বর্জিত করিব ইহা আমরা চাই না। আমরা আমাদের মাতৃভাষাকে অবহেলা করিতে চাই না, অথচ শিক্ষালাভ আমাদের অবশ্য করিতে হইবে। সেইজন্য কার্যকরী বিদ্যার শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে আমি কলিকাতায় একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছি। সেখানে কেবল মাত্র দেহের, মনের এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধন করিয়াই নিরস্ত হওয়া চলিবে না। মানুষ যাহাতে প্রকৃতপক্ষে মহৎ জ্ঞানী, উন্নত এবং বিপুল অধ্যাত্মিক শক্তি-সম্পন্ন হইতে পারে ঐ প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের তাহাই একমাত্র লক্ষ্য হইবে। আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, আপনারা শিক্ষার

মূল এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব অনুভব করেন না। আপনারা নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। কি ভাবে খাওয়া উচিত এবং শরীরের উন্নতির জন্য কোন্ কোন্ খাদ্যের প্রয়োজন তাহা আপনারা জানেন না। কোন্ খাদ্য আপনাদেব চিন্তাশক্তিকে, মস্তিষ্ককে, মাংসপেশীগুলিকে, অস্থিকে এবং আপনাদের স্নায়ুকেন্দ্রকে সুগঠিত ও পপুিষ্ট করিবে তাহা আপনাদের জানা নাই, অথচ সে সমস্ত পদ্ধতি আপনারা আরও ভাল করিয়া না জানার দরুণ নিজেদের খেয়াল ও খুসীর বশে যে কোন খাদ্যই আপনারা খাইয়া থাকেন। আপনাবা মনে করেন যে, প্রচুর লঙ্কা খাইলেই আপনাদের কস্তিষ্ক শক্তিমান হইয়া উঠিবে। কিন্তু ইহার দ্বারা যে আপনারা আপনাদের পরিপাকশক্তিকে নষ্ট করিয়া ফেলিতেছেন তাহা আপনারা অবগত নহেন।

আপনারা ব্যবহারিক রসায়নবিজ্ঞানসম্বন্ধে এবং খাদ্য বিশ্লেষণের কি ফল তাহা জানেন না। রসায়ন-বিজ্ঞানকে প্রয়োগপদ্ধতির সহিত অধ্যয়ন করুন; অর্থাৎ সেই ব্যবহাবিক রসায়নশাস্ত্রেব সমস্তই অবগত হউন। কারণ ইহাতেই সমস্ত খাদ্যের মৌলিক উপাদানগুলি ঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। দেহের আয়তন বৃদ্ধির জন্য কোন্ কোন্ বাসায়নিক উপাদান প্রয়োজনীয়, কিংবা খাদ্যকে পরিপাক করিবার জন্য পাকস্থলী কত পরিমাণ অম্লরস (acid) ক্ষরণ করে তাহা আপনাদের জানা নাই। যদি আপনারা এমন খাদ্য গ্রহণ করেন যাহা পাকস্থলীতে পরিপাকের রসক্ষরণকার্যে বাধা দিবে তাহা হইলে আপনারা ভুক্ত খাদ্য হজম করিতে পারিবেন না। পাকস্থলীর রসক্ষরণ-

ক্রিয়াকে যদি প্রবল করা হয় তাহা হইলে মিথ্যা ক্ষুধার (false appetite) সৃষ্টি হইবে। মিথ্যা ক্ষুধা একটি ব্যাধিবিশেষ। এই রোগে সকল সময়েই খাইবার ইচ্ছা জাগিয়া থাকে। বহু ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত হন। এই কারণে কার্যকরীবিদ্যা শিক্ষা করা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। নিজের শরীরসম্বন্ধে কিংবা ইহাকে কী প্রকারে সুস্থ রাখিতে হয়, অথবা ইহাকে কী উপায়ে রোগের বীজাণুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করা যায়, সেই সম্বন্ধে আপনাদের বিশেষ-কিছু জানা নাই। কী প্রকার জল কোন্ ধাতুনির্মিত পাত্রে পান করা উচিত সে বিষয়েও আপনারা অজ্ঞ। যে সকল ধাতুনির্মিত পাত্র হইতে আপনারা ভাল জল পান করেন, আমি লক্ষ্য করিয়াছি আপনারা সেইগুলি ভাল করিয়া পরিষ্কার করেন না। প্রত্যেক বারই সেগুলিকে পরিষ্কার করা উচিত এবং বিশেষভাবে সে গুলিকে মাজিয়া ফেলা উচিত যাহাতে তাহার মধ্যে কোন ময়লা না থাকিতে পারে। কারণ ভগবদ্ভক্তির পরেই পরিচ্ছন্নতার স্থান। জলে নানাপ্রকার রোগের বীজাণু থাকে। কেবল মাত্র কার্যকরী (practical) বিদ্যা হইতে এই জ্ঞান লাভ করা যায়। এই কার্যকরী বিদ্যাই আমাদের বালক ও বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। স্বাস্থ্যরক্ষাসম্বন্ধেও তাহাদের নিশ্চয়ই শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। পুষ্টিকর খাদ্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া বিদ্যালয়ে টাঙাইয়া রাখুন। সর্বপ্রকার খাদ্যের রাসায়নিক উপাদানগুলির বিস্তারিত বিবরণ ইহা হইতে জানা যাইবে। খাদ্য হিসাবে চাউল সর্বোৎকৃষ্ট। দেহের,

মনের এবং চিন্তাশক্তি বিকাশের গুণগুলি ইহাতে নিহিত আছে। ইহাতে সেগুলি সবই পাওয়া যায়। কিন্তু ছাঁটাই করা চাউলে সে গুণগুলি থাকে না। এজন্য চাউলকে ছাঁটাই করা উচিত নয়, কারণ ছাঁটাই করা চাউল পুষ্টিকর নয় বলিয়া ইহা খাওয়াও উচিত নহে। চাউল ছাঁটাই করিলে চাউলের খাদ্যপ্রাণ (vitamin) নষ্ট হইয়া যায়। জাপানের লোকেরা পূর্বে ছাঁটাই করা চাউল খাইত। ফলে ভীষণ বেরীবেরী রোগে তাহারা আক্রান্ত হইত। ভাত খাইলে আপনার মস্তকের কেশরাশির সুন্দর বৃদ্ধি হইবে। যাহারা ভাত খায় না তাহাদের মাথার চুল উঠিয়া গিয়া ক্রমশঃ টাক্ পড়িয়া যায়, অথবা মাথা একেবারে কেশহীন হইয়া পড়ে। যদি আপনি ইংরাজী ধরণেব খাদ্য খাইতে আরম্ভ করেন অথবা ইংরাজদেব পদ্ধতি মতো আহার করেন তাহা হইলে শীঘ্রই দেখিবেন আপনার পরিপাক-শক্তি মাংস হজম করিবার পক্ষে উপযুক্ত নয়। স্বাস্থ্যের প্রতিকূল খাদ্য খাওয়ার ফলে আপনারা শীঘ্রই অসুস্থ হইয়া পড়িবেন। গোমাংস বা শূকর-মাংস খাইবার জন্য আপনাদের পাকস্থলী অভ্যস্ত হয় নাই। আপনারা আপনাদের খাদ্য, রুচি এবং পাকস্থলী আপনাদের পিতৃপুরুষদিগের নিকট হইতে পাইয়াছেন ; যদি আপনারা আপনাদের অভস্ত্য খাদ্য ত্যাগ করেন তাহা হইলে আপনারা অসুস্থ হইবেন এবং নানাপ্রকার রোগে আক্রান্ত হইবেন। ইচ্ছা হইলে নিরামিষ খাদ্য খাইতে পারেন। কারণ অন্য লোকেরা মাংস খাইষা যে পুষ্টি লাভ করে শাকসব্জী হইতে আপনারা সেই পুষ্টিই লাভ করিতে পারিবেন। ব্যক্তিমাত্রের পক্ষে মাংসভোজন আবশ্যকীয়

নহে। আপনারা মাংস খাইতে আরম্ভ করিলেই আপনাদের মনে সুরাপানের ইচ্ছা জাগিবে। যাহারা মাংসভোজী, তাহারা মদ্যপানের অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারে না এবং এইজন্য আহার ও ইন্দ্রিয়সংযমেও অসমর্থ হয়। সেইজন্য আমেরিকাতে যে সকল স্থানে মদ্যপান নিষিদ্ধ সেই সকল স্থানে নিরামিষ ভোজনে লোকেদের উৎসাহিত করা হয়। তাহারা দেখিয়াছে যে ছোলা, মোটর, অন্যান্য শাকসব্জী, আটা এবং চাউল হইতে প্রয়োজনীয় সমস্ত খাদ্যেরই উপাদান পাওয়া যায়।

বন্ধুগণ, আপনারা এমন এক দেশে বাস করিতেছেন যেখানে বহির্জগতের বিরাট পরিবর্তনগুলিকে আপনারা দেখিতে পান না। প্রাচীন ঋষিদের নিকট হইতে আমরা উত্তরাধিকারীসূত্রে শিক্ষার যে মূল নীতিগুলি পাইয়াছি তাহাদেরই অবলম্বন করিয়া জগতের নানা পরিবর্তন ঘটিতেছে। আর একটি বিষয় আপনাদের নিকট বলা আমি অতি অবশ্য সঙ্গত বলিয়া মনে করি। দেহের প্রয়োজনগুলিই বা কী ইহা জানা আমাদের আবশ্যক। আমাদের শিক্ষা যে কেবল স্বাস্থ্যতত্ত্ব মনস্তত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব জানিতে আমাদের সাহায্য করিবে তাহা নহে, ইহা আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলিকেও বুঝিতে সমর্থ করিবে। গ্রীষ্ম বর্ষা প্রভৃতি ঋতুগুলির পরিবর্তন কী প্রকারে হইতেছে তাহা আপনারা জানেন না। সৌরজগতের সহিত পৃথিবীর কী সম্বন্ধ তাহা আপনার অবগত নহেন। গ্রহগুলির মধ্যে পরস্পরের কী সম্পর্ক তাহা আপনাদের জানা উচিত। পৃথিবী নিজের মেরুদণ্ডের (axis) উপর ঘুরিতেছে; জ্যোতির্বিদ্যার (Astronomy) এই প্রকার প্রাথমিক জ্ঞান

ছেলেমেয়েদের দেওয়া উচিত। সূর্যের উদয় ও অস্তসম্বন্ধীয় ঘটনাগুলি গল্পচ্ছলে তাহাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। সূর্য এত দূরে আছে যে তাহা আমাদের নিকট একটি ছোট থালার মতো দেখায়। পৃথিবী হইতে সূর্য নয় কোটী উনত্রিশ লক্ষ মাইল (৯,২৯,০০,০০০) মাইল দূরে অবস্থিত। প্রতি সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল (১,৮৬,০০০) বেগে চলিয়া পৃথিবীতে সূর্যের আলোক আসিতে প্রায় নয় মিনিট সময় লাগিয়া থাকে। যে সকল তারকা বহুদূরে অবস্থিত, আপনারা তাহাদের দূরত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করুন। তাহাদের মধ্যে কোন কোনটি আমাদের সূর্যের অপেক্ষাও বড়। সেই সকল নক্ষত্রের আলোক পৃথিবীতে পৌঁছিতে বহু বর্ষ কাটিয়া যায়। ইতি মধ্যে হয়তো সেই গ্রহগুলি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও আমরা তাহাদের আলোক দেখিতে পাই। যখন আপনারা একটি নক্ষত্রকে দেখেন তখন আপনারা এমন একটি জিনিষকে দেখিতেছেন যে অতীতে তাহার আকার ও গঠন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল ; তাহাকে এখন যেমন দেখিতেছেন পূর্বেকার সেইরূপ যে ইহা রহিয়াছে তাহা ভাবিবেন না। তাহার আকার ও অবস্থা ও সেইরূপই ছিল যখন আলোক নক্ষত্র হইতে বাহির হইয়াছিল। ধরা যাউক ইহা পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের ঘটনা, কিন্তু তাহা আপনারা কি কল্পনা করিতে পারেন? ইহার বর্তমান অবস্থা আপনারা দেখিতে পাইতেছেন না। একশত বৎসর বা এক হাজার বৎসর পূর্বে যে অবস্থায় ছিল তাহাই কেবল আপনারা দেখিতেছেন। ইহা আপনাদের নিকট একটি বিস্ময়কর সত্যের প্রকাশ (revelation) বলিয়া মনে হইতে পারে। তথাপি এই সকল বিষয়

আপনাদের শিখিতে হইবে। তবেই জগৎ যে কি প্রকার সেই সম্বন্ধে আপনারা এক পরিষ্কার ধারণা করিতে পারিবেন।

আপনারা জগতের স্রষ্টার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই স্রষ্টা কোথায় থাকেন? আপনাদের স্বর্গের কথাও বলা হয়। কিন্তু ইহা কোথায়? কোথায় এই স্বর্গ? প্রকৃতপক্ষে স্বর্গ একটী মানসিক অবস্থামাত্র। আপনারা এই স্থূল জগতে বাস করিতেছেন। আপনারা ঘুমন্ত অবস্থায় যেমন স্বপ্ন দেখেন, পৃথিবীর অন্তর্গত সমস্ত ব্যাপারও সেই প্রকার স্বপ্নের ন্যায়। স্বপ্নে আপনারা অনেক-কিছু দেখিয়া থাকেন। কিন্তু ঐ স্বপ্নগুলি কোথায় দেখেন, তাহা কি জানেন? ইহা কী আপনাদের বাহিরে কোনও এক স্থানে আছে? না, ইহার সৃষ্টি ও স্থিতি মনোজগতেই। এই সকল সত্য তথ্যগুলির সম্বন্ধে চিন্তা করিতে এবং তাহাদিগকে অনুভব করিতে হইবে—তবেই পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকার উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যাইবে। সামান্য কেরাণীর কার্য করাই মনুষ্যজীবনের আদর্শ নহে। যদি স্বাবলম্বী হইতে চান্ এবং নিজের মুক্তির আনন্দ অনুভব করিতে চান্ তাহা হইলে আপনাদের অবশ্যই স্বাধীন হইতে হইবে। ইংলণ্ডবাসীদের মতো আপানারা নূতন কোন সত্যের আবিষ্কার করুন এবং শ্রমশিল্পের (industry) উন্নতির দ্বারা নূতন নূতন দ্রব্য উৎপাদন করুন। ইংলণ্ডের লোকেরা কেরানীর ন্যায় অধীন হইয়া থাকিতে চাহে না; তাহারা চায় স্বাধীনতা। আমরা ভারতবাসিরা ঐ আত্মনির্ভতার মনোভাব হারাইয়া ফেলিয়াছি। বর্তমানে আমরা অবনতির শোচনীয়

অবস্থার মধ্য দিয়া চলিয়াছি। আমরা নিজেদের সংশোধন না করিলে এবং নিজেদের সংস্কৃতির উন্নতি না করিলে কেহই আমাদের উন্নতিলাভে সাহায্য করিতে পারে না। নিজেরা নিজেদের সাহায্য না করিলে ঈশ্বর আপনাদের সাহায্য করিতে পারেন না। সকল প্রকার শিক্ষাতেই হিতাহিত জ্ঞানবিচারের সহিত ঐক্যের সুর থাকা একান্ত আবশ্যক। ঈশ্বর আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনাশক্তি দিয়াছেন। বিচরেরই পরিণতি দিব্যজ্ঞান। আমাদের বিবেক বা বিচারজ্ঞান যখন অসীম দিব্য-আকারে পরিণত তখন তাহাকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলে। যাহা-কিছু উপদেশ বা নীতি শ্রবণ করেন তাহা অন্ধবিশ্বাসে স্বীমার করিয়া লইবেন না। যদি সেগুলি আপনার যুক্তি ও বিচার অনুযায়ী হয়, তাহারা যদি আপনার এবং আপনার আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের হিতকর হয় তবেই সেইগুলিকে গ্রহণ করুণ। ইহাই হইল শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ। ব্যক্তিগত হিসাবে ইহা বুদ্ধির বিকাশসাধনে সাহায্য করিবে এবং চরম শিক্ষার ফবস্বরূপ জীবন-মরণের রহস্য সম্বন্ধে মূলতথ্যগুলি বুঝিতে সাহায্য করিবে।

বেদে জ্ঞানের কথা বর্ণিত হইয়াছে। আমরা হিন্দুগণ চিরকালই জ্ঞানলাভের আকাঙ্খা করিয়াছি। ব্রিটিশ গভমেণ্টের দ্বারা ভারতবর্ষে স্কুল ও কলেজগুলি স্থাপিত হইবার বহুপূর্ব্বে আমাদের গ্রাম্যবিদ্যালয়, পাঠশালা, সংস্কৃতির জন্য উচ্চবিদ্যালয় ও নানাপ্রকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল। আমাদের দেশে বহুশতাব্দী পূর্বে হইতে প্রায় সকল গ্রামেই বিদ্যালয় ছিল এবং এই সকল বিদালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। সেখানে প্রধানতঃ বিজ্ঞান,

দর্শনশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ও আধ্যাত্মিক শাস্ত্রগুলি পড়ান হইত। পিতামাতাকে এই সকল বিভিন্ন বিষয় প্রথমে শিখিতে হইবে। পিতামাতার যদি এই সকল বিষয় না জানা থাকে তাহা হইলে তাহাদের জনক ও জননী হওয়া উচিত নয়। যাহারা অশিক্ষিত তাহাদের মোটেই সন্তান সন্ততি হওয়া উচিত নয়; তাহাদের বরং নিঃসন্তান হইয়া থাকাই কর্তব্য। পিতা-মাতা ঠিকভাবে শিক্ষিত না হইলে তাহারা তাহাদের সন্তানদের শিক্ষিত করিতে পারিবে না। শিশুদের প্রকৃত শিক্ষাদানের ভিতর দিয়াই দেশ ও মানবসমাজকে আমরা শ্রেষ্ঠ সাহায্য দান করিতে পারি।

বিদ্যাই মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। আমরা জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর আরাধনা করিয়া থাকি। বিদ্যা দুই প্রকার: পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা। জ্ঞানলাভের দিক দিয়া পরা বিদ্যা সর্বোৎকৃষ্ট। জাগতিক ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান অপরা বিদ্যা। এই বিষয়ে আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। যে নিয়মের দ্বারা আমাদের দেহ ও মন চালিত হয় এবং আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝিতে সমর্থ হই তাহার জ্ঞান হইল অপরা বিদ্যা। পরা বিদ্যা লাভ হইলে সেই সর্বোচ্চ ও অসীম জ্ঞানের আমরা অধিকারী হই এবং তাহার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে জগতে আমরা মাত্র কিছু কালের জন্য বাস করি তাহা একটি খেলাঘরের মতোই ক্ষণস্থায়ী। আমরা কে? আমরা কী? কেন আমরা এই জগতে আসিয়াছি? কেনই বা এখান হইতে যাই? মৃত্যুর পরেই বা আমরা কোথায় যাই—এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের দ্বারা দিব্যজ্ঞান

লাভ করাই আমাদের সর্বোচ্চ আদর্শ। এইগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিয়া আপনারা নিজ নিজ সন্তানদের জীবনকে গড়িয়া তুলুন। তাহা হইলেই তাহারা যে আপনাদের প্রতি কেবলমাত্র কৃতজ্ঞ থাকিবে তাহা নহে, এই স্থূল জগতে যে সকল নিয়ম তাহাদের জীবনকে ও তাহাদের দেহকে পরিচালিত করিতেছে সেগুলি ও নৈতিক আধ্যাত্মিক নিয়মগুলিও তাহারা বুঝিতে পারিবে। ইহা হইতেই সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণ—এমন কি পরিশেষে ইহার দ্বারা দিব্যজ্ঞান ও ঈশ্বর লাভও হইবে। ইহাই সকল প্রকার শিক্ষার চরম-আদর্শ। আপনারা ইংরাজী শিখুন অথবা যে কোন ভাষাই আয়ত্ত করুন না কেন, আপনারা কিন্তু অবশ্যই স্মরণ রাখিবেন যে, শিক্ষার সর্বোচ্চ আদর্শ দিব্যজ্ঞান লাভ করা। এই দিব্যজ্ঞানের অধিকারী হইলেই অনুভব করিব আমরা জন্মমৃত্যুহীন, আমরা অমৃতের সন্তান। একমাত্র এই দিব্যজ্ঞান লাভ হইলেই আমরা জগতের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুখ লাভ করিব এবং মৃত্যুর পরে আমরা যে লোকে গমন করিব সেখানে অসীম আনন্দ, শাশ্বতী শান্তি ও অমৃত সর্বদা বিরাজিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

॥ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও সভ্যতা ॥

অদ্য অপরাহ্নে আমার এই প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করা উচিত নহে। কিন্তু ডক্টর জ্যাক্‌সন্ (Dr. W. H. Jackson)[১] তাঁহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রোফেসর নিউবম্ব (Prof Newcombe) প্রশ্ন তোলা সত্ত্বেও তিনি যে বিষয়ের উপর জোর দিয়াছেন তাহাতে আমার মনে হয় শিক্ষাসম্মিলনীর পক্ষে ইহা এক বিশেষ চিন্তা করিবার বিষয়। অতএব এই বিষয়ে আমি সম্মিলনীর সভ্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য জগতের নানা দেশে ভ্রমণের সময় প্রাচ্যদেশের ও পাশ্চাত্য-দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য আমার দৃষ্টিগোচর হওয়ায় সে সম্বন্ধে আমার মনে প্রশ্ন জাগিয়াছিল। অনেকের পক্ষে হয়তো ডক্টর জ্যাক্‌সনের প্রস্তাবই গ্রহণযোগ্য হইতে পারে, তবে উহা এই বৃহৎ প্রস্তাবটির এক ক্ষুদ্রতম অংশ। কিন্তু ঐ প্রসঙ্গে যে মূল প্রশ্নের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যে সামাজিক নিয়মনীতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশ ও সমাজকে পরিচালিত করিতেছে সেগুলি এবং প্রাচ্য

১। আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্দো-ইরানীয়ান ভাষা ও সাহিত্যের সুবিখ্যাত মনীষী অধ্যাপক ডক্টর উইলিয়াম এইচ জ্যাক্‌সন। ডক্টর জ্যাক্‌সনের সংস্কৃত সাহিত্য এবং ভারতীয় ও ইরাণীয় পুরাতত্ত্বসম্বন্ধে অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তিনি 'অ্যামেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটির' সভাপতি ছিলেন। সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ব্যাপারে স্বামী অভেদানন্দের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

ও পাশ্চাত্যের এই উভয় সভ্যতার মূলসূত্রগুলি কি তাহা আমাদের নিজেদের মধ্যেই বুঝিয়া লওয়া উচিত। কারণ এই সম্মিলনীতে আলাপ-আলোচনার ফলস্বরূপ এক সুনিশ্চিত কোন এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে যদি আমার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে ইহা ছাড়া আর অন্য উপায় নাই। মনে হয় কিছুকাল পূর্বে ডক্টর জ্যাকসনকে আমি একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম এবং আমিও তাহা বিশ্বাস করি যে ব্যক্তিগত অধিকার স্থাপন ব্যাপারে ন্যায়ের (right) প্রতিষ্ঠা প্রাশ্চাত্য সভ্যতাব মূলমন্ত্র হইলেও ইহা অন্যায় (injustice) এই শব্দের বিপরীত অর্থ নহে। 'ন্যায়'-শব্দটিতে বিশেষ এক অধিকারকে বুঝাইয়া থাকে। আপনারা আপনাদের সাহিত্যে, কথাবার্ত্তায় কিংবা দৈনিক সংবাদপত্রে দিনের পর দিন আপনাদের মধ্যে যেসব আলোচনা চলে সে সমস্ত যদি পরীক্ষা করেন তাহা হইলে দেখিবেন সকল সময়েই এই অধিকারের (right) প্রশ্ন তোলা হইয়াছে। দেখিবেন জনসমাজে সংখ্যালঘিষ্ঠদেরই বা কী অধিকার এই একই বিষয়সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। এই সমস্ত আলোচনার বিষয়রূপে আপনারা দেখিবেন সেখানে আছে এক ব্যক্তিগত অধিকার, দেশের অধিকার, মহিলাদেব অধিকার এবং আরও কত শত প্রকার অধিকারের কথা। মনে হয় এই সংস্কাব ও ভাবধারাই য়ুরোপ ও আমেরিকার সভ্যতাকে চালাইতেছে।

অধিকার (right) বলিতে নির্দ্দিষ্ট কোন বিষয়ে স্বত্ব থাকা বুঝায়। অধিকার অর্থে সেই আইনকে বোঝায় যাহার সাহায্যে আপনি আপনার অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ করেন

ও তাহাকে যতদূর সম্ভব কাজে লাগান। ঈপ্সিত ফল প্রদানকারী শক্তিকেও অধিকার বলা হয়। অধিকার অর্থে বিশেষ ব্যক্তিত্বকেও (individuality) বুঝাইয়া থাকে। ইহা দ্বারা মানবসভ্যতার নৈতিক ও বুদ্ধির উদ্ঘটিত প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিকেও বুঝায়। এখন যদি ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি প্রাচ্যদেশে আপনারা যান (অবশ্য আমি বিশেষ-ভাবে ভারতের কথাই বলিতেছি) তবে যদিও আমার বিশ্বাস যে সংস্কৃতির দিক হইতে চীন ও জাপানের সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির ঐক্যভাব অত্যন্ত বেশী তাহা হইলে সেখানে আপনারা 'কর্তব্য' বলিয়া একটি শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাইবেন। 'কর্তব্য'-শব্দটির মধ্যে একটি গভীর অর্থ নিহিত আছে। আপনি আপনার কাছে কতটা ঋণী, সমাজের কাছেই বা আপনার কি পরিমাণ ও কত ঋণ, জাতির নিকটেই বা আপনার ঋণের পরিমাণ কতখানি, মাতৃভূমির নিকট এবং অবশেষে সমস্ত জগতের নিকট আপনার ঋণ কিরূপ তাহা স্থির করিলেই 'কর্তব্য' শব্দটির অর্থ আপনারা বুঝিতে পারিবেন। ইংরাজীভাষার অন্তর্গত duty-শব্দের সহিত তুলনা করিলে এখানে 'কর্তব্য' শব্দের অর্থের মধ্যেই ব্যাপকতার মাত্রা অত্যন্ত বেশী তাহা বুঝিবেন। এজন্য 'কর্তব্য' ও right (অধিকার) এই দুই শব্দের প্রকৃতিগত পার্থক্য দেখাইবার জন্য এই আলোচনা করিতেছি। আপনারা যখন অধিকারের (right) কথা ভাবেন তখন এই চিন্তা করেন যে আপনাদের দাবী অন্যের নিকট কতটা; আর এ কথা আমি আপনাদের পূর্বেও বলিয়াছি।

যখন আপনারা নিজের করণীয় কার্যের কথা চিন্তা করেন তখন ভাবেন আপনাদের নিকট অন্যের দাবী কতখানি। প্রথমতঃ, অন্যের অধিকার আপনারা আইনসঙ্গত হইলেও বলপূর্বক তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেছেন এবং আবার নিজেদের অবশ্য করণীয় কার্যের যখন প্রশ্ন আসিতেছে তখন আপনাদের অধিকারে আইনসঙ্গত ভাবে বলপূর্বক হস্তক্ষেপের উপায় থাকিতেছে না। হয়তো অপরের প্রতি যে সমস্ত করণীয় কার্য করিতেছেন তাহা নিজেদের জন্যই করিতেছেন। কিন্তু কর্তব্য সকল সময়েই পরার্থপরতা বা নিঃস্বার্থ ভাব প্রকাশের যাথার্থ্যসম্বন্ধে অনুসন্ধানের বিষয় হইয়া থাকে। সেজন্য পাশ্চাত্যের সভ্যতায় অধিকারবাদের গুরুত্বই আমাদের সহিত নানা বিরোধের ব্যাপার হইয়া পড়ে। আবার কর্তব্যের মূলসূত্র নির্ণয়েব ব্যাপার হইলেই সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বার্থ-রক্ষার ইচ্ছাও আসিয়া উপস্থিত হয়। অতএব প্রত্যক্ষ বিষয় হইতে অনুমানের ন্যায় ইহাই দাঁড়ায় যে পাশ্চাত্যের ন্যায় প্রাচ্যদেশে ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার :কৌশল কার্যকরী উপায়রূপে গণ্য হইতে পারে না। পাশ্চাত্য দেশে আপনাবা বেশীর ভাগ সময়ে বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হন, আর প্রাচ্য-দেশে আমরা চালিত হই বেশীর ভাগ হৃদয়বৃত্তির দ্বারা। প্রাচ্যের সহিত পাশ্চাত্য দেশের এইখানে মূলতঃ প্রভেদ। আমার মনে হয় পর্য্যবেক্ষণের দিক দিয়া প্রাচ্যদেশীয় ও পাশ্চাত্য দেশীয় সভ্যতাকে দুই বিভিন্ন ধরণের সভ্যতা হিসেবে ধরা উচিত। উভয়ের মধ্যে প্রভেদের মাত্রা যতই অধিক, আমাদের বোঝাব মাত্রা ততই কম, অথচ একে অন্যের নিকট নূতন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সেই মুহূর্তে

আবার আপনারা এক অত্যন্ত কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হইবেন যখন আপনারা আরও অগ্রসর হইয়া বলিবেন—এ কী প্রকার? পাশ্চাত্যে যখন আমরা অধিকারবাদকে গ্রহণ করিলাম তখন প্রাচ্যবাসীরা কী করিয়া কর্তব্যবাদকে গ্রহণ করিল? অত্যন্ত দ্বিধার সহিত অবশ্য এই প্রশ্নের সম্বন্ধে আমি আমার মত প্রকাশ করিতেছি এবং যদি আমার ভুল হয় আপনারা তাহা হইলে সেই ভুল অবশ্যই সংশোধন করিয়া দিবেন।

পাশ্চাত্য দেশে এই অধিকারবাদ থাকার কারণ এই যে পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পূর্ণ নাগরিক অর্থাৎ কর্মকোলাহলের ভিতর হইতে এই সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে এমন কি রোম্যান সভ্যতার যুগ হইতে লোকেরা নগরগুলিতে একত্রিত হইয়া বাস করিতে অভ্যস্ত ছিল। নগরগুলির সমস্ত নিয়ম সমষ্টিগতভাবে নাগরিকদের জীবন, মন ও চরিত্র প্রভৃতির গঠনপদ্ধতিও নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। কিন্তু প্রাচ্যদেশে শ্রমশিল্পের (industry) উন্নতি ও প্রসারতাকে কখনও এমন বিশেষভাবে জনপ্রিয় করা হয় নাই। সে সময়ে সহরগুলিতে এত অধিক মাত্রায় লোকের সমাবেশ কখনও হয় নাই। তখন নাগরিকদের প্রগতিশীল (dynamic) সভ্যতার বিপরীত স্থিতিশীল (static) সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। যখন সহরগুলিতে লোকসংখ্যার আধিক্য ঘটিতে আরম্ভ করে, যখন লোকেরা স্থিতিশীল না হইয়া গতিশীল হয় এবং নগরের লোকেরা কার্যব্যাপারে স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায় ও নূতন নূতন নানা সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে তখন সমাজে পূর্বতন আদর্শগুলি চাপা পড়িয়া যায়।

কী কী অধিকার সে লাভ করিতেছে ও কী কী অধিকারগুলি সে অপরের জন্য ছাড়িয়া দিতেছে তাহা প্রত্যেক লোকের পক্ষে স্মরণে রাখা অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। কারণ, সে যদি তাহা না করে তাহা হইলে অপরে তাহাকে অত্যন্ত অবহেলা করিবে এবং সে জীবনযুদ্ধে পিছাইয়া পড়িবে। সেই জন্যই পাশ্চাত্যের লোকেরা কর্তব্যবাদের (duty) অপেক্ষা অধিকারবাদের (right) উপরই অধিক ঝোঁক দিয়াছেন। কিন্তু যে দেশের সভ্যতা ধীর ও মন্থর গতিতে চলে, যেখানে লোকের চিত্ত সত্যই স্থিতিশীল, অন্যান্য সভ্যতার তুলনায় সেখানকার সভ্যতা অনেকটা প্রগতিবিহীন হইয়া যায় এবং লোকে কর্তব্য বিষয়ে অবহিত হইয়াই অধিকতরভাবে শিক্ষা লাভ করে। পাশ্চাত্যদেশের নাগরিকদের মতন কর্মব্যস্ত প্রকৃতির বশে অস্থিত হইয়া ও যেখানে সেখানে না ঘুরিয়া বেড়ানর দরুণ প্রতিবাসীরা আবার ন্যায়নিষ্ঠও হয়। কর্মের সেরূপ আধিক্য না থাকার জন্য আবার প্রতিবাসীরা তুলনায় অধিকমাত্রায় অবসর পায় এবং অন্যের প্রতি কর্তব্যপালন সম্বন্ধে চিন্তাও করিতে পারে। আমার মনে হয় যে, সেজন্যই পাশ্চাত্য অপেক্ষা প্রাচ্যদেশে কর্তব্যবাদের অনুরক্তি ও পরিপোষকতা বেশী হইয়াছে। এখন আমরা একটি মূল সমস্যার সম্মুখীন হইতে পারি যে, পাশ্চাত্যদেশে সভ্যতা যে গতিবেগ লইয়া ছুটিতেছে প্রাচ্য দেশেরও সেই গতিবেগ লইয়া কতদূর অগ্রগামী হওয়া উচিত। আর পাশ্চাত্যবাসী আপনাদের মতন যদি প্রাচ্যদেশবাসী আমরা অধিকারবাদকেই প্রাধান্য দিয়া কর্তব্যবাদকে ত্যাগ করি তাহা হইলে আমরাই বা কিরূপ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইব।

পারিবারিক আবেষ্টনীর বাহিরে নিজেদের জনসমাজের প্রতি কর্তব্য পালনের যে অধিকার আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদিগের নিকট হইতে পাইয়াছি তাহাকে ভুলিয়া গিয়া পাশ্চাত্যের অধিকারবাদকে প্রাধান্য দিলে কি আমরা বিপদের মুখে পতিত হইব না? আবার অন্যদিকে যেমন ভারতে ও চীনদেশে যেখানে জনসমাজ স্থিতিশীল সেখানে ঐরূপ করিলে আমাদের ধ্বংস হইবার স্বীয় অধিকার সম্বন্ধে বিস্মৃতি হইয়া যাওয়াতে কি বিপদ ঘটিতে পারে না?

এক্ষণে আমি যে মত প্রকাশ করিলাম জানিনা কাহারও কাহারও সহিত আমার সেই মতের ঐক্য হইবে কিনা। এই দুই সভ্যতার যে মূলগত পার্থক্য তাহা আমি দেখাইয়াছি। আমার ন্যায় যাহারা ভবিষ্যৎ বংশীয়দিগের শিক্ষানায়করূপে এখানে সমবেত হইয়াছেন তাঁহারা নিজেদের প্রত্যেককে লইয়া একতাবদ্ধ হইতে চেষ্টা করুন। ইহার বিষয় হইবে প্রথমতঃ, এই দুই সভ্যতার পার্থক্যনির্ণয়ের উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করা; দ্বিতীয়তঃ, এই সমস্ত বিরোধকে অতিক্রম করিয়া ঐক্যের ভাব প্রতিষ্ঠিত করা—যাহার ফলে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্যের দ্বারা সমস্ত বিষয়ের একটা বোঝাপড়া করিতে পারে। এই কার্যটি আমি বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়াই মনে করি।

প্রকৃতপক্ষে ইহাই আমি বলিতে চাই এবং ইহারই উপর আমি জোর দিতে চাই। তাহা ছাড়া আর একটি বিষয় আমি এখানে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি। প্রাচ্যদেশের ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষানীতি সম্বন্ধে যে সমস্ত ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত আছে সেগুলির অধিকাংশ

পাশ্চাত্যদেশের সুধীবৃন্দের দ্বারা লিখিত হইয়াছে এবং এখনও লিখিত হইয়া থাকে। এখন কথা হইল এক জাতিব চক্ষে অন্যদেশীয় যে কোন জাতিব সভ্যতা অপেক্ষা তাহার নিজের সভ্যতাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিভাত হয়। মোটকথা ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি প্রাচ্যদেশের সভ্যতাব আদর্শ ও প্রকৃতি বুঝিবার মতো সংস্কাবমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচারশক্তি ভাবতীয় বা চীনদেশীয় ছাড়া অন্য দেশীয়দের ঠিক হইতে পারে না। আধুনিক যুগে এই দুই সভ্যতার পক্ষে পবস্পর পরস্পবকে জানিবাব ও বুঝিবাব কিন্তু সময় ও সুযোগ আসিয়াছে। তবে নিজেদের আদর্শেব তুলনায় প্রাচ্যের সভ্যতাকে প্রতিকূল বলিয়া মনে করিবাব জন্য অবশ্য পাশ্চাত্যকেও দোষ দেওযা যায় না। যদি পাশ্চাত্যের ও প্রাচ্যের দুই আপাতবিবোধী সভ্যতার পশ্চাতে কোন যোগ-সুত্রেব সন্ধান পাওয়া যায় তাহা হইলে পরস্পব ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যে যেখানে নিজ নিজ জাতীয় বিশেষত্ব-গুলি তাহাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর আধিপত্য করিতেছে সেগুলিকে অবশ্যই গ্রহণ ও বিনিময় করিতে পারা যাইবে। এইরূপ সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদানপ্রদান ও পরস্পর পবস্পবকে সঠিকভাবে জানিবার ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়েই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পবস্পরের ভুল বুঝিবার ও না বুঝিবার যে সংস্কাব আছে তাহাকে দূব কবিবার জন্য উভয় জাতিকে সমস্ত স্বাধীনতা ও গোঁড়ামিব প্রাচীব ভাঙ্গিয়া বিশ্বজনীনতাব উদার ও সুবিশাল ক্ষেত্রে পরস্পরকে সম্মিলিত হইতে হইবে।

সমগ্র মানবজাতির কল্যাণসাধনের জন্য নিজ নিজ সংস্কৃতি-সম্পন্ন সভ্যতার প্রকৃতিগত বিশেষত্ব, তাহাদের অপূর্ণতা এবং এপর্য্যন্ত তাহাদের অগ্রগতির ইতিহাস যাহাতে সমগ্র জগতে ব্যাখ্যান ও প্রচার করিতে পারেন জগতের বহুদেশে এমন অনেক উচ্চশ্রেণীর শিক্ষানায়ক মনীষী ব্যক্তি আছেন। এই সমস্ত মনীষীদের একত্রে মিলিত হইয়া পরস্পরের ভাবের আদানপ্রদান করিবার জন্য এইরূপ শিক্ষাসম্মিলনীর (Education Conference) আবশ্যকতা আছে। কারণ এই মহৎ প্রচেষ্টার ফলে জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিগুলির মধ্যে পরস্পর সাংস্কৃতিক সহযোগিতা করিবার ভাব জাগ্রত হইবে। এই সম্মিলনে সমস্ত গৃহীত প্রস্তাবগুলির অন্যতম রূপে যদি আমার এই প্রস্তাবটিও সমর্থিত হয় তাহা হইলে এই উদার প্রস্তাবটিকে দেশে দেশে প্রচলিত করিবার জন্য আমিও সর্বতোভাবে চেষ্টা করিব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

॥ শিক্ষা ও সমাজ ॥

প্রথম প্রশ্ন এরূপ হইতে পারে বর্তমান হিন্দুসমাজে বর্ণ-বিভাগের কোন আবশ্যকতা আছে কিনা এবং যদি থাকে তবে তাহা কিরূপ হওয়া উচিত ? আমি জানি বিলাতে সাধারণ শ্রেণী ও অভিজাত বংশের ভিতরে সামাজিক খাওয়া-দাওয়ার বৈষম্য থাকিলেও তাহাদের মধ্যে একতার কোন ত্রুটী দেখিতে পাওয়া যায় না। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে ইহাই বলিতে হইবে—প্রথমতঃ আমাদের বুঝিতে হইবে 'বর্ণ' শব্দের অর্থ কি ? বর্ণ অর্থে রং অথবা ইংরাজিতে যাহাকে 'কালার' (colour) বলে তাহাই বুঝায়। Colour অর্থে আমাদের গায়ের রং সুতরাং বর্ণবিভাগ বলিলে আমরা বুঝিব যে, গায়ের রং অনুযায়ী বিভাগ আমাদের প্রাচীন ভারতে ছিল এবং হিন্দুশাস্ত্রে সেইজন্য চারি প্রকার গায়ের রঙের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন শুক্ল, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ। এইগুলি দেহেরই বর্ণ ছিল। দেহের এই চারিটি রং বা বর্ণ অনুযায়ী ঋগ্বৈদিক যুগে বলিতে গেলে আর্যদের মধ্যে চারি বিভাগ করা হয়। শুক্লবর্ণবিশিষ্ট আর্যেরা ব্রাহ্মণ ছিল, রক্তবর্ণবিশিষ্টেরা ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণের লোকেরা বৈশ্য এবং যাহাদের রং কালো ছিল তাহারা শূদ্র। এখনও দেখা যায় কাশ্মীর-অঞ্চলের ব্রাহ্মণদের গায়ের রং ধপ্‌ধপে সাদা। আমি কাশ্মীরে গিয়াছিলাম, সেখানে কাশ্মীরী পণ্ডিত এবং কোন কোন মুসলমানেরও নীল চক্ষু, কটা চুল এবং

শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট শরীর দেখিয়াছি। আমার মনে হয়, প্রাচীন-কালের ব্রাহ্মণেরা ইহাদের মতো গায়ের সাদারংবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরে যখন আর্য্যেরা পঞ্চনদের দেশ হইতে পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ দিকে নামিয়া আসিলেন এবং ভারতের ও দাক্ষিণাত্যের আদিম অধিবাসী কোল, ভীল, ও দ্রাবিড়ী-দিগের (Dravidians) সহিত মিশিতে লাগিলেন তখন ক্রমেই বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হইতে লাগিল। অবশ্য বর্তমানের মিশ্রিত বর্ণ ধরিলে সকলকেই এক বিভাগে ফেলিতে হইবে ঋগ্বেদের যুগে যাহাদের গায়ের কালরঙ্‌ ছিল তাহাদের দস্যু, দাস বা অনার্য প্রভৃতি নামে বর্ণনা করা হইয়াছে। এখন এদেশে রক্তবর্ণবিশিষ্ট ক্ষত্রিয় এবং পীত বর্ণের বৈশ্য প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই অবস্থায় আমাদের বর্ণবিভাগ লইয়া বাদানুবাদ করা কতটুকু সমীচীন তাহা ভাবিবার বিষয়। তবে গুণ ও কর্ম অনুযায়ী যে বর্ণবিভাগ ছিল তাহা শ্রীকৃষ্ণ ভগদ্গীতাতেও বর্ণন করিয়াছেন। যেমন "চাতুর্বণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ ;"—অর্থাৎ গুণ ও কর্ম অনুসারে চারি বর্ণ (জাতি) বিভাগ করা হইয়াছে। হিন্দু-মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শপুরুষ বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহার বাক্য বেদবাক্যের ন্যায়ই স্বীকার করেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অভিমত অবলম্বন করিয়া যদি আমরা গুণ ও কর্মের অনুযায়ী জাতিভেদ স্বীকার করি তাহা হইলে সেরূপ জাতিবিভাগ য়ুরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান প্রভৃতি সকল সভ্যদেশের বহু জাতির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি এদেশের মুসলমানদিগের মধ্যেও এই ধরণের জাতিভেদ আছে। যাহা হউক চারিটি জাতির ভিতর বিভাগ হইল :

প্রথম ব্রাহ্মণ—পুরোহিত (clergyman বা priest) অথবা মৌলবী ; দ্বিতীয় ক্ষত্রিয়—সৈনিক (soldiers) অথবা সিপাহী, তৃতীয় বৈশ্য—ব্যবসায়ী (merchant class) এবং চতুর্থ শূদ্র—(servant class)। পূর্বেকার নিয়ম ছিল যে ব্যক্তি যে কার্য করিতে সক্ষম (efficient) এবং যাহার যে কার্য্যে সাধারণ প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা (natural tendency) তাহাকে সেই শ্রেণীভুক্ত করা হইত। ইহাকেই গুণ, কর্ম এবং স্বধর্মানুসারে বিভাগ বলে। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, স্বধর্মপালন করিলেই উৎকর্ষ লাভ হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই আপন আপন গুণ ও কর্ম (qualification, natural inclination and profession) অনুসারে ঠিক ঠিক কার্য করিলে ঈশ্বর লাভ হইবে। সঙ্গীতজ্ঞ সঙ্গীতের দ্বারা, চিত্রকর চিত্র আঁকিয়া, শিল্পী শিল্পকার্যে মনোযোগ দিয়া এবং এইরূপে সকলেই কর্ম করিয়া ঈশ্বর লাভ করিবে। কোন কার্যই নিন্দনীয় নহে, সকল কর্ম্মই ঈশ্বরের—এইরূপ মনোবৃত্তি ও ঈশ্বরের সেবাবুদ্ধি লইয়া সম্পাদন করিলে সমস্ত কর্মই উপাসনার স্বরূপ হয় এবং উহার ফলে ঈশ্বরলাভ হইবে।

বর্তমান সময়ে জন্মগত জাতিবিভাগ গুণ ও কর্মগত জাতিবিভাগ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। বৈদিক সময়ে গুণগত ও কর্মগত জাতিবিভাগই ছিল। ইহা এক্ষণে য়ুরোপ ও আমেরিকাতে দেখিতে পাওয়া যায়। পরে বৈদেশিকগণের আক্রমণের সময় হিন্দুসমাজে সঙ্কীর্ণতা (conservatism) প্রবেশ করিলে সেই সময় হইতে ঐ সমস্ত প্রবল বৈদেশিকদের অত্যাচার হইতে হিন্দুদিগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (individua-

lity) রক্ষা করিবার জন্য জন্মগত জাতিবিভাগের সৃষ্টি হয়। ইহা যদি না হইত তাহা হইলে হিন্দুজাতি এবং হিন্দুধর্মের আজ বোধ হয় অস্তিত্বও থাকিত না। কিন্তু সেই অবস্থার আজ পরিবর্তন হইয়াছে, কারণ এক্ষণে আমরা বিদেশী রাজার শাসনে পরাধীন জাতি। এখন আমরা স্বাধীনতাকামী, কিন্তু পেটের দায়ে পড়িয়া দাসত্ব স্বীকার করিতে সকলে বাধ্য হইয়াছি। বলিতে গেলে আমবা ক্রীতদাসের ন্যায় এক্ষণে লজ্জা এবং আত্মগৌরবহীন হইয়া পড়িয়াছি। কাজেই জন্মগত জাতি মানিতে গেলে এখন ব্রাহ্মণ কিংবা পুরোহিতের সন্তান পৌরাহিত্যকার্যের অভাবে অনাহারে হয়তো মৃত্যুমুখে পতিত হইতে বাধ্য হইবে। দেশে এখন যেন প্রবল প্রতিযোগিতার (keen comptition) যুগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং জন্মগত জাতিবিভাগও আপনা-আপনি লোপ পাইতে বসিয়াছে। আর সেইজন্যই আজ ব্রাহ্মণেরা কেরাণীগিরিরূপ দাসত্ব অথবা ব্যবসাবাণিজ্য করিতে বাধ্য হইতেছেন। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব আপনিই লাঞ্ছিত হইতেছে। শাস্ত্র আছে :

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজোচ্যতে।
বেদাভ্যাসী ভবেৎ বিপ্র ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥

জন্ম হইলে সাধারণতঃ সকলে শূদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে। উপনয়নাদি সংস্কার হইলে দ্বিজ অর্থাৎ তাহার দ্বিতীয় জন্ম (second or spiritual birth) হয়। খৃষ্টানেরা যাহাকে baptism বলে তাহাই দ্বিজের সংস্কার। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন জাতির সংস্কারে অধিকার আছে। যিনি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহাকে 'বিপ্র' বলে, আর যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান

লাভ হইয়াছে তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণই প্রকৃত মুক্তপুরুষ। তিনি সমস্ত সাংসারিক নিয়মের অতীত। কিন্তু আজকাল এরূপ যথার্থ ব্রাহ্মণ কোথায় দেখিতে পাওয়া যায় ?

সুতরাং বর্তমানে বর্ণবিভাগ বা জাতিভেদের কথা বলিলে তাহা এই সময়ের উপযোগী গুণ এবং কর্মের অনুযায়ী হওয়া উচিত। যেমন, যিনি ধর্মসাধনও পুরোহিতের কাজ করিবেন তিনিই ব্রাহ্মণ। যে দৈনিক হইবে সেই 'ক্ষত্রিয়', যে ব্যবসা করিবে সেই 'বৈশ্য', এবং যে পরের চাকরী বা দাসত্ব করিবে সেই শূদ্র। য়ুরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য পাশ্চাত্য সভ্যদেশে এইরূপেই বর্ণ বা জাতির বিভাগ প্রচলিত আছে। পাদ্রী, পুরোহিত বা clergymam-এর সন্তান যে পুরোহিত বা clergyman-ই হইবে এমন কোন নিয়ম সেখানে নাই ; অথবা সেনাপতির সন্তানকে যে যোদ্ধা হইতেই হইবে ইহারও কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। আমাদের প্রাচীন ভারতে জাতিভেদের পদ্ধতি ঠিক এই রকম ছিল। কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য প্রভৃতি ইঁহারা ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম অর্থাৎ সেনাপতির কার্য করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণের মর্যাদা পাইয়াছিলেন। সুতরাং বর্তমান যুগেও অব্রাহ্মণদের কাহাকেও ব্রাহ্মণের গুণে ভূষিত দেখিলে অথবা যজনযাজন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি রূপ ব্রাহ্মণের কার্য করিতে দেখিলে কেন তাহাকে ব্রাহ্মণের তুল্য সম্মান দেওয়া হইবে না—এইরূপ প্রশ্ন করিলে কেহই ইহার সদুত্তর দিতে রাজী হইবেন না।

এক্ষণে হয়তো একত্রে বসিয়া আহাদির প্রথা লইয়া কথা উঠিতে পারে। আমার কথা হইল একত্রে আহারাদি করিতে যদি কাহারও রুচি না হয় তাহা হইলে উহা করিবার আবশ্যকতা নাই। হিন্দুস্থানীদের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে: "আপরুচি খানা পর্‌রুচি পর্‌না।" আহারাদি নিজ নিজ রুচি অনুযায়ীই বরং করা ভাল এবং সামাজিক খাওয়া-দাওয়ার বৈষম্য থাকিলেও জাতীয় একতার কিছুই হানি হইবে না; কেননা পরস্পরের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষই হইল জাতীয় একতার পরমশত্রু। য়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে সকলে সকলের সহিত একত্রে খাইতে রুচি না হইলে এক টেবিলে বসিয়া খায় না। অনেক রেষ্টুরেণ্ট বা রেস্তোয়াঁতে আলাদা আলাদা টেবিলে খাওয়ার বন্দোবস্ত আছে, তাহাতে একজনে একলা আলাদা খাইয়া থাকে। নব আগন্তুক (stranger) কোন লোকের সঙ্গে বসিয়া আহার করিতে অনেকেই রাজী হয় না। অন্তরে ঘৃণা না থাকিলে এবং 'আমি অপরের অপেক্ষা অনেক বড়' এই অভিমান হৃদয়ে না রাখিলে মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা এবং বন্ধুত্ব (friendliness) অবশ্যই অব্যাহত থাকিবে। এই গুণ-গুলিই একতার ভিত্তিস্বরূপ। প্রত্যেক মানুষ যখন অপর মানুষকে ভ্রাতৃজ্ঞানে আদর করিতে শিখিবে এবং কেউ ছোট হউক বা বড়ই হউক—পরস্পর পরস্পরকে সম্মানের সহিত ব্যবহার করিতে শিখিবে তখনই জানিবে যে জাতিই হউক সকল মানুষের ভিতরে একটি অখণ্ড একতার ভাব অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হইবে। তবে আহার-বিহার ও আচার-বিচার লইয়া বাড়াবাড়ি করাও ভাল নয়। আচার-বিচার

সমস্তই সমাজশৃঙ্খলার জন্য। নিজ নিজ প্রবৃত্তি লইয়া কথা। ভাল না লাগিলে একসঙ্গে সকলে না খাইতেও পারে, কিন্তু তাই বলিয়া একজাত অপরকে যে ঘৃণা করিবে ইহা অত্যন্ত অন্যায়। ইহা হইতেই সমাজের অধঃপতন হইয়া থাকে।

ইহার পর প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, বর্তমান স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক কিনা। যদি হয় তাহা হইলে তাহার আদর্শই বা কি রূপ হইবে? ইহার উত্তর এই যে, বেদে স্ত্রী এবং পুরুষের সকল বিষয়ে সমান অধিকারের কথাই বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদে আছে যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি আপনার শরীরকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন, তাহার অর্ধাঙ্গ পুরুষ (male) হইল এবং অপরাংশ হইল নারী (female)। অর্ধনারীশ্বর ও হর-গৌরীর মূর্তি ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কেননা সামাজিক ধারা ও প্রভাবের বশবর্তী হইয়াই শিক্ষা অথবা দর্শন সকল দেশেই গড়িয়া উঠিয়াছে। অর্ধনারীশ্বরের মূর্তি বাস্তবিকই স্ত্রী ও পুরুষের সমান অধিকারজ্ঞাপক নিদর্শন বা প্রতীক (symbol) ছাড়া আর কিছুই নয়। এই নিদর্শনকে ভিত্তি করিয়াই বৈদিক ঋষিরা নারীজাতিকে সকল বিষয়ে সমান অধিকার দিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের অনেকগুলি মন্ত্রই আবার বিদুষী নারীদের মুখ হইতে প্রথমে উচ্চারিত হইয়াছিল এবং তাঁহারাই কতকগুলি ঋক্‌মন্ত্রের মন্ত্রদ্রষ্ট্রী ঋষি বলিয়া বিদিত।

নারীকে শাস্ত্রে সহধর্মিণী বলা হইয়াছে। বৈদিক যুগে স্ত্রীর সহযোগিতা ব্যতীত কোন পুরুষই যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া

করিতে পারিত না,[১] আর সেজন্য ধর্মজগতে নারীকে পুরুষের 'সহধর্মিণী' বলা হইয়াছে। একত্রে ধর্ম অর্থাৎ যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়া আচরণ করে বলিয়াই সহধর্মিণী। কিন্তু হিন্দু-সমাজে আজ যথেষ্ট অবনতি আসিয়া দেখা দিয়াছে। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রণব উচ্চারণ এখনও নিষিদ্ধ এবং তাহাদের কোন বিষয়েই শিক্ষা দান করিতে এখনকার পুরুষেরা একরকম নারাজ। প্রকৃত হিন্দুধর্মে নারী ও পুরুষে এরূপ অধিকার বৈষম্য নাই।

তবে বর্তমানে এই সব অনুদার প্রথার অনেক পরিবর্তন হইতেছে বা হইয়াছে। বাস্তবিক আমাদের কর্তব্য যে, ছেলেদের মতন মেয়েদেরও সমানভাবে সর্ববিষয়েই শিক্ষা দান করা। তাহার পর এদেশেও (ভারতে) স্কুল ও কলেজ-গুলিতে ঠিক ঠিক ভাবে moral ও spiritual training (নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা) দেওয়া হয় না। এই সমস্তেরই বিধি ও বন্দোবস্ত হওয়া একান্ত পক্ষে উচিত। বালিকাদেরও শারীরিক ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। সহজ সহজ প্রাণায়ামও তাহাদের শিক্ষা দিতে হইবে। আমেরিকার হাইস্কুলগুলিতে সর্বত্রই ড্রিল শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে breathing exercise এবং concentration-ও (প্রাণায়াম ও মনঃসংযোগ সম্বন্ধেও) শিক্ষা দেওয়া হয়। সুতরাং এদেশে (ভারতে) মেয়েদের character building-এর উপযোগী (চরিত্র গঠনের উপযোগী) শিক্ষা এবং ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে হইবে। মেয়েদের জন্য

১। 'সস্ত্রীকো ধর্মমাচরেৎ, ইদং মন্ত্রং পত্নী পঠেৎ।'
—গৃহ্যসূত্র

সর্বত্রই স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হওয়া একান্ত উচিত। তাহার পর বালিকাদের শিক্ষা দিবার জন্য স্ত্রীশিক্ষকই নিযুক্ত করা কর্তব্য। রোম্যান ক্যাথলিকদের যেমন মাদার সুপিরিয়র (mother superior) থাকে সেইরূপ মেয়েদের স্কুল ও কলেজগুলি মহিলা অধ্যক্ষের দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত হওয়া সঙ্গত। মেয়েদের শরীর ও মনের উন্নতির জন্য যাহা যাহা শিক্ষা দান করা আবশ্যক তাহার পন্থা প্রণালী মাদার সুপিরিয়রেরাই মেয়েদেরশিখাইয়া দিবেন পুরুষদের সে বিষয়ে ভাবিবার আবশ্যক নাই। ক্যাথলিক সিস্টারদের মতো শিক্ষয়িত্রীরা অবিবাহিতা ও ব্রহ্মচারিণী হইলে ভাল হয়। আমেরিকার লস্‌এঞ্জেলিসে একটি হাইস্কুলের প্রিন্সিপালকে দেখিয়াছি তিনি একজন অবিবাহিতা ও ব্রহ্মচারিণী ভদ্র মহিলা। সেখানকার অন্যান্য শিক্ষকও সকলেই স্ত্রীলোক। তাঁহারা সমস্ত কার্যই পুরুষের অপেক্ষা বরং সুন্দররূপেই কবিতে পারেন। তাঁহারাই দেশের কল্যাণ, সমাজের উন্নতি, ধর্মশিক্ষা ও চরিত্রগঠন প্রভৃতি কার্যগুলির ভার লইয়াছেন। তাঁহারাই দেশে সুরাপান নিষেধসূচক (prohibition of liquor) আইন পাশ করাইয়াছেন। য়ুরোপের যুদ্ধে বিজয় ও শান্তি নারীদের জন্য সম্ভব হইয়াছে। তাঁহারা পুরুষসৈনিক সাজিয়া নির্ভীক চিত্তে আমাদের দেশের চাঁদবিবি ও ঝাঁন্সীর রাণীর ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখে বীরের ন্যায় দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারাই নিজেদের সন্তানদের ও স্বামীকে দেশের জন্য প্রাণ দিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন। সুতরাং প্রত্যেক ভারতীয় নারীকে পাশ্চাত্য দেশীয় ঐ সমস্ত নারীদের আদর্শ অনুসরণ

করিতে হইবে। আমাদের ভারতেও একসময়ে তাহা ছিল, কিন্তু এখন তাহার আর কিছুই নাই।

নারীজাতি সকল দেশেই সমান। জননীর হৃদয়ে বীরভাব ও নির্ভীকতা ইত্যাদি সদ্‌গুণ বর্তমান থাকিলে তবেই সন্তানগণ সেই সকল গুণের অধিকারী হইতে পারে। জননিগণ যদি দুর্বল ও ভীতা হন তবে তাঁহাদের সন্তানেরাও দুর্বল ও ভয়শীল হইবে। সেজন্য মনু বলিয়াছেন "একজন মাতা সহস্র পিতার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। সুতরাং নারীদের শিক্ষিত করিতে হইবে। নারীরাই সমাজ ও জাতিব মেরুদণ্ড। মহীয়সী নারীরাই বীর ও দেশপ্রেমিক সন্তানগণের জননী হইতে পারেন। সদ্‌গুণসম্পন্না নারীরাই দেশের যথার্থ কল্যাণ বরণ করিয়া আনেন। এজন্য স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন করা সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয়।

তবে স্ত্রীশিক্ষা অর্থে বিলাসিতা শিক্ষা করা অথবা মস্তিষ্কের অপব্যয় করা নয়। মেয়েদের জন্য প্রত্যেক সহর ও গ্রামে বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপন করিতে হইবে। হাইস্কুল-গুলিতে রন্ধনবিদ্যা (cooking) প্রভৃতিও লেখাপড়ার সহিত শিখাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেই কুকিংক্লাশে কোন্ কোন্ খাদ্য দ্রব্য কিরূপে রান্না করিতে হইবে। কোন্ মসলা দিয়া রান্না করিলে খাদ্য সহজে হজম হইবে এবং আমাদের অস্থি, মাংস, স্নায়ু, মস্তিষ্ক প্রভৃতির পুষ্টিসাধন করিবে সেই বিষয়গুলিই প্রমাণসহকারে শিক্ষাদান করিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে। নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ অনুসারে খাদ্যের তালিকা দেয়ালের গায়ে সর্বদা সংযুক্ত থাকিবে। তাহা দেখিয়া শিশুকাল হইতে ছেলেমেয়েরা

কোন্ দ্রব্য খাদ্য ও কোন্ দ্রব্য অখাদ্য তাহা শিক্ষা করিবে। কেবল অন্ধবিশ্বাসের উপর নির্ভর না করিয়া কিংবা কেবল শাস্ত্রের দোহাই না দিয়া বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক তত্ত্বের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এবং যুক্তির সহিত বিচার করিয়া সকল বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে নারীরা শিক্ষা করিবেন।

আমাদের দেশের লোকেরা স্বাস্থ্যের উপযোগী খাদ্যকে মুখরোচক নয় বলিয়া ত্যাগ করে এবং যে খাদ্য স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বা যাহা হইতে নানাবিধ ব্যাধির উৎপত্তি হয় সেই অখাদ্যকে তাহারা উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করে। আহারের দোষেই আমাদের দেশে এত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। অপরিষ্কার দুগ্ধ হইতে কলেরা, যক্ষা, টাইফয়েড, ডায়াবিটিস্ প্রভৃতি রোগের উৎপত্তি হয়। যাহারা অত্যন্ত লঙ্কার ঝাল খায় তাহারা অর্শ, রক্তামাশায়, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগে ভুগিতে থাকে। যাহারা মেঠাই সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতি মিষ্টান্ন অধিক পরিমাণে খায় তাহাদের কৃমি, বহুমূত্র প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ হয়। বাঙ্গালা দেশে সকলেই আবার ভাতের সারভাগ ফেলিয়া দিয়া অসার অংশটাই গ্রহণ করে, সুতরাং তাহাতে শরীরে মেদ ও মাংসের ভাগই বৃদ্ধি করে।

খাদ্যাখাদ্যের বিচারসম্বন্ধেও সকলের জ্ঞান থাকা উচিত যেমন কোন্ খাদ্য এক ঘণ্টায় হজম হয় আবার কোন্ কোন্ খাদ্য হজম হইতে দুই ঘণ্টা হইতে পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে ইহা জানা দরকার। সুতরাং এই সকল বিষয়ে বিদ্যালয়ে বালক এবং বালিকাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। ইহা ছাড়া সেলাই ও নানা প্রকারের সূচীশিল্প শিক্ষা দিতে হইবে। ইহাতে

তাহারা বড় হইয়া স্বাবলম্বী হইতে পারিবে এবং নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জন করিতে শিখিবে।

বাস্তবিক নারীরা যতদিন না সুশিক্ষিতা হইয়া নিজেদের পায়ে দাঁড়াইতে পারিবেন ততদিন আমাদের দেশের কল্যাণ ও স্বাধীনতা আশা করা বৃথা। স্বাধীনতা কেবল পুরুষেরাই আনিবে এরূপ মনোবৃত্তি রাখা ঠিক নয়। এই ব্যাপারে নারীদিগেরও সহায়তা চাই। নারীবা পুরুষের পাশে যখন সমান অধিকার লইয়া দাঁড়াইবেন তখনই দেশেব কল্যাণ হইবে। ভারতীয় নারীগণ তাঁহাদের আমেরিকা ও য়ুরোপের ভগ্নিদিগের অপেক্ষা কোন বিষয়েই অযোগ্যা নহেন। শিক্ষা, সুযোগ ও সুবিধা পাইলে তাঁহারাও সকল প্রকার কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইবেন। পুরুষ ও নারীদের পরস্পর একত্র সহযোগ ও সহানুভূতিই দেশের স্বাধীনতাকে ফিরাইয়া আনিতে পারিবে। ব্রহ্মচারিণীরূপে হাজার হাজার ভারতীয় বীরনারী দেশের স্বাধীনতার জন্য যখন সত্যই আবার জীবনোৎসর্গ করিবেন এবং এইরূপ হইলে জানিবেন—স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীস্বাধীনতার আদর্শ সফল এবং মহিমামণ্ডিত হইবে।

এখানে আরও একটি কথা বলিবার আছে যেমন শাস্ত্রে আছে: 'মাতৃবৎ পরদারেষু'.—অর্থাৎ নিজের স্ত্রী ব্যতীত আর অন্য সমস্ত স্ত্রীলোককে মাতৃজ্ঞানে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা উচিত। ইহাই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা ও আদর্শ। সকল নারীকে জগন্মাতার প্রতিমূর্তিরূপে দেখিয়া পুরুষ-মাত্রেরই নারীদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা উচিত। ইউরোপ

ও আমেরিকা নারীদের প্রতি এইরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শনের দ্বারাই সত্যকার কল্যাণের পথে অগ্রসর হইয়াছে। আমাদের দেশেও পূর্বে এইরূপ প্রথাই ছিল। মনু বলিয়াছেন: 'যত্র নার্যস্তু রম্যন্তে নন্দন্তে তত্র দেবতা',—অর্থাৎ যেখানে নারীদের শ্রদ্ধা করা হয় সেখানেই দেবতারা আনন্দিত হন। মনু আরও বলিয়াছেন: 'নারীকে পুষ্পের দ্বারাও কখনো আঘাত করা উচিত নহে এবং যে গৃহে নারীর চক্ষের জল পড়ে, সে কোনদিনই কল্যাণ হইতে পারে না'। এদেশে পুরুষগণ অবশ্য সে দায়িত্বজ্ঞান একেবারে বিসর্জন দিতেই বসিয়াছেন। কিন্তু দেশ ও জাতির উন্নতি সেদিনই হইবে যেদিন এদেশ ও সমাজের পুরুষেরা নারীদিগকে মাতৃজ্ঞানে আবার শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতে শিখিবেন। স্ত্রীলোকদের পক্ষে যেমন নিজের পতিকে শ্রদ্ধা করা প্রয়োজন, পুরুষদেরও কর্ত্তব্য সেরূপ নারীগণকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা। এইরূপ পবিত্র আচরণ ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার বিনিময়ের ভিতর দিয়াই স্ত্রী ও পুরুষের সমান অধিকার (equal right) সমাজে আবার ফিরিয়া আসিবে। এইযুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি আপনার পত্নীকে জগন্মাতার ন্যায় পূজা করিয়া সকল নারীকে আদ্যাশক্তির প্রতিমূর্তি বলিয়া সম্মান দান করিয়াছেন।

এখন তৃতীয় প্রশ্ন হইবে: খাদ্যাখাদ্যের বিচার ব্রহ্মচারীর পক্ষে কিরূপ হওয়া উচিত? ইহার উত্তর হইবে: ব্রহ্মচারীর পক্ষে খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে বিচার করা অবশ্যই কর্তব্য। যে সকল দ্রব্য খাইলে কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগুলি প্রশমিত থাকে সেই সকল খাদ্যদ্রব্য ব্রহ্মচারীর পক্ষে সুখকর খাদ্য বলিয়া

পরিগণিত হইবে। যাহা খাইলে মন চঞ্চল ও অস্থির হয় এরূপ দ্রব্যকে অখাদ্য বলিয়াই ত্যাগ করিতে হইবে। সকল জাতির ভিতর এমন অনেক লোক আছেন যাঁহাদের মাছ-মাংসাদি খাইলে ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি সত্যই প্রবল হইয়া উঠে। তাঁহাদের পক্ষে আমি বলি যে, নিরামিষ খাদ্যই প্রশস্ত। কিন্তু আবার এমন অনেক লোকও আছেন যাঁহারা মাছ-মাংসাদি আহার করিয়াও যথেষ্ট পরিমাণে সংযত থাকিতে পারেন, মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করিতে পারেন, কোনরূপ মানসিক চাঞ্চল্য তাঁহাদের মোটে উপস্থিত হয় না। আমি বলি যে, তাহাদের পক্ষে আমিষ আহার কল্যাণকর। তবে এক নিয়ম সকলের পক্ষে আবার সমানরূপে প্রচলিত হইতে পারে না। আহারের উদ্দেশ্য হইল শরীর ধারণ করা। যাহার স্বাস্থ্য যেরূপ তাহার পথ্য অর্থাৎ খাদ্য সেই অনুযায়ী হওয়া উচিত। আমাদের শাস্ত্রেও বলা হইয়াছেঃ 'তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা',—অর্থাৎ তেজস্বী স্বভাববিশিষ্ট লোকদের পক্ষে কিছু দোষের নয়, সর্বভুক্ অগ্নি যেমন ভাল এবং মন্দ সকল দ্রব্যকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, অমিত মনঃশক্তিবিশিষ্ট লোকদেব পক্ষেও সেরূপ। তাঁহারা সকল প্রকার খাদ্যই হজম করিয়া শম-দমাদিগুণে সর্বদা বিভূষিত থাকিতে পারেন। শাস্ত্রের এই উপদেশকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেনঃ "যে ব্যক্তি গোমাংস খাইয়াও ভগবানে মনকে ঠিক রাখিতে পারে সে হবিষ্যাশী বিষয়াসক্ত সংসারী ব্যক্তির অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ"।

আর একটি কথা এই সম্বন্ধে আমাদের ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। আমাদের শাস্ত্রে একটি উক্তি আছেঃ

'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ।' এই শ্লোকের অর্থ লইয়া অনেকে অনেক রকম অর্থ করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর আহার সম্বন্ধে আবার ভিন্ন ভিন্ন নিয়মও নির্দিষ্ট আছে। এই শ্লোকের কদর্থ করিয়াই আমাদের দেশে ছুঁৎমার্গের সৃষ্টি হইয়াছে। মাদ্রাজ অঞ্চলে আচারী বৈষ্ণবদিগের ভিতর আহারে দৃষ্টিদোষের প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু আচার্য শঙ্কর এই 'আহার' শব্দের অর্থ করিয়াছেন: 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ, যথা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দ', অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ পবিত্র হইলে চিত্তও পরিশুদ্ধ হয়, আর অপবিত্র হইলে চিত্ত মলিন হইয়া থাকে। আচারী বৈষ্ণবেরা কিন্তু আহারের 'আহ্রিয়তে যত্তৎ আহারঃ' রূপ অর্থকে ত্যাগ করিয়া 'আহার' অর্থে খাদ্যদ্রব্য এই বলিয়া দেশে ছুঁৎমার্গের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ফলে সকলের জাতীয় উন্নতির পক্ষেও বিঘ্ন আনিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের গোঁড়ামির মাত্রাও আবার এতদূর পর্যন্ত উঠিয়াছে যে, খাইবার সময় কেহ কাহারও খাদ্যের প্রতি যদি দৃষ্টিপাতও করে তাহা হইলে তাঁহারা সেই খাদ্যকে অখাদ্য বলিয়াই ত্যাগ করিবেন! এইরূপ যুক্তিহীন বিধি আমি স্বয়ং আচারী বৈষ্ণবদিগের মঠে দেখিয়াছি। এই সকল ছুঁৎমার্গীরা এতই কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও আত্মাভিমানী যে, তাঁহারা অন্য সকলকেই ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন এবং আপনাদের সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্বদা অভিমান করেন। এইরূপ গোঁড়ামীর জন্যই ঋষিদের সনাতন ধর্মের উদার আদর্শও লোপ পাইতে বসিয়াছে।

সুতরাং এই সকল কুসংস্কার যতদিন না আমরা দূর করিতে পারিতেছি ততদিন আমাদের দেশের এবং নিজেদের কল্যাণ

হইতে পারে না। যতদিন আমাদের হৃদয়ে প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর, আমাদের ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের ঘৃণার ভাব থাকিবে, ততদিন পরস্পরের প্রতি ভালবাসার ভাব আসিতে পারে না, আব ভালবাসা না থাকিলে জাতীয় একতার উদ্ভব হওয়া অসম্ভব। আপনাবা সকলেই হিন্দু ও মুসলমানের একতার পক্ষপাতী। আমিও ইহা সমর্থন করি এবং এই মনোবৃত্তির সত্যই প্রশংসা করি। কিন্তু ইহার পূর্বে আমাদের হিন্দুজাতির ভিতর অন্ততঃ একতার বীজ বপন করিতে হইবে। প্রথমে হিন্দুরা হিন্দুদেব প্রীতিব চক্ষে সকলকে দেখিতে শিখুন, সকলে একমত হইতে চেষ্টা করুন, পরে মুসলমান ও খৃষ্টানদিগের সহিত একত্রিত হইবাব দাবী তাঁহারা করিবেন। সত্যকথা বলিতে গেলে, মুসলমান বা খৃষ্টানদিগের মধ্যে একতা ও জাতীয়তার প্রীতি অনেক পরিমাণেই আছে, কারণ তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঘৃণার ভাব অনেক কম। তাঁহাদেব মধ্যে জাতাজাতি লইয়া মতভেদ নাই ; এ বড় কিম্বা এ ছোট এইরূপ বুদ্ধিও তাহাদের মধ্যে কম। তাহা ছাড়া তাঁহারা নিজেদের সমধর্মদিগকে ভ্রাতৃজ্ঞানে আলিঙ্গন দান করেন। কিন্তু হিন্দুবা হিন্দু-মাত্রকেই কি ভাই বলিয়া যথার্থ ভালবাসিতে শিখিয়াছেন? আমি বলি তাঁহারা এখনও ইহা শিখেন নাই আর সেজন্যই হিন্দুবা অন্য সমস্ত জাতির নিকট ক্রমশঃ অবজ্ঞার পাত্র হইয়া দাঁড়াইতেছেন। যখন পাঁচজন হিন্দু একই গোত্রের, যেমন দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, পূর্ব এবং মধ্যদেশের ব্রাহ্মণদের পরস্পরে একত্রে বসিয়া এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ভাইদের ন্যায় আহারাদি করিতে পারেন না তখন সেক্ষেত্রে সকল

হিন্দুর একতা হওয়া অসম্ভব। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যান্য জাতিদের ভিতরেও শ্রেণীগত অনেক বৈষম্য আছে। এক-গোত্র আবার অন্য গোত্রে কখনও বিবাহ দিবে না অথবা সেই গোত্রের লোকের সহিত আহার করিবে না। এইরূপ এক এক জাতির ভিতরেও অসংখ্য ভাগ আছে। ব্রাহ্মণদের ভিতর তো রাঢ়ী, বারেন্দ্র, কনৌজ, মৈথিলি, দক্ষিণী এইসব আরও অনেক ভেদও আছে। গোত্রের তো কথাই নাই, সুতরাং এ অবস্থায় একতা কিম্বা মনের মিল সকলের ভিতর কিরূপে হইতে পারে? অখণ্ড হিন্দুজাতিকে আমরা এইরূপে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছি অথচ অখণ্ডের ভাণ করিতে আমরা এখনও মোটেই পশ্চাদ্‌পদ নহি। সুতরাং এইরূপে হিন্দুরা যখন হিন্দুদিগের সহিতই মিলিয়া থাকিতে পারিতেছেন না, নিজেদের ভিতরে অসংখ্য দলের সৃষ্টি করিয়াছেন তখন মুসলমান বা খৃষ্টানদিগের সহিত তাঁহারা আবার মিলিয়া থাকিবেন—ইহা কি করিয়া হইতে পারে?

পূর্বে ইহুদিরা, পার্শিরা ও জাপানীরা যেরূপ নিজেদের 'ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র' বলিয়া বিশ্বাস করিত এবং অপর সব জাতিকে ঘৃণা করিত, হিন্দুরা এখন প্রায়ই সেইরূপই করিতেছেন। উচ্চবংশীয় শিক্ষিত হিন্দুরা আবার নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত হিন্দুদের মানুষরূপে গণ্য করিতে চান না; নিম্ন-বর্ণের বা নিম্নশ্রেণীর লোকদের আবার অভিজাত বংশীয়েরা স্পর্শ পর্য্যন্তই করিতে চাহেন না। জল বা খাদ্য গ্রহণের সময়েও সেইরূপ গোঁড়ামী। আর সেজন্যই সমস্ত নিম্ন-শ্রেণীর লোকেরা হিন্দুসমাজে আজও পর্য্যন্ত পতিত ও লাঞ্ছিত হইয়া আছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে ইহারাই আমাদের

জাতির মেরুদণ্ড। ইহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া আমাদের পেটের অন্ন যোগাইতেছে, কিন্তু ইহাদিগকে আমরা সমাজ হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছি; আমরা তাহাদের দেখিতে পর্যন্ত পারি না। তাহাদের জাতিতে তুলিয়া লইবার শক্তি ও ইচ্ছা আমাদের নাই। সুতরাং এই হইল আমাদের বর্তমান হিন্দুসমাজ। আমি বলি ইহার কারণ অজ্ঞানতা, সঙ্কীর্ণতা, আত্মাভিমান ও অপরের প্রতি ঘৃণার ভাবকে পোষণ। এখনও হিন্দুদের ভিতরে আত্মচেতনার উদয় হয় নাই আর সেজন্য তাঁহারা আপনাদের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া এখনও অভিমান করিয়া থাকেন। ইহা অজ্ঞানতা ব্যতীত আর কি? যেদিন এই অজ্ঞানতা দূর হইবে সেইদিন হিন্দুরা অপর হিন্দুকে যতই সে নীচ হউক না কেন যথার্থ ভালবাসিতে শিখিবে, আর সেইদিনই হিন্দুদিগের নিজেদের মধ্যে অপরাপর জাতির সহিত একতা স্থাপিত হইবে এবং তাঁহাদের কল্যাণও ফিরিয়া আসিবে। সেইদিন হইতেই তথাকথিত 'অস্পৃশ্য' (untouchable) সকল ব্যক্তিকেই হিন্দুরা নিজেদের ভ্রাতৃতুল্য জ্ঞান করিবেন। অস্পৃশ্যতা রূপ মহাপাপ ও পরস্পরের প্রতি ঘৃণার ভাব হিন্দুসমাজ হইতে বিদূরিত না হইলে হিন্দুজাতির কল্যাণ কোনদিন ফিরিয়া আসিতে পারে না।

এদেশে জনসাধারণে বুঝিয়া থাকে যে, পুরুষের পক্ষে জাতিরক্ষা করা এবং নারীদের পক্ষে শালীনতা ও লজ্জা রক্ষা করাই হিন্দুধর্মের একমাত্র মর্ম এবং সকল শাস্ত্রের উদ্দেশ্যও তাই। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। প্রকৃত হিন্দুধর্মে এরূপ গোঁড়ামির স্থান নাই। সকল শ্রেণী ও সকল জাতিকে

প্রীতি ও উদারতার চক্ষে দেখাই হিন্দুধর্মের আদর্শ ও লক্ষ্য।

এক্ষণে চতুর্থ প্রশ্ন হইতে পারেঃ ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসী এই চারি আশ্রম প্রাচীন ভারতে রাখিবার কি আবশ্যকতা ছিল? হিন্দুশাস্ত্রে প্রত্যেক মানুষের জীবনকে চারিভাগে (stage) বিভক্ত করা হইয়াছে। যেমন ব্রহ্মচারী (student life), গৃহস্থ অর্থাৎ (house-holder life); বানপ্রস্থ (retited life of a hermit) এবং ভিক্ষু (speri-tual life of renunciation)। এই বিভাগগুলি সত্যই সুন্দর এবং আদরণী বটে। কিন্তু প্রথমে আমাদিগের জীবনের কি উদ্দেশ্য তাহাই বুঝিতে হইবে। সকল ধর্মশাস্ত্রে ঈশ্বরলাভকে জীবনের চরমউদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণিত করা হইয়াছে। বিচার করিয়া দেখিলে ইহা বুঝিতে পারা যায় পার্থিব সকল বস্তুই ক্ষণস্থায়ী, দুঃখজনক ও মৃত্যুশীল। বিষয়সম্পত্তি, অর্থ এবং আত্মীয়স্বজন ইহারা মৃত্যুর পরে কেহই সঙ্গে যাইবে না। এই সমস্তই ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং অনিত্য সংসারের মধ্যে বিচার করিলে দেখা যায় এক ঈশ্বরই নিত্য পদার্থ। বেদ এবং উপনিষদেও ঈশ্বরলাভ যে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য পুনঃপুনঃ একথাই বলা হইয়াছে। আর এই ঈশ্বরলাভ কিরূপে ও কী উপায়ে হইতে পারে তাহার ক্রমিক সোপানের নিদর্শন স্বরূপ পার্থিব জীবনকে ঋষিরা চারিটি আশ্রমে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এই চারিটির মধ্যে প্রথম আশ্রম ব্রহ্মচর্য। প্রত্যেক হিন্দুসন্তান পাঁচ বৎসর হইতে বার বৎসর বয়স পর্যন্ত গুরুগৃহে অর্থাৎ বিদ্যাপীঠে যাইয়া অধ্যয়ন করিবে।

প্রাচীন কালের স্বদেশী বিদ্যাপীঠ আজকালকার গুরুকুল বা ঋষিকুল আশ্রমের মতো ছিল। সেই বিদ্যাপীঠে বিদ্যার্থীরা গুরুর সহিত একসঙ্গে বাস করিত এবং গুরুও সর্বদা তাঁহাদের তত্ত্বাবধান করিতেন। ছাত্রদিগকে এইরূপ শিক্ষা দান character building-এর (চরিত্র গঠনের) পক্ষে বিশেষ উপযোগী ছিল। বর্তমানে বিদ্যালয়গুলিতে কিন্তু ছাত্রদের চরিত্রকে সেরূপে গঠন করা হয় না। সেজন্য আমি বলিব অন্ততঃ বর্তমান sytem of education (শিক্ষা-প্রণালী) আমাদের জীবন ও জাতির ঠিক আদর্শোপযোগী হয় নাই।

পাঁচ বৎসর হইতে বার বৎসব বয়সের ছাত্রগণকে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া যায় সেইসব সংস্কার তাহাদের জীবনে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঠিক জাগরূপ থাকে। এই কারণে রোম্যান ক্যাথলিক খৃষ্টানরা দশ হইতে বার বৎসরের সন্তানদের শিক্ষা দিতে এত আগ্রহ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, পাঁচ হইতে বার বৎসরের বালক বা বালিকাকে শিক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের নিকট পাঠাইতে হইবে, এই শিক্ষার পর তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাতে বিশ্বাস করিতে পারে। বাস্তবিক ইহাও ঠিক যে, ক্যাথলিক খৃষ্টানদের নিকটে শিক্ষাপ্রাপ্ত বালক-বালিকারা মৃত্যুর পূর্বে কিন্তু তাহাদিগের মতো বিশ্বাস রাখিয়াই মরিবে। এই কথা কিন্তু খুবই সত্য এবং ইহার মর্মও আমাদের স্মরণ রাখা বিশেষ কর্তব্য। ব্রহ্মচর্যজীবনের চরমউদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ সুতরাং ঈশ্বর লাভ অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের উপলব্ধি সম্বন্ধে উপদেশের বীজগুলি বাল্যকাল হইতেই সকলের হৃদয়ে বপন করিতে হইবে। প্রাচীন কালে ব্রহ্মচারীরা গুরুগৃহে

পঁচিশ হইতে ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিতে পারিত যে, সন্ন্যাস-আশ্রমই জীবনের চরম উদ্দেশ্য। কিন্তু বাংলাদেশে এখনকার সন্তানদের অবিভাবকেরা নাকি বলেন যে, তাঁহাদের সন্তানেরা যদি চোর, বদমাইস, মাতাল, অথবা অসচ্চরিত্র হইয়াও সংসারী হয় তবুও তাহা ভাল, তথাপি যেন তাহারা কখনও সংসার ছাড়িয়া ধর্মনিষ্ঠ ও সন্ন্যাসী না হয়। মনের এইরূপ হীনগতি বাস্তবিক হিন্দুজাতির এই চরম অবনতি আনিয়া দিয়াছে।

আজকাল আমাদের জীবনের আদর্শও অনেক ছোট হইয়া গিয়াছে। বর্তমান হিন্দুসমাজে কেবল এক গৃহস্থাশ্রম আছে আর তিন আশ্রমের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। আর সেজন্য বলিতে গেলে শিক্ষা, সমাজ ও ধর্মেরও অনেক অবনতি হইয়াছে। আমি কিন্তু চারি আশ্রমের আদর্শের উপকারিতা এখনও সমর্থন করি। যদি পুনরায় এই চারিটি আশ্রমের আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় তবেই দেশের এবং সমাজের মঙ্গল আবার ফিরিয়া আসিবে। প্রাচীন কালে অনেকে আবার ব্রহ্মচারী থাকিয়া সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিত। যাহারা আজীবন ঐরূপ ব্রতপালন করিতে অসমর্থ হইত তাহারা গুরুর আদেশ লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিত এবং বিবাহ করিয়া আদর্শ গৃহস্থ হইত। তখনকার সন্তানদের পিতামাতারা বার বৎসরের বালকের সহিত আট বৎসরের বালিকার বিবাহ দিবার জন্য কখনও লালায়িত হইতেন না অথবা সন্তান বিক্রয়রূপ বরপণের টাকা লইয়া নিজেদের ধারা অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে। শিক্ষার নাম করিয়া

কুশিক্ষার আদর্শেই আমাদের জীবনকে অনেকাংশে গড়িয়া তুলিতেছি। সমাজের উদারতা এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ধর্মের সাধনাও মলিন হইতে বসিয়াছে। তবে সনাতন হিন্দুসমাজের শরীরে এরূপ পঙ্কিলতা যে শুধু আজই আমরা দেখিতে পাইতেছি তাহা নহে, চিরদিনই এইরূপ ছিল, তবে কিছু কম আর বেশী। হিন্দুজাতি 'চিরদিনই উদারতার ভাব পোষণ করিয়া আসিয়াছে; একতার এমন অভাব তাহাদের কোনদিনই ছিল না। মধ্যযুগীয় তথাকথিত ব্রাহ্মণদের কুপ্রভাবে নিষ্পেষণে সমগ্র সমাজ কতটা জর্জ্জরিত হইলেও বর্ত্তমান কালে হিন্দুজাতি নিজেদের সামাজিক অবনতির কারণ বুঝিতে পারিয়াছে এবং তাহা দূর করিবার জন্য অনেকেই সচেষ্ট হইয়া উঠিতেছেন। অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ, নারীজাতির শিক্ষাবিহীনতা প্রভৃতি সামাজিক ব্যাধি দূর করিবার জন্য দেশনেতারা এখন উদ্যোগী ও কর্মরত হইতেছেন। ইহাই জাতির পক্ষে আশার কথা। এইভাবে দেশ ও সমাজের মধ্য হইতে অবনতিকর সমস্ত উপাদান দূর করিয়া দিয়া জাতির উন্নতিকর যে সমস্ত আন্দোলনের সূচনা এদেশে হইয়াছে তাহারই প্রসারের ফলে হিন্দুজাতির অদূর ভবিষ্যতে নিজেদের জাতীয় মহিমাকে পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হইবে। সমাজ, শিক্ষা ও ধর্মের উদার আদর্শে দেশ পুনরায় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠুক, তাহার বিলুপ্ত গৌরব পুনরায় নবীন আলোকে উদ্ভাসিত হউক ইহাই আমি সর্বদা প্রার্থনা করি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

॥ মানব-জীবনের আদর্শ ॥

এখনকার দিনে আমাদের দেশে ধর্ম জিনিষটা শুধু পুঁথিগত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশের অনেকেরই এক ভ্রান্ত সংস্কার আছে যে, পুস্তকে যাহা লেখা থাকিবে তাহাকেই শুধু ধর্ম বলিয়া মানিয়া লইবে—তা সে ভালই হউক আর মন্দই হউক। ইহা এক মস্ত কুসংস্কার। বাল্যকাল হইতেই ধর্মজীবন আরম্ভ করা উচিত। আমি নিজে কুড়ি বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী হইয়াছিলাম। আমি যখন দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের কাছে প্রথম যাই তখন আমার বয়স ষোল বৎসর। তাঁহার নিকট যাইবার আগে আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল না। বাইবেল কিম্বা আমাদের শাস্ত্রে যাহা লেখা আছে আমি তখন তাহা আদৌ বিশ্বাস করিতাম না এবং সে সমস্ত উক্তিকে কবির কল্পনা মনে করিয়া আমি একেবারে উড়াইয়া দিতাম। বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, চৈতন্যদেব প্রভৃতি মহামানবেরা যে ঈশ্বরের অবতার আমি তখন তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। মানুষ যে পর্যন্ত না কোন একটা জিনিষের সাক্ষাৎ প্রমাণ পায় ততক্ষণ সে বিষয়ে তাহার বিশ্বাস হয় না। আমাদের (শ্রীরামকৃষ্ণের সর্ব্বত্যাগী শিষ্যবৃন্দের) মধ্যে তখন অনেকেরই সেই অবস্থা হইয়াছিল। মনের ঠিক এই সংঘর্ষময় অবস্থাতে আমি একজন মহা-পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া পড়িলাম, এই মহাপুরুষ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদা ঈশ্বরীয় প্রেমে ও

দিব্যভাবে আত্মহারা হইয়া থাকিতেন। সমস্ত জীব ও সমস্ত পদার্থের মধ্যেই তিনি সর্বদা ঈশ্বরকে দর্শন করিতেন। তাঁহার মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তি ও দিব্যভাব পূর্ণরূপে দেখা দিয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন: "ছেলেদের ভিতরে ঈশ্বরের প্রকাশ বেশী, কারণ তারা সরল, তাদের মনে বিষয়বুদ্ধি নেই। বিষয়বুদ্ধি আসার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের কপটতা বাড়তে থাকে। তার ফলে ঈশ্বরলাভের ইচ্ছা থেকে তাদের মন অনেক দূরে চলে যায়"। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই কথা হইতে বুঝিতে পারা গেল যে সরলতা জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। পরমহংসদেবের মধ্যে দেখিয়াছি সর্বদা সরল বালকের ভাব প্রকাশিত হইয়া থাকিত। বাইবেলেও দেখিতে পাই মহামানব যীশুখৃষ্ট বলিতেছেন: "Except you become as simple as the little children ye cannot enter into the kingdom of Heaven,"—অর্থাৎ 'যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা শিশুর মতো সরল হইবে সে পর্যন্ত তোমাদের ঈশ্বরলাভ করিবার কোনই সম্ভাবনা নাই'।

বালকদের কাছে কোন বস্তুর মূল্য নাই। তাহারা আপন ও পর কিছুই জানে না। 'এই জিনিষটি আমার ও ঐ জিনিষটি তাহার' এরূপ কোন মনোভাব তাহাদের নাই। সংসারের সমস্ত কুটিলতা এখনও তাহাদের মনে প্রবেশ করিতে পারে নাই; তাহারা সংসারের বন্ধন হইতে দূরে আছে। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই যখনই তাহাদের মনে স্বার্থভাব জাগিয়া উঠে তখনই তাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইতে থাকে এবং তাহাদের মনের শক্তি ক্রমশঃ নষ্ট হইতে আরম্ভ করে। আজকাল আমাদের দেশের লোক ঈশ্বরের সম্বন্ধে জানিতে আদৌ ব্যগ্র নয়, অর্থই

তাহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে। টাকা এখন আমাদের দেশের লোকের নিকট ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়াছে। যাঁহারা ঈশ্বরকে চান তাঁহাদের টাকার প্রয়োজন কি? তাঁহাদের নিকট টাকার কোন মূল্য নাই; তাঁহাদের কাছে টাকা ও মাটি দুইই সমান। ঈশ্বর সম্বন্ধে উপনিষদে বলা হইয়াছে: "সাক্ষীশ্চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ"; অর্থাৎ ঈশ্বর সকলের সাক্ষী, চৈতন্যস্বরূপ, অদ্বিতীয় এবং সমস্ত বিকার ও দ্বন্দ্বের অতীত। এই জ্ঞান সকলের থাকা উচিত।

এখনকার দিনে আমাদের দেশে স্কুল কলেজে ছেলে-মেয়েদের ধর্মবিষয়ে কোনই শিক্ষা দেওয়া হয় না। দেশ ও দশের জন্য ত্যাগ ও সেবার ব্রত গ্রহণ মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ; ইহাতে কি লাভ হয় ও কি গভীর শান্তি নিহিত আছে— এ' সমস্ত বিষয় বাড়ীতে কিম্বা স্কুলে বালক-বালিকাদের কেহই শিখাইতে চেষ্টা করেন না। স্কুলে কখনও কোনও মহাপুরুষের আদর্শজীবন সম্বন্ধে বালক-বলিকাদের নিকট বড় একটা আলোচনাও করা হয় না। এখনকার স্কুলগুলিতে ধর্ম বলিয়া কোনও বিষয়কে শিক্ষা দেওয়ার প্রথা একেবারে অজ্ঞাত বলিলেই চলে। ছেলেবেলাই ধর্মশিক্ষার উপযুক্ত সময়, আর এই সময়েই ছেলেমেয়েরা স্কুলে লেখাপড়া শিখিতে যায়। এই বয়সে যদি তাহারা ধর্মবিষয়ে মন দিতে না শিখে তাহা হইলে তাহারা আর কবে ধর্ম শিক্ষা করিবে? তাই কোমল বয়স হইতেই ধর্ম শিক্ষা করা দরকার। টাকা দিয়া অনেক প্রয়োজনীয় জিনিষ পাওয়া গেলেও টাকা দিয়া ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। ঈশ্বর লাভ করিতে হইলে ত্যাগ চাই।

ঈশ্বরকে লাভ করিলে যে জ্ঞানলাভ হয় তাহাই যথার্থ জ্ঞান। ধর্মসাধনার গুণেই মানুষের আত্মার উন্নতি হইয়া থাকে। মনু বলিয়াছেন :

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্॥

ধারণা, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়দমন, অচৌর্য, পরিচ্ছন্নতা, আত্ম-নিগ্রহ, লজ্জা, ব্রহ্মবিদ্যা, সত্যনিষ্ঠা ও ক্রোধহীনতা এই দশটি ধর্মের লক্ষণ। ইংরাজীতে একটি কথা আছে : "Return good for evil" (অপকারের পরিবর্তে উপকার কর)। অর্থাৎ কেহ যদি তোমার অপকার করে তাহা হইলে তুমি তাহার মন্দ ব্যবহারের পরিবর্তে তাহার প্রতি ভাল ব্যবহার করিবে। যতই দেহের প্রতি আসক্তি বাড়িবে ততই অপরের প্রতি হিংসার পরিমাণও বাড়িতে থাকিবে। আমাদের বাঙলাদেশের অধিকাংশ লোকের একটি মস্ত দোষ আছে এবং সেই দোষটি পরশ্রীকাতরতা। ইহার কারণ আমাদের নিজেদের মধ্যে কোনও গুণ না থাকায় অপরের কোনও গুণকে আমরা আদর করিতে পারি না। আমরা প্রত্যেকে নিজেকে সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। ইহা ছাড়া আর একটি দোষ হইতে সকলে সর্বদা দূরে থাকিতে চেষ্টা করিবে এবং সেই দোষটি চিত্তচাঞ্চল্য। এই দোষ জয় করিতে হইলে আত্মসংযমের শক্তি থাকা খুবই দরকার। যাহারা বিষয়াসক্ত তাহারা অপরের জিনিসকেও অন্যায়ভাবে নিজের অধিকারে আনিবার চেষ্টা করে। পরের জিনিসে লোভ করা ক্রমশঃ তাহাদের স্বভাব হইয়া দাঁড়ায়। এই লোভ সামলাইতে পারে না বলিয়া

তাহারা পরের জিনিসকে চুরি করিতে বাধ্য হয়। এই চুরি জিনিসটা এখন দেখিতেছি আমাদের দেশে অনেকের নিকট "ধর্মের লক্ষণ" হইয়া পড়িয়াছে। চাকুরীতে নিযুক্ত হইয়া অনেক ব্যক্তি 'উপরি' রোজগারের চেষ্টা করে। উপরি রোজগার যেমন ঘুষ খাওয়া—এসব অধর্মের কাজ এবং ইহা চুরি করার নামান্তর, কিন্তু সব লোক তাহা মনে করে না। অসৎ প্রবৃত্তি ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠায় তাহাদের বিবেক একেবারে অসাড় হইয়া গিয়াছে। এই দোষ যাহাতে চরিত্রে না আসিতে পারে সেজন্য সতর্ক থাকা উচিত।

শৌচ অর্থাৎ পরিচ্ছন্নতার দিকে সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি থাকা দরকার। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকিলেও জামা কাপড়কে পরিষ্কার না রাখিলে শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। শরীর ও মনের খুব নিকট সম্বন্ধ আছে। দেহ অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধে পূর্ণ থাকিলে মন কখনও সুচিন্তা করিতে পারে না। মলিন চিত্তসম্পন্ন ব্যক্তিরা অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকিতে ভালবাসে। সেইজন্য শৌচ অর্থাৎ পরিচ্ছন্নতাকে সকল ধর্মেই বিশেষ উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে। ইংরাজীতে একটি বাক্য আছে : cleanliness is next to godliness",—এই কথার অর্থ এই পরিচ্ছন্নতাই ঈশ্বরপ্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ। যে অপরিষ্কার থাকে তাহাকে সকলেই ঘৃণা করে। অপরিচ্ছন্ন হইয়া থাকা আদৌ উচিত নয়। অপরিচ্ছন্ন থাকিলে কি কুফল হয়, আর পরিষ্কার থাকার সুফল কি সে' সম্বন্ধে সকল ছেলেমেয়েকেই শিক্ষা দেওয়া উচিত।

আত্মসংযমের দিকে লক্ষ্য রাখা মানুষের আর একটি কর্তব্য। এই নিয়ম পালন করিতে হইলে যথার্থ কিছু

পরিমাণে মানসিক শক্তি থাকা প্রয়োজন। কুপ্রবৃত্তির প্রভাব সংযত করিয়া মনকে সৎপথে লইয়া যাওয়া সাধারণ লোকের পক্ষে যদিও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু অনেকদিন প্রাণপণে চেষ্টা করিলে কুপ্রবৃত্তি দমন করা অনেকটা সহজই হইয়া পড়ে। মনু বলেন: "মানুষের অসাক্ষাতে কুকর্ম না করাই ধর্ম"। অনেকে এমন সমস্ত ঘৃণ্য কাজ করে যাহার জন্য লোকচক্ষে তাহাদের লজ্জিত হইতে হয়। ভগবান সর্বশক্তিমান, তিনি সকলের অন্তর্যামী ও সর্বজ্ঞ। তাঁহার নিকট হইতে কোন কার্যকে লুকাইয়া রাখিতে পারা যায় না। মানুষের অগোচরে কোন কুকর্ম করিলে সে জানিতে পারে না বটে, কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টি সর্বভেদী। তিনি দিবারাত্র জাগ্রত; রাত্রের গভীর অন্ধকারেও তাঁহার দৃষ্টি হইতে লুকাইয়া থাকা যায় না, অতএব কুকাজ করিয়া মানুষ ঈশ্বরের দৃষ্টি হইতে কেমন করিয়া নিজেকে লুকাইবে? তাই মানুষের কাছে অস্বীকার করিয়া যদিও নিজের দোষ ঢাকিতে পারা যায় কিন্তু একাকী থাকিলেও কোন কুকাজ করা কাহারও উচিত নয়। একাকী বলিয়া নিজেকে মনে করিলেও প্রকৃতপক্ষে কেহ একাকী নয়। সকলের অলক্ষিতেই ঈশ্বর সর্বদা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন।

বিদ্যা দুই প্রকার: পরা ও অপরা। জগতে যে সমস্ত পদার্থ আছে তাহাদের সম্বন্ধে নানাপ্রকার জ্ঞান যে বহুবিধ বিদ্যার দ্বারায় লাভ হয় তাহা 'অপরা বিদ্যা'। যাহার দ্বারা সেই অক্ষর অবিনাশী পরমপুরুষকে অবগত হওয়া যায় সেই বিদ্যাই 'পরা বিদ্যা'। পরা বিদ্যাতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়—

ঈশ্বর লাভ হয়, তাই এই বিদ্যার নাম 'ব্রহ্মবিদ্যা'।[1] অপরা বিদ্যাই শেষে পরা বিদ্যায় পরিণত হয়। যে কোন একটি বিষয়ে অধ্যয়ন করিলেই ইহার আশ্চর্য শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন একটি ফুলের কথাই ধরা যাউক। ফুলটির সৃষ্টির কারণ কি? ইহার এই প্রকার আকার, বর্ণ ও গন্ধ কেমন করিয়া হইল? কি অবস্থা ও পদার্থসকলের সমবায়ে ইহার এমন সুন্দর প্রকাশ হইল? এই সকল বিষয়ে গভীর-ভাবে চিন্তা ও বিচার করিতে থাকিলে ইহার মূলতত্ত্ব জানিতে পারিয়া জ্ঞান ও আনন্দলাভ করিতে পারা যায়। এইরূপে একটি প্রজাপতির অঙ্গসৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য কিম্বা গাছপালা, নদী, পর্বত, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহতারা সমস্ত কিছুরই মূলতত্ত্ব অন্বেষণ করিতে করিতে অবশেষে দেখা যায় যে, সকলের মূলে এক অদ্বিতীয় সার্বজনীন সত্যই বর্তমান; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু-পরমাণু হইতে অতি বিরাট বস্তুর অস্তিত্বের মূলে আছে সেই সর্বব্যাপী পরমপুরুষের মহিমা।

ঈশ্বরের তো আমাদের মতন এই রকম সীমবদ্ধ ও জড় দেহ নাই, তিনি সর্বব্যাপী ও সমস্ত আকারেরই অতীত। চর্ম-চক্ষে তাঁহাকে দেখা যায় না। সেইজন্য তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমে তাঁহার সৃষ্টিকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে যে, এই সৃষ্টির কারণ কী? কেমন করিয়া ইহার উৎপত্তি হইল? কে এই বিশ্বজগৎকে চালাইতেছেন? এই সমস্ত বিষয়ে বিচার ও ধ্যান করিতে

১। 'দ্বে বিদ্যে পরা চাপরা চ। অপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ। শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।'

করিতে সকলের হৃদয়ে ঈশ্বরের দিব্যভাব জাগিয়া উঠিবে। শুধু পূজা-অর্চনা ও স্তুতি-জপের দ্বারা ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না, এই সৃষ্টির যে কোন বস্তুর মূলকারণ অনুসন্ধান সম্বন্ধে বিচার ও তাহা লইয়া ঠিক মতন ধ্যান করিলেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। ধ্যানে সিদ্ধিলাভ হইলে জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়া উঠে এবং জ্ঞানচক্ষে দেখা যায় ঈশ্বর সর্বব্যাপী—God is the all-pervading Spirit। ঈশ্বর সর্বস্থানে সকল সময়েই বর্তমান। তিনি অতি ক্ষুদ্র বালুকণাতে যেমন আছেন আবার মানুষের শরীরের প্রত্যেক লোমকূপে, হৃদয়ে ও মনেও তেমনি তেমন সর্বদা পরিব্যাপ্ত। অতি নিকৃষ্ট নগণ্য কীট হইতে আরম্ভ করিয়া অবতারপুরুষ পর্যন্ত সকলের ভিতর ঈশ্বরের দিব্যসত্তা বর্তমান। এই বিচার হইতেই জানিতে পারা যায় যে, আমাদের ইহার পূর্বে বহুবার জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে। আমরা প্রথমে অতিক্ষুদ্র পরমাণু হইতে কীটাণু তাহা হইতে বৃক্ষলতা, পরে পশুপক্ষী এবং সর্বশেষে মানবতার স্তরে ক্রমবিকাশের নিয়ম অনুসারে উন্নীত হইয়াছি। বহুবার জন্মগ্রহণের পর মানুষ নানা অবস্থা ও অভিজ্ঞার ভিতর দিয়া যাইয়া অবশেষে ঈশ্বর লাভ করিয়া মুক্ত হয়।

পূর্বজন্মের কোনও স্মৃতি এখন আমাদের মনে নাই তাহার কারণ আমাদের দিব্যজ্ঞান একটি আবরণে ঢাকা আছে। এই আবরণটির নাম 'অবিদ্যা' অর্থাৎ অজ্ঞানতা। এই অজ্ঞানতার আবরণ সরাইয়া দেওয়ার নাম 'সাধনা'। সাধনায় সিদ্ধি-লাভ করিলে আমরা নিজেদের দিব্যস্বরূপকে অথবা ঈশ্বরকে জানিতে পারি। তখনই আমাদের সমস্ত অজ্ঞানতা, দুঃখ, অশান্তি ও বন্ধনের চিরশেষ হয়, আমরা দিব্যজ্ঞানরূপ মুক্তি

ও শান্তি লাভ করিয়া ধন্য হই। দিব্যজ্ঞান-লাভের ফলে আমাদের নিকট জন্ম-মৃত্যু এবং পূর্ব-পূর্ব জন্মের সমস্ত রহস্যই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই সাধনাকে 'যোগ' বলে। মানুষের রুচি, সামর্থ্য ও সংস্কারের ভিন্নতা ও তারতম্য অনুযায়ী যোগসাধনার অনেকগুলি পদ্ধতি অথবা পথ আছে, যেমন, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি। মাত্র একটি জীবনের সাধনার দ্বারাতেই মানুষ দিব্যজ্ঞান ও মুক্তি লাভ করিতে পারে না। অনেক জন্ম ধরিয়া সাধনার ফলে তবেই মানুষ মুক্তিলাভ করিতে পারে। এইজন্য মানুষকে বারবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যোগসাধনায় সিদ্ধ হইলে মানুষ উপলব্ধি করে সে এবং ঈশ্বর স্বরূপতঃ এক। এই ঈশ্বরত্ব লাভ করাই ধর্মের একমাত্র চরমলক্ষ্য। ঈশ্বরত্ব লাভ না করা পর্য্যন্ত কোনও মানুষ কখনও শান্তি লাভ করিতে পারে না। অতএব ঈশ্বরত্ব লাভই সমস্ত লোকেরই জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত।

মৃত্যুর পর মানুষের দেহ পৃথিবীতে পড়িয়া থাকে। সারাজীবন ধরিয়া সে যত টাকা ও বিষয়সম্পত্তি অর্জন ও সঞ্চয় করিয়াছে সে সমস্ত রাখিয়াই তাহাকে এই লোক হইতে চলিয়া যাইতে হইবে, কিছুই সে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবে না। কিন্তু যদি সে সৎকর্ম করিয়া থাকে তবে সেই সৎকর্মই পরলোকে তাহার একমাত্র সাথী ও সহায়ক হইবে। মানুষের দেহত্যাগের সঙ্গে একমাত্র তাহার কৃত পাপপুণ্যের কর্মফল যাইয়া থাকে। সৎকর্মের ফল শুভ ও কল্যাণকর এবং অসৎকর্মের ফল দুঃখজনক। অতএব এই পৃথিবীতে আসিয়া সকলেরই সুচিন্তা ও সৎকর্ম করিয়া পবিত্রভাবে জীবন যাপন

করা উচিত। আমাদের এই বর্তমান জন্ম পূর্বজন্মের ভাল ও মন্দ কর্মের ফলে সম্ভব হইয়াছে এবং আমরা এই জন্মে সৎভাবে জীবন যাপন করিলে ও ঈশ্বরপরায়ণ হইলে আমাদের পরজন্ম শান্তিময় হইবে। অতএব আমাদের সর্বদা চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে আমাদের জীবন পবিত্র ও চরিত্র নির্মল থাকে। পরা বিদ্যা অর্থাৎ ঈশ্বর লাভের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের সমস্ত কাজ কবিতে হইবে।

মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়? পুঁথিগত বিদ্যার সাহায্যে অর্থাৎ শুধু বই পড়িয়া এই সমস্যার সমাধান হয় না। যাঁহারা সংযমী, পবিত্র ও ঈশ্বরপরায়ণ এবং সাধনায় একনিষ্ঠ তাহারা দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া এই সমস্যাব সমাধান করিতে পারেন। জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা আত্মা, পবলোক ও জগতের সমস্ত রহস্যের মীমাংসা করিতে পারা যায়। আমরা ছবিতে কোন কোন দেবতার তিনটি চক্ষু দেখিতে পাই। তাঁহাদের দুইটি চোখ ঠিক আমাদেরই মতন কিন্তু তৃতীয় চক্ষুটি কপালে অবস্থিত। আমাদেরও প্রত্যেকের জ্ঞান-চক্ষু আছে। যোগসাধনায় সিদ্ধ হইলে আমাদেরও প্রত্যেকের জ্ঞানচক্ষু খুলিবে এবং তাহার ফলে আমরা অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত ব্যাপার জানিয়া ত্রিকালদর্শী অথবা ত্রিকালজ্ঞ হইতে পারিব। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তি নিহিত আছে। যোগসিদ্ধ মানুষের মধ্যেই শুধু এই অব্যক্ত ঐশ্বরিক শক্তি প্রকাশিত হয়।

Healing power অর্থাৎ সমস্ত রোগ সারাইবার শক্তি প্রত্যেকের মধ্যে আছে। স্বাস্থ্যের নিয়ম জানি না বলিয়াই

আমরা নানাবিধ রোগ ভোগ করি। এই রোগ সারাইবার শক্তি যদি কখনও কোন ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশিত হয় তবে সে নিজের যে কোন রোগই সে সারাইয়া ফেলিতে পারে। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যময় জীবন যাপন করেন তাঁহাদের মধ্যে এই আরোগ্য শক্তি পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়।

ব্রহ্মচর্য্যে মানুষেব মস্তিষ্কের পূর্ণ বিকাশ হয়, নূতন নূতন বিষয়ে চিন্তা করিবার শক্তি দেখা দেয়, সামান্য চিন্তাতেই তাহার মস্তিষ্ক দুর্বল হইয়া পড়ে না; ব্রহ্মচর্য্যহীন ব্যক্তির মানসিক বল, বুদ্ধিশক্তি প্রভৃতি কিছুই থাকে না, সে নিস্তেজ, ধারণাশক্তিহীন ও সর্বতোভাবে দুর্বল। ব্রহ্মচর্য্যহীন ব্যক্তির মনে পশুপ্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে এবং তাহার ফলে সে মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলে।

সত্যপরায়ণতা মানবজীবনের এবং ধর্মজীবনেরও সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে সত্যপরায়ণ সে ব্যক্তিই সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারে। সত্যস্বরূপ ভগবানকে সত্যভ্রষ্টতা ও মিথ্যাচারিতার দ্বারা পাওয়া যায় না। সত্যরক্ষা করিবাব জন্য সদাসর্বদা মনে বল রাখিতে হয়। ঘরের দেওয়ালের গায়ে লিখিয়া রাখিতে হইবে: "আমি সত্য কথা বলিব ও আমি সাধু হইব"। মনে অহঙ্কার অভিমান আদৌ রাখা ঠিক নয়; সর্বদাই অহঙ্কার বর্জনের চেষ্টা করা উচিত। সব সময়ে মনে রাখিতে হইবে—সেবা করাই পরম ধর্ম। আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘে এই আদর্শ পালন করা হয়। আমরা শুধু উপদেশ কিংবা কথার দ্বারা নয়, জীবনের দৃষ্টান্তে, কাজের মধ্য দিয়া এই আদর্শকে পালন করি। নরই 'নারায়ণ', জীবই 'শিব'—এই তত্ত্বকে আমরা

কর্ম-জীবনে পরিণত করিয়াছি। এই তত্ত্ব কর্ম ও ধ্যানের দ্বারা উপলব্ধি করিলে সকলেই পরা বিদ্যায় অধিকারী হইবে, এবং তাহার ফলে ঈশ্বর লাভ করিয়া আমরা ধন্য হইব।

আমাদের আদর্শকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণেব মধ্যে প্রত্যক্ষ কবিয়াছি। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাদর্শে অনুপ্রাণিত হইলে সকলেরই জীবন মহৎ ও পবিত্র হইয়া উঠিবে। অল্পবয়স্ক বালকেরাই ভবিষ্যতে সন্তানের পিতা হইবে। তাহাদের মহত্ত্ব, চরিত্রবল ও কর্মশক্তির উপরে দেশের আশা ভরসা নিহিত। তাহারা জ্ঞানে, কর্মে ও ঐশ্বর্যে উন্নত হইলে তবে সমাজ ও দেশ উন্নত হইবে। কর্তব্যের মহা গুরুদায়িত্বভার তাহাদের উপর রহিয়াছে। দেশকে বর্তমান অধোগতির কবল হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব তাহাদের। এই মহাকার্য সম্পন্ন করিবার জন্য বালক ও যুবকদের চরিত্রবান, শ্রদ্ধাবান্, বীর্যবান, কর্মনিষ্ঠ ও সেবাপরায়ণ হইতে হইবে—দেশকে ও দেশবাসীদের ঈশ্বরের মূর্তিজ্ঞানে ভালবাসিতে এবং কায়মনো-বাক্যে দেশের সেবা কবিতে হইবে। ঈশ্বর সকলের সহায় হউন। ভগবানের শক্তি ও করুণায় সকলের জীবনের মহান উদ্দেশ্য সার্থক ও সফল হউক।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

॥ ভারতবাসী ও বর্তমান যুগ ॥

ভারতবর্ষের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মাদর্শকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য যদিও আমাকে বিগত দশ বৎসর ধরিয়া ইউরোপ এবং আমেরিকার বহুস্থানে অবস্থান করিতে হইয়াছিল এবং যদিও আমি বহুকাল প্রবাসে ছিলাম তথাপি আপনারা আমাকে পূর্বের ন্যায় নিজের ভ্রাতা ও স্বদেশ-বাসীরূপে সহৃদভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছেন বলিয়া আমি অন্তরে অতিশয় আনন্দ বোধ করিতেছি। সত্যই 'ভ্রাতা' শব্দটি নিবিড় প্রীতিপূর্ণ সম্বোধনের শব্দ। এই শব্দের দ্বারা সম্বোধন করিলে আমাদের সকলেরই হৃদয় যেন এক হইয়া যায় এবং পরস্পরের মধ্যে প্রীতি, সহানুভূতি ও শুভেচ্ছার ভাব জাগ্রত করে। ইহার মহৎ প্রভাবই কোনও এক মহান্ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আমাদের সকলকে একত্রিত ও সঙ্ঘবদ্ধ হইতে অনুপ্রাণিত করিয়া থাকে। এই মহান্ উদ্দেশ্য কী? পুণ্যভূমি এই ভারতের বক্ষে উদ্ভুত সনাতন ধর্মই আমাদের সেই মহান্ উদ্দেশ্য। আমরা সকলেই এই পুণ্যভূমি ভারত জননীর সন্তান। সমগ্র জগতের মধ্যে ভারতবর্ষই সর্বাপেক্ষা পবিত্র দেশ। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোন দেশকে পুণ্যভূমি বলা যায় না। আমরা সকলেই সেই পুণ্যভূমি ভারতমাতার সন্তান, এবং সেজন্য আমি আপনাদের একজন দেশভ্রাতা। ইংল্যাণ্ডে ও আমেরিকা যুক্তরাজ্যে আমার ধর্মপ্রচারের সাফল্য লাভের জন্য আপনারা আমার প্রতি যে সম্মান ও সমাদর প্রকাশ করিয়াছেন তাহার জন্যও

আমি আপনাদের ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। অবশ্য আপনাদের সাধুবাদ ও প্রশংসা বহনের কোনও যোগ্যতা আমার নাই। এখানে সমাগত যে কোন ব্যক্তির দ্বারা এই মহাকার্য সহস্রগুণে আরও ভাল করিয়া সম্পন্ন হইতে পারিত। কারণ এখানে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা শিক্ষায়, সর্ববিধ গুণে ও আধ্যাত্মিকতায় আরও বিশেষভাবে উন্নত। কিন্তু আমাকে যদি অনুমতি দেওয়া হয় তাহা হইলে আমি তথাপি বলিব যে, আপনাদের একজন ভ্রাতা ও ঈশ্বরের একজন সেবকরূপেই আমার দ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। যদি আমাকে ইহা বলিবার অনুমতি দেওয়া হয় তাহা হইলে আমি বলিব যে, আপনাদের শুভেচ্ছা, সহানুভূতি, দয়া এবং ভ্রাতৃভাবের প্রেরণাই সুদূর সমুদ্রপারে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে আমার নিকটে প্রেরিত হইয়াছিল।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আমি শাস্ত্রাধ্যয়নে ও কঠোর তপস্যায় হিমালয় এবং ভারতের কোনও কোনও নির্জ্জন স্থানে নিঃসঙ্গ অবস্থায় যাপন করিতেছিলাম। এমন সময় অকস্মাৎ ইংলণ্ড হইতে আমার নিকট একটি আহ্বান আসিল, যদিও আমি জানিতাম এই আহ্বানের যোগ্যতা আমার নাই তবুও আমি ইহাতে সাড়া দিয়াছিলাম। পাশ্চাত্যদেশে আমাদের বিশ্ববরেণ্য গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দ যে মহাকার্যের সূচনা করিয়াছিলেন সেই মহাকার্যকে নির্বাহ ও প্রসারিত করিবার জন্যই এক গুরুদায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যের ভার স্বামিজীর দ্বারা আমার উপর অর্পিত হইয়াছিল। এই কার্য যেমন গুরুদায়িত্বপূর্ণ ইহার সম্পাদনাও তেমনি অবিশ্রান্ত যত্ন ও নিষ্ঠাপূর্ণ

অধ্যবসায় সাপেক্ষ। কারণ এই মহাকার্যকে সফল করিবার জন্য আমাদিগকে (শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বত্যাগী শিষ্যদিগকে) নানা বিরোধী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সম্মুখীন হইয়া সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। এই সমস্ত বিরোধী দলের মধ্যে খৃষ্টান মিশনারীরা ছিলেন প্রধান। পৃথিবীর নানাদেশে বিশেষতঃ হিন্দুদের মধ্যে খৃষ্টান ধর্ম প্রচার করিবার জন্য মিশনারীদের বিশেষ স্বার্থ আছে কিন্তু সুদীর্ঘ তের বৎসর কাল (১৮৯৩-১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) পাশ্চাত্যদেশে আমরা যে অক্লান্তভাবে প্রচারকার্য করিয়াছি তাহার ফলে সেখানে আমাদের সনাতন ধর্ম স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এক্ষণে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই যে ইহার অগ্রগতি রোধ করিতে পারে। দেশবিদেশে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত এই নবীন ধর্মান্দোলনের গতি ও উন্নতি এক্ষণে আপনারা লক্ষ্য করিতেছেন এবং যাহার সহিত আমি সাক্ষাৎভাবে সংশ্লিষ্ট এবং যে সঙ্ঘের আমি অন্যতম প্রতিনিধি তাহার পশ্চাতে যে ঐশ্বরিক শক্তিই কার্য্য করিতেছে ইহা আপনারা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কালের লক্ষণ ও গতি হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, হিন্দুজাতির এই নবীন ধর্মান্দোলন ঈশ্বরের অভিপ্রেত আন্দোলন।

বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ একজন সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি 'বর্তমান ভারতের স্বদেশপ্রাণ সাধুসিদ্ধ সন্ন্যাসী' (Patriot-saint of modern India)[১]। বর্তমান

১। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব, মনীষা, স্বদেশপ্রাণতা, জাতীয়তাবাদ, নির্ভীক সাহস, আধ্যাত্মিকতা ও বহুমুখী জ্ঞানের জন্য তাঁহাকে এই নামে নিজের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন। লোকমান্য তিলক প্রদত্ত স্বামী বিবেকানন্দের এই সশ্রদ্ধ উপাধি ভারতের শিক্ষিত সমাজের নিকটে এক্ষণে সুপরিচিত।

কালে এই বাণিজ্যবাদের যুগে স্বামী বিবেকানন্দকে 'দিব্যজ্ঞানের অবতার' বলা যাইতে পারে। বর্তমানযুগে শুধু তিনিই আমেরিকার ন্যায় ভোগাসক্তির দেশে বাণিজ্য-বাদের স্রোত অন্যদিকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তিশালী গুরুদেব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে সমগ্র জগতে প্রচারের জন্য বিশ্বজনীন বাণী লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত শিকাগো-মহানগরীতে নিখিল ধর্মমতের প্রতিনিধিবৃন্দের সমবায়ে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। জগতের বিভিন্নদেশ হইতে বহু সুবিদ্বান ও সম্ভ্রান্ত নরনারীর সমাবেশ এই সভার শ্রোতৃমণ্ডলীকে গঠন করিয়াছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উচ্চশ্রেণীর বহু ধর্মপ্রচারক এই বিরাট সভায় নিজ নিজ ধর্মমতকে সমর্থন করিয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এই সভাতেই তরুণ হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ সনতনধর্মের প্রতিনিধি-রূপে আমন্ত্রিত হইয়া অভিনবভাবে ওজস্বীভাষায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন। প্রকাশ্য জনসভায় ইহাই তাঁহার প্রথম বক্তৃতা, কিন্তু তাঁহার মুখনিঃসৃত প্রত্যেকটি বাণীর মধ্যে ঐশ্বরিক শক্তি প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া সেই সুশিক্ষিত বিপুল শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তে বৈদ্যুতিক স্পর্শের মতো বিস্ময়-বিহ্বলতা আনিয়া দিয়াছিল। সনাতন হিন্দুধর্ম নামে যে ধর্ম স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোর নিখিল ধর্ম-মহাসভায় প্রদান করিয়াছিলেন তাহা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বজনীন ধর্ম।[১]

[১] যে ধর্মাদর্শ শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ প্রচার করিয়াছিলেন তাহার সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব উক্তি : "I go forth to preach a religion from which

মানুষমাত্রেই অমৃতের পুত্র ও আনন্দের সন্তান এবং কোনও ব্যক্তি বিশেষের পাপ ও কুকর্মের ফলে মানব জন্মগ্রহণ করে না—ইহাই এই সনাতনধর্মের অন্যতম শিক্ষা। স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারিত বিচিত্র বাণী শিকাগো ধর্মমহাসভার সমস্ত শ্রোতাদের নিকটে ঐশ্বরিক সম্পর্ক হইতে আগত শাশ্বত সত্যের ন্যায়ই প্রেরণাদায়ক হইয়াছিল। তাহার ফলে যেন পাশ্চাত্যদেশের বহু নরনারীর জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় নিউ ইয়র্ক মহানগরীতেই (১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে) প্রথমে সনাতনধর্ম প্রচারের মহাকার্য সূচনা করেন। এই প্রচারকার্যের জন্য তাঁহাকে সমগ্র আমেরিকা যুক্তরাজ্য ও কানাডায় পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। আমেরিকার বহুস্থানে স্বামী বিবেকানন্দকে রাজ সমারোহে শ্রদ্ধা ও সম্মানসহকারে অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে (১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে) আপনারা অবশ্যই এই সমস্ত কথা তাঁহার নিজমুখ হইতে শুনিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। আমেরিকায় বহু ব্যক্তির দ্বারা স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীকে বাইবেলের মতোই পবিত্র ও জ্ঞানপ্রদ বলিয়া শ্রদ্ধা করা হয়। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে আমি বহু ঐকান্তিক চিত্ত ও অকপট সত্যান্বেষী নরনারীকে দেখিয়াছি। তাঁহারা প্রত্যেকেই স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত 'রাজযোগ, গ্রন্থটিকে বাইবেলেরই মতন ধর্মশাস্ত্র বলিয়া শ্রদ্ধা করেন। যে সমস্ত পাশ্চাত্যদেশীয় শিক্ষিত নরনারী ইতঃপূর্বে

Buddhism is a rebel child and Christianity is but a distant echo,"—অর্থাৎ যে ধর্ম আমি প্রচার করিতে যাইতেছি বৌদ্ধধর্ম তাহার বিদ্রোহী সন্তান এবং খৃষ্টানধর্ম তাহার দূরাগত প্রতিধ্বনি মাত্র।

ঈশ্বরের অস্তিত্বে এবং আধ্যাত্মিক ব্যাপারের সত্যতায় বিশ্বাস করিতেন না সত্যদ্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দের বিচিত্র শিক্ষায় তাঁহাদের জীবন ও চরিত্রকে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে। তাহারই ফলে পাশ্চাত্যদেশীয় অসংখ্য নরনারী স্বামিজীর গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া ধর্মভাবাপন্ন, নীতিপরায়ণ, ধর্ম্মভীরু ও ঈশ্বরপ্রেমিক হইয়া পড়িয়াছেন। সমগ্র ভারতবাসীদের এবং হিন্দুসন্ন্যাসীদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম দুস্তর সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া সুদূর পাশ্চত্যদেশে প্রাচীন আর্য ঋষিবৃন্দের অনুভূতিলব্ধ বিশ্বজনীন শাশ্বত সত্যের বাণী এবং তাঁহার গুরুদেব শ্রীরাম-কৃষ্ণের মহাজীবনে প্রতিপন্ন উদার অসাম্প্রদায়িক ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। অবশ্য স্বামিজীর পূর্বে কোন কোন ভারতবাসী পাশ্চত্যদেশে গিয়াছিলেন এবং সেখানে ধর্মপ্রচারও করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের বক্তৃতা ও ব্যাখ্যানে যে ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল তাহাতে হিন্দুধর্মের কোন একটি বিশেষ দিকমাত্র প্রচারিত হইয়াছিল। হিন্দু-ধর্মকে সমগ্রভাবে ও প্রকৃতভাবে তাঁহারা প্রচার করেন নাই। একমাত্র বীরসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ বৈদিক আর্য ঋষিবৃন্দের নিষেবিত সনাতন ধর্মকেই সমগ্র জগতের সভ্যসমাজে সমগ্রভাবে ও যথার্থরূপে প্রচার করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ প্রচারিত এই ধর্মকে বিশ্বজনীন ধর্ম বলা যাইতে পারে। পাশ্চত্যদেশে ধর্মপ্রচার কার্যে স্বামী বিবেকানন্দ সুবিপুল সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। ইহার কারণ একমাত্র সত্য ভিন্ন আর অন্য কিছুকেই তিনি স্বীকার করিতেন না। একমাত্র সার্বজনীন শাশ্বত সত্যকেই তিনি প্রচার

করিয়াছিলেন, আর একমাত্র বেদ ভিন্ন আর কোনও ধর্মশাস্ত্রেই এই শাশ্বত সত্য প্রতিপাদক ধর্মের সন্ধান পাওয়া যায় না। একমাত্র আমাদের বেদশাস্ত্রে সুমহান ধর্মাদর্শকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থে মাত্র তাহারই ক্ষীণ অস্পষ্ট ছায়ামাত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

আপনারা আমাকে যে অভিনন্দনপত্র দান করিয়াছেন তাহাতে আপনারা উল্লেখ করিয়াছেন যে, দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী বৌদ্ধসম্রাট অশোকই সর্বপ্রথম ভারতের বাহিরে বহুদেশে ধর্মপ্রচারকরূপে বহু সন্ন্যাসীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনা সম্ভবতঃ ২৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ঘটিয়াছিল। সে সময়ে ভারতবর্ষ সভ্যতার চরমশীর্ষে আরোহণ করিয়াছিল। ভারতবর্ষ তখন স্বাধীন ছিল বলিয়া প্রত্যেক প্রগতিশীল আন্দোলনেই তাহার প্রাণশক্তি ও উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু আজ আর ভারতের সেই প্রাণশক্তি নাই— যদিও এই প্রাণশক্তিকে আবার পুনরুজ্জীবিত করিবার অবস্থায় সে আজ প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে। আপনারা এই অভিনন্দনপত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র নামকে উল্লেখ করিয়াছেন। আপনারা মনে রাখিবেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে প্রকাশিত ঐশ্বরিক শক্তি বর্ত্তমান যুগে এই নির্জ্জীব ও মৃতপ্রায় জাতিকে নূতন প্রাণ ও নবজন্ম দান করিয়াছে। ইতিহাস পাঠের দ্বারা আমরা জানিয়াছি যে, বৌদ্ধসম্রাট অশোকই যীশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে চীন, মিশর (Egypt) প্যালেস্তাইন, প্রভৃতি নানাদেশে বহু বৌদ্ধভিক্ষুকে ভগবান বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্মপ্রচারের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি বুদ্ধদেব কে ছিলেন?

যে সর্ব্বব্যাপী পরামাত্মাকে আমরা 'বিষ্ণু' বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি বুদ্ধদেব সেই ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম অবতার। অনেকে বুদ্ধদেবকে 'নাস্তিক' বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমাদের নিকট বুদ্ধদেব ঈশ্বরের অবতার রূপে পূজিত ও নমস্য। বৈদিক ধর্ম্মের অন্তর্গত নীতিবাদ এবং বৈদিক জ্ঞানযোগের দার্শনিক মতবাদ নূতনরূপে ভগবান বুদ্ধের দ্বারা সে সময়ে বহুলভাবে লোকসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের জীবনকালেরও বহুপূর্বে এই ভারতবর্ষ হইতে উন্নতশ্রেণীর বহু ধর্ম্মশিক্ষক এবং মহাজ্ঞানী দার্শনিক হিন্দু মনীষী আলেকজেন্দ্রিয়া ও গ্রীসদেশে গিয়াছিলেন। আপনারা যদি অধ্যাপক মোক্ষ মূলারের (F. Von Max mueller) গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহার কোনও এক গ্রন্থে লেখা আছে—গ্রীসদেশে বহু হিন্দু দার্শনিকের যাতায়াত ছিল এবং তাঁহারা গ্রীসের রাজধানী এথেন্স (Athens) নগরীতে সোক্রেটিশের (Socrates) সহিত দার্শনিক আলোচনা ও বিচার করিতেন। ৩২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ম্যাসিডনের (Macedon) অধিবাসী গ্রীকসম্রাট আলেকজাণ্ডার (Alexander the Great) ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অংশে অবস্থিত পাঞ্জাব প্রদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে ভারতের জাতীয় চিন্তধারার স্রোতে পরিবর্তনের সূচনা হয় এবং হিন্দু দার্শনিকগণ ভারতের বাহিরে নিজেদের ধর্ম ও দর্শনপ্রচারের জন্য বহুদেশে যাইতে আরম্ভ করেন। হিন্দুশাস্ত্র হইতে বহু প্রমাণ্য বাণী উদ্ধৃত করিয়া দেখান

যাইতে পারে যে, সমুদ্রযাত্রা নয়।[১] বর্তমানযুগে আমাদের দেশ হইতে শত সহস্র যুবকের ভারতের বাহিরে নানাদেশে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। ঐ সমস্ত দেশে যাইয়া সেখানকার সামাজিক রীতি এবং যে সমস্ত বিষয়ে সেইসব জাতিগুলি বিশেষভাবে উন্নত, জ্ঞানী ও কৃতকর্মা সেই সমস্ত বিষয়, যেমন বিজ্ঞানের নানাবিভাগ, কার্যকরী ভাবে শিক্ষা করা আমাদের যুবকদের পক্ষে একান্ত কর্তব্য। আমি ইচ্ছা করি যে, সমস্ত বাঙ্গালাদেশের বিশেষতঃ কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবক গ্রাজুয়েট ছাত্রগণ ইউরোপ আমেরিকায় যাইয়া সেখানে নানাপ্রকার বিদ্যা ও কাজকর্ম শিখিবার ও অর্থ উপার্জন করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইবেন। সমুদ্রের পরপারে সুদূর বিদেশে সেখানকার জাতিগুলি কী করিয়া আজ এত উন্নত, শক্তিশালী, সুশিক্ষিত, মহৎ ও বিপুল ঐশ্বর্যশালী হইল তাহার কারণ জানিবার জন্য সে সমস্ত

---

(১) "ইন্দ্রং বর্ধন্তো অপ্তুরঃ কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্য্যম্।
অপঘ্নন্তো অরাবণঃ॥
—ঋগ্বেদ ৯।৬৩।৩৫

অর্থাৎ, হে মানব! ঈশ্বরের মহিমাকে আরও অধিকতর প্রচার কর। পরাস্বপহারী অনার্য্যকে শিক্ষা দাও। সমগ্র জগৎকে আর্যভাবে পরিপ্লাবিত কর।

মহর্ষি অগস্ত্য আর্যাবর্ত্য হইতে দাক্ষিণাত্যে প্রথম আর্য্য-উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাহার পরে তিনি সমুদ্রপথে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া সুমাত্রা জাভা (যবদ্বীপ) শ্যাম, সিঙ্গাপুর (সিংহাপুর) বালী (বরভূধর) প্রভৃতি স্থানে আর্যসভ্যতা ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ নামে আরও একজন ঋষির সমুদ্র-যাত্রার কথা মহাভারতে বর্ণিত আছে। প্রাচীন যুগে হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রাসম্বন্ধে *Shipping in Ancient India* নামে ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়-প্রণীত সুবিখ্যাত গ্রন্থে ঐতিহাসিক প্রমাণসহকারে আলোচিত হইয়াছে।

দেশে আমাদের যুবকদের বহুবৎসর বাস ও নানাবিদ্যা শিক্ষা করা একান্ত কর্তব্য। বর্তমান যুগে স্বামী বিবেকানন্দই আমাদের জাতীয় অগ্রগতির সর্বপ্রথম প্রকৃত বার্তাবাহী ও স্বদেশপ্রেমের অগ্রদূত। এই দিব্যদ্রষ্টা পুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যিনি কোন ব্যক্তি তাঁহার শিক্ষা ও উপদেশকে জীবনে পরিণত করিবেন তিনি নিশ্চয়ই মহত্ত্ব লাভ করিয়া প্রকৃতভাবে ভারতজননীর সেবা করিতে পারিবেন।

আমেরিকা যুক্তরাজ্যে এক্ষণে শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের দ্বারা বেদান্তপ্রচারের অনেকগুলি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এই সমস্ত প্রচার কেন্দ্রগুলির কর্মান্দোলন হইতে জানা যায় যে, আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের এখন অত্যন্তই প্রয়োজন আছে এবং বাণিজ্যবাদ ও জড়বাদের মধ্যে থাকিয়াও বেদান্তের মহাদর্শে জীবনকে গঠিত করিবার জন্য আমেরিকার বহু নরনারীই প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। সেদেশে উদ্দাম প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া অসংখ্য লোকই যথেচ্ছভাবে জীবন-যাপন করিতে যায় এবং তাহার ফলে তাহারা নানাপ্রকার স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হয়। এই সমস্ত অস্থির ও চঞ্চলপ্রকৃতি লোকের জন্য মনের শান্তি ও আধ্যাত্মিক প্রাণশক্তির একান্ত প্রয়োজন। অর্থসঞ্চয় ও নানাপ্রকার কার্যকরী বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য বাসনার বশবর্তী হইয়া পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা সমস্ত কার্য করিয়া থাকে। তাহারই ফলে এক্ষণে তাহারা প্রভূত অর্থশালী ও বিপুল বিষয়সম্পদের অধিকারী হইয়াছে। আজ তাহাদের অনেকে এই অর্থরাশি ও বিষয়-বিভব ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে। আমেরিকায়

বহু শত ব্যক্তি আছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকে বহুকোটি টাকার মালিক। ইঁহাদের অনেকেই বিষয় সম্পত্তির প্রাচুর্যে ও ভোগবিলাসের আতিশয্যে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছেন। ভোগসুখ না মিটিলে কাহারও পক্ষে যোগসাধনার অধিকারী হওয়া যায় না অর্থাৎ রাজসিক বৃত্তিকে অতিক্রম না করিয়া কেহ সত্ত্বগুণী হইতে পারে না। আমেরিকায় বহুশত ব্যক্তি ভোগবিলাসের চরমে উঠিয়া জীবনকে নানাভাবে উপভোগ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা ত্যাগসাধনাকে জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছেন। আমেরিকার অধিবাসীরা অত্যন্ত কর্মব্যস্ত জাতি, সময়ই তাঁহাদের নিকট অর্থসম্পদ। এক্ষণে তাঁহারা ভোগসুখে বিতৃষ্ণ হইয়া বেদান্তের অধ্যয়নে ও যোগসাধনায় রত হইবার জন্য অভিলাষী হইতেছেন। আপনারা কি মনে করেন কোনও সুফল না পাইলে কি তাঁহারা বেদান্ত ও যোগ-সাধনাতে বরাবর অনুরক্ত হইয়া থাকিবেন? না, কারণ তাঁহারা জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কর্মতৎপর জাতি। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং য়ুরোপের অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের দেখিয়া আপনারা আমেরিকাবাসীদের জীবনযাপনপ্রণালী সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারিবেন না।

আমেরিকাবাসী মহিলারাই জগতের অন্য সমস্ত দেশের নারীজাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিকতর শিক্ষিতা। আমেরিকায় ত্রিশ চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্তও মেয়েরা বিবাহ করেন না, এবং অনেকেই পবিত্রভাবে জীবন যাপন করেন। তাঁহারা কোন পুরুষকে রক্ষক ও সহায়করূপে না লইয়াও নির্ভয়ে একাকী নানাদেশে যাতায়াত করেন। ইংল্যাণ্ডের নারীরা

তাহা করিতে পারেন না। ইংরাজেরা অত্যন্ত রক্ষণশীল (conservative) জাতি। কিন্তু আমেরিকানরা এরূপ রক্ষণশীল নয়। স্বাধীনতাই তাঁহাদের আদর্শ। তাঁহারা সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা পূর্ণভাবেই ভোগ করিয়া থাকেন। এক্ষণে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লাভের জন্যও চেষ্টা করিতেছেন। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে মানুষের স্বাধীনতার অধিকারই যীশুখৃষ্টের জীবনকালে প্রচারিত প্রকৃত খ্রীষ্টধর্ম্মের শিক্ষা। কিন্তু কালক্রমে সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা বিকৃত খ্রীষ্টান ধর্ম্মের নানা-প্রকার যুক্তিহীন ও অনুদার নিয়মপ্রণালী স্বাধীনতাপ্রিয় আমেরিকাবাসীদের পক্ষে এক্ষণে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। যীশুখৃষ্টের উপদেশ: "তোমরা সত্যকে উপলব্ধি কর, এবং সত্যই তোমাদিগকে মুক্তিদান করিবে"[১]। জ্ঞানসাধনার পথ দিয়াই সত্যকে লাভ করিতে হইবে—ইহাই প্রকৃত খৃষ্টধর্ম্মের উপদেশ। এইখানেই যীশুখৃষ্টের ধর্ম ও বেদান্তের সহিত ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ আমাদের আধ্যাত্মিক আদর্শও মোক্ষ লাভ। 'মোক্ষ' শব্দের অর্থ কি শুধ্ নিঃশ্রেয়স আধ্যাত্মিক মুক্তি? না, 'মোক্ষ' শব্দের অর্থ আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানসিক, দৈহিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তি। আপনাদের জীবনের প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রে এই মোক্ষই যেন আদর্শরূপে গৃহীত হয়। ইহা ছাড়া আমাদের আর অন্য কোনও আদর্শ হইতে পারে না।

সম্প্রতি আমি কলম্বো হইতে কলিকাতা পর্যন্ত ভারতবর্ষ

১। And ye shall know the Truth and Truth shall make you free.' —St. John. VIII 32

ও সিংহলের অধিকাংশ স্থানেই ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি। তাহাতে আমার এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, একমাত্র অধ্যাত্ম শক্তিতেই হিন্দুজাতি বাঁচিয়া আছে। দাক্ষিণাত্যে আপনারা গমন করিলে দেখিতে পাইবেন সেখানকার লোকেরা কোনও সমাজসংস্কারক অথবা কোন রাষ্ট্র-নেতার সম্বন্ধে তেমন আগ্রহ ও ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন না। কিন্তু কোন ধর্মসংস্কারক নেতা সেখানে যাইলে তাঁহারা ভক্তিভরে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে থাকেন। যথার্থ ধর্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে সেখানকার লোক ঈশ্বরের জীবন্ত মুর্তিজ্ঞানে ভক্তিভরে পূজা করেন। এই মহাপুরুষের জন্য দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীরা যে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে পারেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভারতবাসীরা অর্থাৎ হিন্দুরা ধর্মকে অবলম্বন করিয়াই বাঁচিয়া থাকেন। ধর্মই হিন্দুদের ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল ও নিদ্রার বিশ্রাম সুখ। হিন্দুজাতি ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনও জাতির মধ্যে ধর্ম এমন করিয়া সমস্ত জাতীয় প্রকৃতির মধ্যে এত গভীরভাবে প্রবেশ করিতে পারে নাই। সেই জন্য ধর্মকেই আমাদের আদর্শ বলিয়া ধরিয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু আপনারা মনে রাখিবেন যে, ধর্ম, সামাজিক রাষ্ট্রীয় ও সর্ববিধ অপর আদর্শকেই অন্তর্ভূক্ত করিয়া রাখে। রাষ্ট্রীয় সামাজিক অথবা অন্য কোন আদর্শ মানবজীবনের সমগ্র আদর্শের এক একটি আংশিক বিশেষ আদর্শ মাত্র। যদি আমরা নিজেদের আধ্যাত্মিক আদর্শকে বিসর্জন দিয়া ইংরাজ অথবা আমেরিকাবাসীদের অনুকরণে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট আদর্শের পথে চলি তাহা হইলে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের দিক

দিয়া আমরা মৃত জাতিতে পরিণত হইব এবং এখনকার মতন আমাদের জাতীয় নেতারা চিরকাল দলাদলি ও বিবাদ বিদ্বেষ লইয়াই পড়িয়া থাকিবেন।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে আমাদিগকে অবশ্যই একমত ও একমন হইতে হইবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের বাঙ্গলাদেশের আটকোটি লোকের মধ্যে আটকোটি বিচ্ছিন্ন মন বর্তমান। কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাজ্যে আটকোটি লোকের মধ্যে একটি মাত্র একতাবদ্ধ মনই দেখিতে পাওয়া যায়। জাপানে গমন করিলে আপনারা দেখিতে পাইবেন যে, সেখানকার চারকোটি আশীলক্ষ লোকেরও একটি মাত্র মন। ইংলণ্ডেও দেখা যায় সেখানকার অধিবাসীদের মনও এক। কিন্তু আমরা ভারতবর্ষে কি দেখি? ভারতের চল্লিশকোটী অধিবাসীকে দেখিলে আমি সম্পূর্ণরূপে হতাশ হইয়া পড়ি এবং তাঁহাদের নিকট হইতে কোন কিছুই আমি আশা করিতে পারি না। ভারতের নেতাদের মধ্যে মতের ঐক্য নাই—তা সে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, ধর্ম অথবা যেকোন ব্যাপারেই হউক। কিন্তু বন্ধুগণ, বেদান্ত অধ্যয়ন ও তাহা সাধন করিলে আপনারা একত্বার ভিত্তিভাবের সন্ধান পাইবেন। কারণ একতাই জীবনের সূচনা করে—একতাই জীবনের চরমগন্তব্য স্থল। দুইটি লোকের মুখের আকৃতি দেখিতে যদিও এক প্রকার নয়, দুইটি ব্যক্তির মানসিক গঠন যদিও সমান প্রকৃতির নয় তবুও তাহাদের সকলেরই আত্মা স্বরূপতঃ এক—এই সত্যই আপনাদিগকে সর্বাগ্রে উপলব্ধি করিতে হইবে। আমাদের ধর্মের আদর্শ একাত্মতার, জাতীয় জীবনেও যেন এই একত্বই

ফুটিয়া উঠে—এই একত্বই যেন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হয়। মানবপ্রীতি, বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে আমরা খুব লম্বা লম্বা কথাই বলিয়া থাকি, কিন্তু শুধু মুখে মুখে এ'সম্বন্ধে আস্ফালন করিয়া বেড়াইলে আমাদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব জাগিয়া উঠিবে না। গত দুইশত বৎসর ধরিয়া আমরা কেবল কথাবার্তা ও বক্তৃতার আস্ফালন করিয়াই সময় নষ্ট করিয়াছি এবং এখনও সেইভাবে বৃথা বাক্যব্যয় করিয়া চলিয়াছি। কিন্তু আসুন, এখন হইতে আমরা কর্মসাধনায় প্রবৃত্ত হইতে আরম্ভ করি। মুখের কথা বন্ধ করিয়া এখন কাজ করিতে আরম্ভ করুন। শুধু চিৎকার ও গলাবাজী করিয়া মিছামিছি বেড়াইবেন না। স্বদেশী-আন্দোলনের কথা যখন আমি প্রথম শুনি তখন আমি আনন্দিত হইয়াছিলাম। তাহার পর আমি সম্প্রতি ভারতে আসিয়া দেখিলাম স্বদেশী-আন্দোলনের প্লাবন ভারতের সমগ্র স্থানে বিস্তৃত হয় নাই। আবার কলিকাতায় আসিয়া আমি দেখিলাম এখানকার রাষ্ট্রীয় নেতারা এক আদর্শে ঐক্যবদ্ধ ও অপ্রাণিত হওয়ার পরিবর্তে একে অন্যের নিন্দা ও পরস্পর দোষারোপ করিতেছেন। রাষ্ট্রনৈতিক ও শ্রমশিল্পীর (industrial) উন্নতি সাধনে সাফল্য লাভে অভিলাষী হইতে হইলে আপনাদের উচিত ধর্মনীতিকে অবলম্বন করা। কারণ ধর্মেই আমাদের জাতীয় জীবন, ধর্মেই আমাদের প্রাণ-শক্তি নিহিত। আমাদের ধর্ম এখনও বর্তমান। কিন্তু এতাবৎকাল আমরা রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ব্যাপারে যেভাবে কার্য করিয়া আসিয়াছি সেইভাবে কার্য করিয়া যাইলে

আমাদের জাতীয় দুর্গতি ও অধঃপতন আরও গভীর ও শোচনীয় হইয়া উঠিবে।

প্রাচীন আর্যঋষিবৃন্দ শিক্ষা দিয়াছেন 'অভীঃ' অর্থাৎ ভয়শূন্যতাই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। বেদান্তের সাধন সাহায্যেই আমরা পূর্বতন ঋষিবৃন্দের সুযোগ্য বংশধর হইতে সক্ষম হইব। কিন্তু আপনাদের মধ্যে কয়জন আছেন যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ভয়হীন? আপনাদের মধ্যে কয়জন নির্ভয়ে কামানের গোলার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারেন? আপনাদের সম্মুখে এই একজন নিঃসম্বল দরিদ্র সন্ন্যাসী ভারতবর্ষ হইতে একটি পয়সাও সাহায্য না লইয়া সুদূর সমুদ্রপারে সমগ্র আমেরিকা যুক্তরাজ্যে ও য়ুরোপে নিঃসম্বল অবস্থায় একাকী দশ বৎসর কাল কাটাইয়া দিয়াছে। আর যে কার্য সে করিয়াছে তাহার বিনিময়ে দেশবাসীর নিকট হইতে কোনও পুরস্কার অথবা প্রতিদান সে চায় নাই। শীত-কালে প্রতিবৎসর নিউ ইয়র্কে শূন্য ডিগ্রি অপেক্ষা আরও কয়েক ডিগ্রি নিম্নে শীতের (ঠাণ্ডার) প্রকোপ দেখা দেয়। সে সময়ে নিউ ইয়র্কের প্রত্যেক রাস্তাই বরফে ঢাকা পড়িয়া যায়। সেখানে বিশ্বপ্রকৃতি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, জনসাধারণ এবং অন্য সমস্ত ব্যাপারের বিরুদ্ধে আপনাদের সংগ্রাম করিতে হইবে। যদি আপনারা নিজেদেরই প্রভু হইতে ইচ্ছা করেন তবে আপনাদিগকে সর্বাগ্রে বিগতভীঃ (ভয়শূন্য) হইতে হইবে। সুদূর বিদেশে চলিয়া গিয়া সেখানে আপনারা আপনাদের ভাগ্য-অন্বেষণ করিতে থাকিলে দেখিবেন যে, আপনারা ক্রমে ক্রমে কিরূপ ভয়শূন্য হইয়া পড়িতেছেন এবং মাতৃভূমির হিতসাধনে কিরূপ যোগ্যতা লাভ করিতেছেন।

সমস্ত ভয়কে জয় করাই আমাদের আদর্শ, কারণ আমরা জন্ম ও মৃত্যুর অধীন নয়। প্রকৃতপক্ষে আমরা আত্মা, জন্মরাহিত্য ও মৃত্যুবিহীনতাই আমাদের আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম। ভগবদ্‌-গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বাণীসম্ভার রক্ষিত আছে। অনুমান ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে ভগবদ্‌গীতা রচিত হইয়াছিল। গীতার অন্যতম শিক্ষা: "অগ্নির দ্বারা আত্মাকে দগ্ধ করিতে পারা যায় না, বায়ুর দ্বারায় আত্মা শুষ্ক হয় না, জল কখনও আত্মাকে সিক্ত করিতে পারে না, তরবারির দ্বারা আত্মাকে ছিন্ন করা অসম্ভব"[১]। আত্মার ধ্বংস নাই, আত্মা শাশ্বত, অব্যয় ও মৃত্যুহীন। জীবনের প্রতিক্ষণেই ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। আমাদের সত্ত্বা চিরন্তন ও মৃত্যুহীন (অক্ষয় ও অমর) এবং অমৃতত্বেই আমাদের স্বাভাবিক সহজ অধিকার। যদি এই চিন্তায় আমরা অভিনিবিষ্ট হইতে পারি তবে আমরা আর কোন কিছুকেই ভয় করিব না। কাহাকে এবং কোন্ বস্তুকে আমরা ভয় করিব? মৃত্যুকে? মৃত্যু বলিতে কী বুঝায়? এজন্মের অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে পুরাতন জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মতন এই স্থূল জড়দেহকে হেলায় পরিত্যাগ করুন। এই দেহকে যদি জীবনপ্রান্তে জীর্ণ বস্ত্র-খণ্ডের মতন পরিত্যাগ করিতে না পারি তবে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার কোন অধিকারই আমাদের নাই। পৃথিবীর আর কোন ধর্মে এ প্রকার মহতী শিক্ষা নাই, এই মহতী শিক্ষা একমাত্র বেদেই পাওয়া যায়। যদি অন্য কোন অতি

১। নৈনং ছিন্দন্তি শাস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
—গীতা ২।২৩

মানবিক শক্তি মানুষকে পরিত্রাণ না করে তবে অন্য সমস্ত ধর্মের মত এই যে, দেহত্যাগ করিয়া মানুষকে নিশ্চয়ই নরকে যাইতে হইবে। কিন্তু একমাত্র আমাদের ধর্মই শিক্ষা দেয় যে অমৃতত্ব লাভে মানবমাত্রের জন্মগত অধিকার আছে। সহস্র সহস্র নরনারী এই মহাসত্যকে লাভ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ভ্রাতৃবৃন্দ আপনারা জাগ্রত হউন! আপনাদিগকে এক মহান্ কার্য সাধন করিতে হইবে। পৃথিবীর দেশে দেশে আপনারা চলিয়া যান। যে পবিত্র উত্তরাধিকার আপনারা আপনাদের পূর্বপুরুষ ঋষিদের নিকট হইতে পাইয়াছেন সেই পরমসত্যের বার্তা সর্বত্র প্রচার করুন এবং প্রমাণ করুন যে, সমস্ত ভয় হইতে আপনারা চিরমুক্ত। আপনাদের জীবনের দৃষ্টান্তে ধর্মের এই সাধন-তৎপরতা দেখিয়া সকলে এই সত্যসাধনার পথকে অনুসরণ করিয়া সত্যকে উপলব্ধি করুক। সর্বদা স্মরণ রাখিবেন যে আমরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান, আমরা অমৃতের পুত্র। এই আদর্শ ই আপনাদিগকে শক্তি দান করিবে। আমরা শক্তি চাই, আমাদের দেহের পেশীসমূহ লোহার মতো কঠিন ও স্নায়ুগুলিকে ইস্পাতের মতো সুদৃঢ় করিতে চাই। যে যুগে আমরা বাস করিতেছি ইহাই তাহার দাবী। যেমন করিয়াই হউক আমাদিগকে তাহা লাভ করিতে হইবে। কী উপায়ে আমরা সে সব লাভ করিব? তাহা কি শুধু বাচালতা ও বক্তৃতার আড়ম্বরের দ্বারা লাভ হইবে? শুধু বাক্য-বাগিশতায় কখনই ইহা সম্ভব হইতে পারিবে না। আমাদের সমস্ত ভুল দোষ ও ত্রুটির কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। আমাদিগকে একতাবদ্ধ হইতে হইবে যাহাতে

আমরা একমতাবলম্বী বিরাট জনসঙ্ঘে পরিণত হইতে পারি। একতা ও পরস্পর সহযোগিতা থাকিলে আমরা আমাদের বর্তমান অবস্থা অপেক্ষা সহস্রগুণে বলশালী হইতে পারিব। রাজনৈতিক বক্তৃতাবলীর দ্বারায় আমরা সেই শক্তি কখনই পাইতে পারি না। একমাত্র ধর্মের দ্বারাই এই শক্তি লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব।

আমেরিকা যুক্তরাজ্যে বহুবৎসর পূর্বে একদা যে মহা-কার্যের সূচনা হইয়াছিল ক্রমেই তাহার উন্নতি ও প্রসারতা হইতেছে। বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাজ্যে আমাদের সঙ্ঘের ছয়জন প্রচারক সন্ন্যাসী আছেন[১] সানফ্রান্সিসকো (San Francisco) নগরে কয়েক বৎসর হইল "হিন্দুমন্দির" (Hindu Temple) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ডের আক্রমণ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের এই আশ্রম ঐশ্বরিক শক্তির বলে আশ্চর্যভাবে রক্ষা পাইয়াছিল।[২]

ইহা ছাড়াও আমাদের সঙ্ঘ যোগশিক্ষার্থীদের তপস্যামায়

১। পাঠকদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের বেদান্তপ্রচারের আন্দোলন ও কার্যগতিসম্বন্ধে এখানে নির্দেশ করিতেছেন। ইহার পরে প্রচারকার্যের প্রসারতা বাড়িয়া চলিয়াছে এবং আরও অধিক সংখ্যক সন্ন্যাসী সেদেশে প্রচারকার্যে রত আছেন ইহা শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের ইতিহাস পাঠকমাত্রেই জানেন।

২। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্যতম সাক্ষাৎ সন্ন্যাসী শিষ্য পূজনীয় স্বামী ত্রিগুণাতীতের (শ্রীমৎ সারদা মহারাজের) ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা, আধ্যাত্মিকতা, কর্মশক্তি ও চরিত্রমাধুর্যের প্রভাবে সানফ্রান্সিস্‌কো নগরীতে "হিন্দুমন্দির" (Hindu Temple) নামে শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের বেদান্তপ্রচারকেন্দ্রের স্থায়ী প্রতিষ্ঠান নির্মিত হইয়াছিল। আমেরিকায় স্বামী ত্রিগুণাতীতের প্রচারকার্য আশ্চর্য সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। স্বামী ত্রিগুণাতীত ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩০ জানুয়ারী কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মপ্রচারকালে একজন উন্মাদ ব্যক্তির নিক্ষিপ্ত একটি হাত বোমা তাঁহার উপরে পতিত হয়, তাহারই ফলে এই এই মহাপুরুষ ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী দেহত্যাগ করেন।

জীবনযাপনের জন্য “শান্তি-আশ্রম” নামে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় একটি সুন্দর আশ্রম সেখানে স্থাপন করিয়াছেন। আমেরিকানদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত নরনারী আমার কাছে ধর্মোপদেশ ও যোগশিক্ষার জন্য যাতায়াত করেন। ইঁহাদের মধ্যে আমার যোগশিক্ষার একজন ছাত্রী আশ্রম নির্মাণের জন্য নগরের কর্মকোলাহল ও জনবহুলতাবর্জিত ১৬০ একার (acre) পরিমিত একখণ্ড নির্জন ভূমিখণ্ড দান করেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় সেই জনহীন অরণ্যপ্রায় ও শান্তিসমীরিত উন্মুক্ত প্রান্তরে অবস্থিত আশ্রমে আমাদের কয়েকজন আমেরিকান শিষ্য ও শিষ্যা এবং ধর্মানুরাগী ছাত্র-ছাত্রী ধ্যান-ধারণা অভ্যাসের জন্য প্রতিবর্ষেব কয়েকমাস ধরিয়া যাপন করেন।[১] ইহা ছাড়াও আমেরিকা যুক্তরাজ্যের নানাস্থানে আরও কয়েকটি বেদান্তপ্রচারের কেন্দ্র আছে। কিন্তু এখন সেখানে আরও অধিক সংখ্যক প্রচারক উদারদৃষ্টিসম্পন্ন সন্ন্যাসীর উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন। অতএব এখানে শ্রোতা-রূপে উপস্থিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযের গ্রাজুয়েটদের মধ্যে যাঁহারা অবিবাহিত ও সুচরিত্র যুবক উপস্থিত আছেন সেই সমস্ত যুবকদিগের প্রতি আমার অনুরোধ তাঁহারা ব্রহ্মচর্যময় সংযত পবিত্র জীবনযাপন করুন। ব্রহ্মচর্যের অভ্যাসের ফলে আপনাদের মধ্যে অমিত শক্তি জাগ্রত হইবে এবং তাহাতে

১। আমেরিকায় সানফ্রান্সিস্কো মহানগরীর সুদূর উপকণ্ঠে অবস্থিত 'শান্তি-আশ্রম'। মিস, মিনি সি বুক নামে জনৈক আমেরিকান মহিলা পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দের নিকট যোগসাধনা ও ধর্ম তত্ত্বের শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। এই মহিলা স্বামী অভেদানন্দকে এই বিশাল ভূমিখণ্ড আশ্রম নির্মাণের জন্য দান করেন। এই আশ্রম গ্রহণসম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত চাহিলে তিনি স্বামী অভেদানন্দকে লিখিয়া পাঠান: "স্বামী তুরিয়ানন্দকে অবিলম্বেই সেখানে পাঠাইয়া দাও"। স্বামিজীর নির্দেশ অনুযায়ী পূজ্যপাদ স্বামী তুরীয়ানন্দ সেখানে “শান্তি-আশ্রম” প্রতিষ্ঠা করিয়া পরে তাহার বিশালতা ও স্থায়িত্ব দান করেন।

আপনারা জনসমাজের নেতৃত্বলাভের অধিকারী হইবেন। ব্রহ্মচর্যের এই আদর্শ বারবার নূতন করিয়া জাগ্রত ও উজ্জীবিত করিতে হইবে। তাহারই ফলে আমেরিকা হইতে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ণ, প্রাণতত্ত্ব, উদ্ভিদবিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিঙ, শ্রমশিল্প ও নানাবিধ ব্যবহারিক বিদ্যায় (technical and vocational subjects) বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকগণ ভারতবর্ষে আসিবেন এবং দীর্ঘকাল থাকিয়া এদেশের ছাত্রদের বিনা বেতনে ও বিনা পারিশ্রমিকে ঐ সমস্ত বিষয় শিক্ষা দান করিতে থাকিবেন। আমেরিকাবাসীরা আমাদিগকে এ'বিষয়ে সাহায্য করিতে উন্মুখ—বিশেষতঃ শিক্ষাব্যাপারে ভারতবাসী-দিগকে সাহায্যদানে তাঁহাদের বিশেষ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্য জগতের সহিত বর্তমান যুগে সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের একটি নিবিড় সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল যে ভারতবর্ষের সহিত এবং আমেরিকা যুক্তরাজ্যের সর্ববিধ সাংস্কৃতিক মিলন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং আমেরিকার বেদান্তকেন্দ্রগুলির মধ্য দিয়াই এই সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের কার্য চলিতে থাকিবে। আমেরিকা যুক্তরাজ্যে গমন করিলে আপনারা সেখানকার অধিবাসীদের নিকট হইতে সহৃদয়তা পাইবেন। হিন্দুদিগকে আমেরিকার লোকেরা নৈতিক আধ্যাত্মিক ও ঐশ্বরিক ভাবে বিশেষরূপে উন্নত এবং পৃথিবীর মধ্যে দার্শনিক বিচারে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া মনে করেন।[১]

১। যে সময়ের কথা স্বামী অভেদানন্দ বলিতেছেন সে সময়ে আমেরিকার সকলে না হউক অনেকেই ভারতবাসী ও ভারতবর্ষের ধর্মমত, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধার

ভারতবাসী ও বর্তমান যুগ

যত প্রাচীন সত্যই হউক না কেন, আমেরিকাবাসীরা তাহা গ্রহণ করিবার জন্য অভিলাষী। বেদবর্ণিত সনাতন ধর্ম অপেক্ষা সমগ্র জগতে আর কোন কিছুই প্রাচীনতর মহৎ বিষয় নাই। আমেরিকায় যে মহাকার্যের সূত্রপাত হইয়াছে য়ুরোপের বিভিন্ন জাতির চিত্তে তাহা প্রতিবিম্বিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের, আমার

চক্ষে দেখিতেন। একথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, আমেরিকা একদিকে যেমন এমার্সন, থোরো ও হুইটম্যানের দেশ আবার অন্যদিকে মিস মেয়োরও স্বদেশ। সম্প্রতি আমেরিকাবাসী ভারতবিদ্বেষপ্রচারকমণ্ডলী (Anti-Indian Propaganda Movement) নামে এক ব্যাপক ও শক্তিশালী আন্দোলন বহু বৎসর ধরিয়া চলিতেছে এবং তাহার বিষময় ফল পরাধীন ভারতবাসী মর্মে মর্মে ভোগ করিতেছে। ভারতবিদ্বেষী ও সত্যের অপলাপকারী বহু হীনচেতা ও স্বার্থপর আমেরিকাবাসী এই আন্দোলনের প্রচারক। ভারতবর্ষ বিশেষতঃ হিন্দুদের ধর্ম ও সমাজনীতির বিরুদ্ধে মিথ্যা ও অযথা কুৎসা রটনা করাই এই প্রচারকমণ্ডলীর একমাত্র কার্য। ইহারা নানা সভা সমিতিতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অলীক কাহিনীপূর্ণ কুৎসিত বর্ণনাময় বক্তৃতা করিয়া ভারতবাসীদের বিরুদ্ধে সভ্য সমাজের ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অবজ্ঞার ভাব বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। ইহা ছাড়া নানা প্রকার ক্ষতিকর পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা করিয়াও ভারতবর্ষকে সভ্যজগতের নিকট হীন অসভ্য বর্বরজাতির দেশ বলিয়া প্রচার ও প্রতিপন্ন করার কুচেষ্টাও ইহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও কার্য। *Mother India, Naked Ascetic* প্রভৃতি কুখ্যাত পুস্তকগুলি পড়িলে জানা যায় আমেরিকানরা ভারতবাসীদের কী অবজ্ঞার চক্ষেই দেখিয়া থাকে। ইহা ছাড়া আজ প্রায় বিশ বৎসরের অধিক হইল আমেরিকা যুক্তরাজ্যে বৈদেশিক বিতাড়ন আইন (Asiatic Imigration Bill) পাশ হওয়ায় এশিয়াবাসী সমস্ত ব্যক্তিই আমেরিকার স্বাধীন নাগরিকের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। বহুবৎসর ধরিয়া এই আইনের বিরুদ্ধে ভারতবাসী, চীনা এবং অন্যান্য এসিয়াবাসীরা আন্দোলন করিতেছেন। আমেরিকান শাসন কর্তৃপক্ষ মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়া কেবলই বলিতেছেন এই আইন উঠাইয়া দেওয়া হইবে। সম্প্রতি প্রেসিডেণ্ট টুম্যান এশিয়াবাসীদের আমেরিকার নাগরিকত্ব অধিকার লাভের অনুকূলে সম্মতিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন বটে। কিন্তু কবে যে তাহা কার্যে পরিণত হইবে তাহা আজ পর্যন্তও জানা যায় নাই।

এবং আমাদের সঙ্ঘের অন্যান্য প্রচারক সন্ন্যাসীদের লিখিত বহু গ্রন্থ জার্মান, ফরাসী, স্পেনিস প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে। ইংলণ্ডের বহু নগরে বেদান্তের প্রচার-কেন্দ্র-স্থাপনের জন্য আমাদিগের নিকটে ক্রমাগত আহ্বান আসিতেছে। সেইজন্য আমরা এক্ষণে আরও প্রচারক চাই। যাঁহারা পবিত্র চরিত্র ও সর্বত্যাগী, সেই সমস্ত যুবকদেরই শুধু শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘ আপনার অনুমোদিত প্রচারক বলিয়া গ্রহণ করিবেন। যে বেদান্ত বিগত তের বৎসর ধরিয়া আমেরিকা-যুক্তরাজ্যে প্রচার ও শিক্ষা দেওয়া হইতেছে তাহা হিন্দুধর্ম্ম নামে পরিচিত আমাদের জাতিরই অবলম্বিত ধর্ম। ইহা আর্যধর্ম, সনাতনধর্ম, অথবা বৈদান্তিকধর্ম নামে আরও অধিকতর পরিচিত। প্রকৃত বেদান্ত ধর্মের সহিত বৈষ্ণব, শৈব শাক্ত প্রভৃতি অন্য সমস্ত ধর্মমতের সহিত কোনও বিদ্বেষ নাই। যদিও জগতের নানাবিধ সাম্প্রদায়িক ধর্মের পৃথক পৃথক সাধন পথ তথাপি এই সমস্ত ধর্মের সকলেরই চরমগন্তব্য এক। এই প্রসঙ্গে আমি বহু ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুদের দ্বারা প্রত্যহ ভক্তিভরে পঠিত 'মহিম্নস্তোত্র'-এর একটি বিশেষ শ্লোক আবৃত্তি করিয়া আমার বক্তৃতা সমাপ্ত করিতেছি। সে শ্লোকটি হইতেছে: "রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃকুটিল নানা পথজুষাং নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥"—অর্থাৎ, বিভিন্ন নদীর স্রোতধারা যেমন বিভিন্ন উৎস হইতে নিঃসৃত হইয়া সরল ও বক্র নানাগতির আকারে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে সকলে একই মহাসমুদ্রে আসিয়া মিলিত হয় সেরূপ হে ঈশ্বর, সাধকদের

বিভিন্ন রুচি সংস্কার ও ভাব অনুযায়ী নানাপ্রকার ধারা আপাতঃদৃষ্টিতে সরল অথবা কুটিল বলিয়া মনে হইলেও পরিণামে তাহারা পরমপরিপূর্ণ সত্যস্বরূপ তোমাতেই চরমে মিলিত হইয়া যায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

॥ তরুণ বাঙ্গালীর আদর্শ ॥

বর্তমান যুগে দুইটি পরস্পরবিরোধী শক্তি একে অন্যের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটি শক্ত সর্বদা আমাদিগের স্বাধীনতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং সুনীতি ও জাতীয়তা হইতে আমাদিগকে ভ্রষ্ট ও বিচ্যুত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। আমাদের পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া আমাদের উপর আধিপত্য স্থাপন করাই ইহার একমাত্র লক্ষ্য। অপর শক্তিটি আমাদিগের মধ্যে একতা ও জাতীয়তার বোধ জাগ্রত করিতেছে এবং সমস্ত ধর্মের চরমলক্ষ্য মহামুক্তির দিকে আমাদিগকে লইয়া যাইতেছে। এই বিরোধ ও সংঘর্ষের মধ্যে কোন আদর্শকে আমরা গ্রহণ করিব ইহাই প্রশ্ন আমরা কী জনসমাজের সহিত সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকিয়া জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শে উপনীত হইবার জন্য ব্যক্তিগতভাবে একা একাই প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকিব? অথবা পরস্পর একতাবদ্ধ হইয়া একসঙ্গে একই উদ্দেশ্য সাধনের গুরুভার স্কন্ধে লইয়া তাহাতে সাফল্যলাভের জন্য আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করিব? এই সংগ্রাম-প্রচেষ্টার ফলই আমাদের দেশজননী পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎকে নির্ধারিত করিবে। স্বর্থসাধনের বশবর্তী হইয়া নিজের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ও হীন উদ্দেশ্য সাধনের প্রাধান্য দেওয়ার দ্বারা কোন যুগে কোন জাতিই মহৎ

হইতে পারে নাই। নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে জাতীয় কল্যাণের উদ্দেশ্যে মানবতার বেদীমূলে বলি দেওয়ার ফলেই মহামানবদের দ্বারা বিচিত্র গৌরবময় যাবতীয় মহাকার্য সম্পন্ন হইয়াছে জগতের বিভিন্ন জাতির ইতিহাসে ইহাই আমরা পাঠ করিয়া থাকি। জগতের অন্যান্য জাতিদের দ্বারা অবলম্বিত উন্নতি ও সমৃদ্ধিলাভের পথ যদি আমরা অনুসরণ না করি তাহা হইলে আমরা পরিণামের দাস হইয়া পড়িয়া থাকিব এবং আমাদের ভবিষ্যৎ চির অন্ধকারে আবৃত হইবে। মহত্ত্ব ও সমৃদ্ধিলাভের উদ্দেশ্যে এই সংগ্রামের জন্য আমাদিগকে অতি অবশ্যই জাগ্রত হইতে হইবে। আমাদের সর্বতোভাবে স্বাবলম্বী হওয়া একান্ত আবশ্যক। জীবনের প্রাত্যহিক ব্যাপারে ও প্রতিপদে নির্ভীকতা ও সাহস করা আমাদিগের পক্ষে একান্ত উচিত।

বর্তমানে আমরা কী চাই? বর্তমানে আমরা আমাদের দেশীয় শ্রমশিল্পের উন্নতিসাধনে, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিতে এবং জগতের মধ্যে আমরা একটি প্রকৃত উন্নতিশীল জাতি হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছি। এ'ব্যাপারে অন্য সমস্ত জাতির সহিত আমাদের উদ্দেশ্য একই যে আমরা স্বাধীনতা চাই। কিন্তু কোন্ প্রকারের স্বাধীনতা আমরা চাই? জগতের অন্যান্য সমস্ত জাতিদের অপেক্ষা আমাদের স্বাধীনতার আদর্শ আরও মহত্তর। শুধু সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে স্বাধীনতা লাভ করিয়াই য়ুরোপীয়ানরা ও আমেরিকা-বাসীরা সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু মনে করুন আমরা হিন্দুরা যদি রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারি

শুধু তাহাতেই কি আমরা সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে পারিব? কখনই না, কারণ আমাদের জাতির আদর্শ অন্য যে কোনও জাতির আদর্শ অপেক্ষা বিশালতর ও শ্রেষ্ঠ। যাহা প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতা সেই স্বাধীনতাকেই আমরা লাভ করিতে চাই। প্রকৃত স্বাধীনতার আদর্শ কি তাহা বেদে উল্লিখিত হইয়াছে। বেদে ইহাকে 'মোক্ষ' বলে। 'মোক্ষ'-শব্দের অর্থ বন্ধনমুক্তি, অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান বা অজ্ঞানরূপবন্ধন হইতে সর্বতোভাবে মুক্তিলাভ। বন্ধুগণ, এই বন্ধনমুক্তি জগতের আর সমস্ত স্বাধীনতারই ভিত্তি। এই আধ্যাত্মিক মুক্তিই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত এবং ইহা লাভ করাই যেন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হয়। এই আদর্শকে জীবনে রূপায়িত করিতে হইলে আমাদিগকে প্রাণপণে কঠোর সাধনা করিতে হইবে। কারণ এই অজ্ঞানমুক্তিই সর্বোচ্চ ও চরমমুক্তি। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অতি অল্পকাল মাত্র স্থায়ী হইতে পারে। ইহা আমাদের আত্মার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না, ইহা আমাদের আত্মার মুক্তিদান করিতে পারে না। কিন্তু আধ্যাত্মিক মুক্তি অনন্তকাল স্থায়ী। এই মুক্তিলাভের পরও মানবদেহেই আমরা জীবন্ত ঈশ্বররূপে সমগ্র জগতে বাস করিতে পারি।

সামাজিক জীবনে স্বাধীনতা লাভ ও তাহা ভোগ করা হয়তো অনেকেরই আদর্শ হইতে পারে, কিন্তু ইহা আমাদের প্রকৃত জীবন যাপন বা অধ্যাত্ম জীবন লাভের পক্ষে কী সহায়তা করিতে পারে? সামজিক জীবনের স্বাধীনতা লাভ করিয়া আমরা জগতের মধ্যে স্বাধীন সমাজের অন্তর্গত অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারি। কিন্তু

জগতের সর্বাপেক্ষা উন্নত সমাজের অন্তর্ভুক্ত জাতিদের সামাজিক অবস্থা পরীক্ষা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, আমাদের সামাজিক অবস্থা ঐ সব জাতিদের সামাজিক জীবন হইতে বহুগুণে উন্নত। য়ুরোপ ও আমেরিকায় গেলে আপনারা দেখিতে পাইবেন দৈনন্দিন জীবনযাপন-ব্যাপারে সেখানকার নরনারীদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন করিবার জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টা করা হইতেছে। কিন্তু জাতিহিসাবে হিন্দুরা স্বভাবত নীতিপরায়ণ। হিন্দুরা অন্য যে কোন জাতি অপেক্ষা অধিকতর সংযত, সত্যনিষ্ঠ, ধর্মভীরু ও ঈশ্বরবিশ্বাসী। ভোগ বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয়সুখে উন্মত্ত হওয়ার সংস্কার পাশ্চাত্য সমস্ত জাতির উপরে আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছে। অবশ্য পাশ্চাত্য দেশে মধ্যে মধ্যে নীতিপরায়ণ ও ধর্মনিষ্ঠ নরনারীদের দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোটি কোটি ভোগলিপ্সু ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ পাশ্চাত্য নরনারীদের মধ্যে ইঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। অপর পক্ষে আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ নরনারী আছেন তাঁহারা সুরা অথবা অন্য কোন মাদক দ্রব্যকে স্পর্শও করেন না। সুরাপানের কুঅভ্যাস দূর করিবার জন্য আমাদের দেশে নীতি প্রতিষ্ঠানের কোন সঙ্ঘ-সংগঠকের প্রয়োজন হয় না, কারণ আমাদের ধর্মে সুরা অথবা অন্য কোন মাদকদ্রব্য সেবন করা একেবারে নিষিদ্ধ। কিন্তু বর্তমানে দেখিতেছি আমাদের দেশের যুবকদের মধ্যে পাশ্চাত্য জাতির নানা কুৎসিত প্রবৃত্তি ও যথেচ্ছা-চারিতার অন্ধ অনুসরণের দুর্মতি দেখা দিতেছে। পাশ্চাত্য জাতিদের অনুকরণ করিতে হইলে তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধতা,

একতা, সময়নিষ্ঠা, কর্মশীলতা প্রভৃতি গুণগুলিই শুধু অনুকরণ করা উচিত, কিন্তু তাহাদের দোষগুলি অনুকরণ করা আমাদের উচিত নয়।

পাশ্চাত্য জাতিদের মধ্যে কি কি গুণ আছে পাশ্চাত্য দেশে যাইলে কোন বিদেশী ভ্রমণকারী প্রথমেই দেখিতে পান। উদ্দেশ্যসাধনে পাশ্চাত্য জাতিদের একত্রিত হওয়া এবং জাতির কল্যাণসাধনের জন্য সর্বতোভাবে আত্মোৎসর্গ করা মহদ্‌গুণ। পাশ্চাত্য দেশের লোকদের এই সমস্ত গুণ আমাদের শিক্ষা করা উচিত। পাশ্চাত্য জাতিদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার এই গুণকে অনুশীলন ও আয়ত্ত করা আমাদের কর্তব্য। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করার ধারা হিন্দুদের নিকটে অজ্ঞাত এবং সেজন্য আমরা আজ অপর জাতির পদতলে নিষ্পেষিত হইয়া পড়িয়া আছি। একমন ও একপ্রাণ হইয়া আমরা কোন কাজ করিতে পারি না, ইহা আমাদের জাতীয় চরিত্রের এক দারুণ কলঙ্ক। ভ্রাতৃভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা আমাদের সমস্ত দেশবাসীর সহিত একত্রে মিলিত হইয়া একই উদ্দেশ্য সাধনে কাজ করিতে অথবা পরস্পর সহযোগিতা করিতে পারি না কেন? মাতৃভূমির উন্নতি-সাধনের উদ্দেশ্যে একমন হইয়া আমাদের ভারতবর্ষের অধি-বাসীরা একত্রিত হইতে পারে না কেন? ইতিপূর্বে বক্তৃতা-দানের উদ্দেশ্যে আমি বহুস্থানে বহুবার বলিয়াছি যদি জাপানে যাই তাহা হইলে দেখিব সেখানকার চার-কোটি আশীলক্ষ লোকের মন প্রাণ একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত। ইংল্যাণ্ডে গেলেও আমরা দেখিতে পাই সেখানকার চারকোটি লোকেরও একই উদ্দেশ্য, একই লক্ষ্য, একই মন ও

প্রাণ। কিন্তু আমাদের দেশের চল্লিশ কোটি লোকের মধ্যে একতা ও একপ্রাণতা নাই, বরং এখানে প্রত্যেকটি মনের সমস্ত উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় ভিন্ন ও বিক্ষিপ্ত। এখানে চল্লিশ কোটি লোকের চল্লিশ কোটি বিরোধী মন। বাঙলাদশে আট-কোটি লোকের বাস। যদি বাঙালীদের মধ্যে একতা থাকিত তাহা হইলে কোনও বিরোধী শক্তি কি তাহাদের কখনও এরূপ অবনত করিয়া রাখিতে পারিত? সম্প্রতি আমাদের মধ্যে দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য ও স্বদেশী-আন্দোলনের মনোভাবকে আরও প্রবল ও প্রসারিত করিবার জন্য দেশবাসীদের আমরা উদ্দীপিত করিতেছি। কিন্তু এসবের উদ্দেশ্য কি এবং এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কোন্ পথ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা উচিত? অবশ্য প্রথমে আমাদের উচিত একত্রিত ও সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া। একতাই সাফল্য লাভের একমাত্র কারণ। কোন ব্যক্তি যদি অপর সকলের সহিত একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া কর্ম করিয়া যায় তাহা হইলে সে এক সহস্র লোকের মতোই শক্তিলাভ করিয়া কার্য করিতে পারিবে এবং পরিণামে তাহার সাফল্য ও গৌরব লাভ সুনিশ্চিত। সুতরাং আমাদের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে একতা অর্থাৎ ঐক্যসাধনের জন্য একপ্রাণতাতে সাফল্যলাভের রহস্য নিহিত। অতএব আমাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ করা কোনক্রমে উচিত নয়। আজ আমরা একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বশালী নেতার প্রয়োজন অনুভব করিতেছি যিনি দেশের সকল সম্প্রদায় ও সকল শ্রেণীকে সম্মিলিত কবিবেন ও তাহাদের পুরোভাগে থাকিয়া তাহাদের জাতীয় আদর্শকে স্বীয় জীবনে প্রতিফলিত করিবেন।

এই প্রকার একজন আদর্শ নেতাকে অনুসরণ করা সহজ, কিন্তু কোন আদর্শকে জীবনে পরিণত করা অত্যন্ত কঠিন। আজ আমরা এইপ্রকার একজন প্রকৃত শক্তিশালী ও মহান্ নেতার আবশ্যকতা অনুভব করিতেছি। এইরূপ একজন প্রকৃত সুযোগ্য নেতাকে অনুসরণ করাই এক্ষণে আমাদের কর্তব্য। এক্ষণে আমাদের জাতির এমন শক্তি নাই যে, আমরা আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারি। আজ আমরা এমন অধঃপতিত হইয়া পড়িয়াছি যে কোন এক আদর্শকে ধরিয়া তদনুযায়ী জীবন গঠন করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই।

আমাদের ধর্ম বহু আদর্শ দান করিয়াছে। অতীত বৈদিক যুগের অতিপ্রাচীন কাল হইতে যুগে যুগে আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষে বহু লোকোত্তর মহাপুরুষের আবির্ভাব ও অভ্যুদয় হইয়াছে। আমাদের জাতির মধ্যে একের পর এক বুদ্ধদেব শঙ্করাচার্য, রামানুজাচার্য, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও অবশেষে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছে। এই সমস্ত মহাপুরুষ অধর্মের প্রাবল্যের জন্য ধর্মভাব বিলুপ্তপ্রায় হইলে সমগ্র জগতের পরিত্রাণের জন্য প্রতিযুগে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। সমগ্র জগতের সম্মুখে ভারতবর্ষ ইহাদিগকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া প্রচার করিয়াছে। এই সমস্ত অসাধারণ ব্যক্তিত্বশালী মহাপুরুষ কি জাতীয় আদর্শরূপে আমাদের বরণীয় হইতে পারেন না! এই সমস্ত মহামানবদের আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাদের উপদেশ ও জীবনদৃষ্টান্তকে যদি আমরা প্রতিপালন ও অনুসরণ করি তাহা হইলে তাঁহাদের মহিমা আমাদের জীবন

ও কর্মে অনুপ্রবিষ্ট হইবে এবং তাঁহাদের অমিতশক্তি আমাদের ভিতর দিয়া আশ্চর্যভাবে কার্য করিতে থাকিবে। আমাদের চিত্তের মধ্যে সে আদর্শকে সর্বদা জাগাইয়া রাখিতে হইবে এবং যাহাতে আমাদের ভিতর দিয়া তাঁহাদের সেই শক্তি প্রবাহিত হয় সেই চেষ্টায় আমরা রত থাকিব। তাঁহাদের এই শক্তিই সর্বদা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত কার্যের মধ্য দিয়া আমাদের দিকে প্রবাহিত হইতেছে।

বেদপ্রতিপাদ্য ধর্মই আমাদের আসল ধর্ম। আমরা সকলে জানি যে বেদ কাহারও মনীষাসঞ্জাত ও হস্তলিখিত কোন গ্রন্থমাত্র নয়। কিন্তু সমগ্র বেদ অধ্যাত্ম তত্ত্ব সাক্ষাৎ-কারের ফলে উদ্ভূত মন্ত্ররাশি। এই সমস্ত মন্ত্র জ্যোতির্ময় আকারে প্রাচীন যুগে সত্যদ্রষ্টা আর্য্যঋষিদের দিব্যনেত্রের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়াছিল। জগতের যে কোনও ধর্মশাস্ত্র অপেক্ষা একমাত্র বেদেই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানরাশি রক্ষিত আছে। বাইবেল, কোরাণ, জেন্দাবেস্তা অথবা বৌদ্ধদের ধর্মশাস্ত্র (ত্রিপিটক প্রভৃতি) অধ্যয়ন করিলে আমরা দেখিতে পাই তাহাদের মধ্যে যেন একটি একদেশদর্শী আদর্শই প্রকাশিত হইয়াছে। সেই আদর্শ অনুযায়ী সত্যকে লাভ করিবার একটিমাত্র পথ ভিন্ন আর অন্য কোন পথ নাই। বেদেও আমরা সত্য সাক্ষাৎকারের সাধনাদর্শ দেখিতে পাই। যুগে যুগে ভারতবর্ষে বহু সত্যদ্রষ্টা ঋষি, সিদ্ধযোগী, জীবন্মুক্ত পুরুষ, অবতার প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা একই পরমপরিপূর্ণ সত্য বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সাধনপথ অবলম্বনে উপলব্ধি করিয়াছেন। সেজন্য পরিপূর্ণ ও শাশ্বত সত্য

বিচিত্র পথে উপলব্ধি করাই আমাদের দেশের তরুণ নর-নারীদের আদর্শ হওয়া উচিত।

যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ, জোরোয়াস্তার প্রভৃতি মহামানবগণের ধর্মে এমন কিছু নূতন বিষয় নাই যে, বেদে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। আমাদের ধর্ম জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সমস্ত সম্প্রদায়িক ধর্ম ভারতের উদার ও বিশ্বজনীন ধর্মের বিশাল বক্ষে স্থান পাইতে পারে। সুতরাং এই বেদবর্ণিত ধর্মের দ্বারাই মুসলমান, খৃষ্টান, জরথুষ্ট্রীয় প্রভৃতি অন্য ধর্মাবলম্বীদের সহিত আমরা বিশ্বভ্রাতৃত্বের ভাবে মিলিত হইতে পারি। কারণ জাতিধর্মনির্বিশেষে সমস্ত মানুষ সেই একই ঈশ্বরের সন্তান। ধর্মব্যাপারে সকলের চরমলক্ষ্য এক এবং সেই চরমলক্ষ্যে উপনীত হইলে মানবের মুক্তিলাভ হয়। ঈশ্বরের অন্যতম অবতাররূপে বরণীয় মহামানব যীশুখৃষ্ট মুক্তিলাভের উপায় বর্ণনাপ্রসঙ্গে ঘোষণা করিয়াছেনঃ "তোমরা সত্যকে উপলব্ধি করো এবং সত্যই তোমাদের মুক্তি দান করিবে"। নিশ্চয়ই এই সত্যের উপলব্ধিই আমাদের মুক্তি প্রদান করিবে। ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম অবতার বুদ্ধদেব যীশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের পাঁচশত বৎসর পূর্বে কি এই তত্ত্বই মানবজাতিকে শিক্ষাদান করেন নাই? সত্যের উপাসনা এবং মহামুক্তি লাভ করাই কি ভগবান বুদ্ধের জীবনাদর্শ ছিল না? ঈশ্বরের অন্যতম অবতার শ্রীচৈতন্য কি এই তত্ত্বই স্বীয় জীবনে রূপায়িত ও জন-সমাজে প্রচার করেন নাই? বেদে বর্ণিত ধর্মে উদার ও উচ্চ আদর্শই নদীয়ায় আবির্ভূত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমগ্র জন-সমাজে সহজ ও সরলভাবে প্রচার করিয়াছিলেন। নিজের

দেশের, স্বদেশবাসীদের ও সমগ্র জগতের কল্যাণব্রতে অনুপ্রাণিত হইয়া এবং আধ্যাত্মিক পরমসত্যকে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ যৌবনেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া ভিক্ষাপাত্র মাত্র সম্বলে দয়া, বিশ্বপ্রেম, মানবকল্যাণ শুদ্ধা-ভক্তি ও পবিত্রতার চরম পরাকাষ্ঠা স্বীয় জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন। এজন্যই তিনি লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ নরনারীর আদর্শ হইয়া তাঁহাদের ধর্মসম্প্রদায়ের প্রবর্তক ও সর্বপ্রধান নেতা হইতে পারিয়াছিলেন। অতএব আজ যদি কেহ জনসমাজে নেতৃত্বের অভিলাষী হইতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাঁহার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পবিত্র পদাঙ্ক অনুসরণে সর্বতোভাবে সংসারত্যাগী ও পরকল্যাণব্রতী হইতে হইবে।

সর্বত্যাগই মানবসমাজের নেতাদের চরিত্রের অলঙ্কার হওয়া উচিত। শুধু বাক্যবাগীশ হইলে জনসমাজের নেতা হওয়া যায় না। কোন ব্যক্তি নিঃস্বার্থ সর্বত্যাগী ও মানব-হিতব্রতী না হইয়া যদি শুধু অনর্গল বক্তৃতা দান কিম্বা রাশি রাশি গ্রন্থ রচনা করিয়া যান তাহা হইলে তাঁহার মানবসমাজের নেতা হইবার যোগ্যতা প্রমাণিত হয় না। আত্মোৎসর্গই মানবসমাজের নেতার মূলমন্ত্র হওয়া উচিত এবং প্রতি-মুহূর্তেই তাঁহাকে নিজের আত্মোৎসর্গের আন্তরিকতা প্রমাণ করিতে হইবে। আপনাদের মধ্যে যদি এমন কোন ব্যক্তি থাকেন যিনি স্বদেশের কল্যাণ ও উন্নতি সাধনের জন্য সর্বতোভাবে নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়াছেন তাহা হইলে এইরূপ মহৎ ব্যক্তির নেতৃত্বই আপনারা স্বীকার করিবেন। কারখানার পণ্যদ্রব্যের মতো দেশের নেতাকে উৎপন্ন করা

যায় না। প্রকৃতিগত গুণ ও অধিকার লইয়াই মানব-সমাজের নেতার অভ্যুদয় হয়। যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে ধর্মভাবাপন্ন নয় সে কখনও দেশ ও সমাজের নেতা হইতে পারে না। যখন কোন আধ্যাত্মিক শক্তিশালী নেতা জগতের সমক্ষে আসিয়া দাঁড়ান তখন তাঁহার বাক্যে ও কার্যে কোনও ভুল ভ্রান্তি দেখা যায় না। কারণ তাঁহার মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। ঈশ্বরের সর্বজ্ঞানময় অদৃশ্য হস্তই তাঁহাকে জীবনের পথ প্রদর্শন করে। তিনি ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করেন না, কিন্তু ভবিষ্যৎ তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করে এবং ইহাই তাঁহার মহত্ত্বের একমাত্র কারণ।

এমন কি যদি কোনও রাজনৈতিক নেতা স্বার্থসিদ্ধি ও নাম-যশের আকাঙ্ক্ষার স্রোতে ভাসিয়া যান তাহা হইলে তিনি কখনও নিজের আন্দোলনকার্যে সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন না। দেশ ও সমাজের প্রকৃত নেতার নৈতিক গুণরাশিসম্পন্ন হওয়া চাই। এমন কি তাঁহাকে নীতিশাস্ত্রের জীবন্ত মূর্তি হইতে হইবে, নতুবা তিনি নিজেকে ও দেশবাসীদের বিপথগামী করিয়া তাহাদের ধ্বংস আনয়ন করিবেন। এইজন্যই উপনিষদে আছে: "পৃথিবীতে অজ্ঞানসমাবৃত অনেক নেতৃত্বকামী ব্যক্তিই নিজেদের মহৎ ও জ্ঞানী বলিয়া মনে করে এবং এই ভ্রান্তবুদ্ধির বশে তাহারা শিষ্য ও ভক্ত সংগ্রহে তৎপর হয়। এই সমস্ত অযোগ্য ব্যক্তিরা নিজেরাই অজ্ঞানের দ্বারা অন্ধ। যে সমস্ত ব্যক্তি এই প্রকার অজ্ঞানীদের শিষ্য হয় তাহারা অন্ধের দ্বারা চালিত অন্ধের ন্যায় উভয়েই অজ্ঞানের গভীর গহ্বরে পতিত হইয়া

ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।[১] কারণ গুরুর যখন নিজেরই দিব্যজ্ঞান লাভ হয় নাই তখন সে কি করিয়া শিষ্যের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিবে? সুতরাং প্রকৃত নেতা নির্বাচন করিতে হইলে আমাদিগকে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। যিনি আপনার অন্তরের স্বাভাবিক প্রেরণার ফলে কোনও প্রতিদান না চাহিয়া দেশ ও জগতের হিতের জন্য কার্য করিয়া যান এমন ব্যক্তিকে আমাদের নেতারূপে পাইতে হইলে আমাদিগকে সেই অধিকারের যোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে। ইহার জন্য আমরা ধৈর্যশীল হইয়া অপেক্ষা করিব। সমাজ উপযুক্ত হইলে নিশ্চয়ই এই প্রকার আদর্শ নেতা লাভ করে, কারণ ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। কোন বস্তু লাভের উপযুক্ত হইলে শীঘ্র অথবা বিলম্বেই হউক লোকের তাহা পাইবার বাসনা পরিপূর্ণ হয়। সুতরাং ঐশ্বরিক শক্তিপ্রাপ্ত গুরু ও দেশনেতাকে লাভ করিবার উদ্দেশ্যে এখন আমাদের তাঁহার সুযোগ্য অনুগামী হইবার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করা কর্তব্য। তিনি আসিয়া আমাদিগকে প্রকৃত কল্যাণের পথে পরিচালিত করিবেন। তিনি আমাদিগকে যে মুক্তির অধিকারী করিবেন এবং তাহা শুধু দৈহিক, মানসিক ও

১। অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ, স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া, অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥
—কঠোপনিষৎ ১।২।৫

এ সম্বন্ধে যীশুখৃষ্টও বলিয়াছেন:

'Let them alone; they be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch.'
—St. Matthew, xv. 14

'Can the blind lead the blind? Shall they not both full into the ditch'?
—St. Luke, VI, 39

সামাজিক স্বাধীনতা মাত্রই নয়—তাহা পরিপূর্ণ অধ্যাত্ম মুক্তি। আর যে জাতির অধ্যাত্ম মুক্তি লাভ হয় তাহার রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসিতে বাধ্য। রাজনৈতিক স্বাধীনতা মানব-জীবনের গৌণ ব্যাপার। ইহাকেই সর্বোচ্চ আদর্শ মনে করা উচিত নয় এবং আমেরিকার মতো জড়বাদী বাণিজ্যবাদীর দেশেও সেখানকার লোকেরা এবিষয়ে সচেতন হইতেছেন। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে দলাদলি, মতবিরোধ, সংঘর্ষ ও ঈর্ষ্যা বর্তমান। ইংলণ্ডে যাইলে দেখা যায় সেখানকার রক্ষণশীল (Conservative) দলের রাজনৈতিক নেতাদের উদারনৈতিক (Liberal) দলের সহিত ঝগড়া লাগিয়াই আছে। আমেরিকাতেও আপনারা দেখিবেন সেখানে রিপাবলিক্যান (Republican) এবং ডিমোক্রেটিক (Democratic) দলের সঙ্গে সর্বদা বিবাদ-বিসম্বাদ বিরোধ ও মতভেদের সংঘর্ষ চলিয়াছে। ইহাদের একদল অপর দলকে স্থায় অথবা অন্যায় যে কোন কৌশলে পরাস্ত, হেয় ও অবনত করিতে চেষ্টা করিতেছে।

অতএব অধ্যাত্ম মুক্তিই আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হওয়া উচিত। এই আদর্শে উপনীত হইতে গেলে আমাদের কী করা কর্তব্য? এই আদর্শে উপনীত হইবার জন্য আমাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যযুক্ত পবিত্র জীবন যাপন করিতে হইবে। ত্যাগ, সংযম ও পবিত্রতার সহিত জীবনযাপনই আমাদের একান্ত কর্তব্য। অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হইব এবং আমরা আমাদের প্রতিবেশী ও দেশবাসী ভ্রাতাভগ্নীদের হিতের জন্য নিঃস্বার্থ জীবন যাপন করিব। আপনাদের সমাজের বহু নরনারী আজও অবনত ও অনুন্নত, তাহাদিগকে আপনারা

ঘৃণা করিবেন না। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া তাহারা ধনী ও উচ্চ জাতিদের নিকট নানাপ্রকার লাঞ্ছনা, অবজ্ঞা ও নির্যাতন ভোগ করিতেছে, তথাপি তাহারা আজও তাহাদের প্রাণশক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। সমাজে এতদিন ধরিয়া যে প্রাণশক্তি সংরক্ষি হইয়াছে কোনও শক্তিশালী নেতার অভ্যুদয় হইলে তাঁহার মধ্য দিয়াই এই সংরক্ষিত প্রাণশক্তির ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। হে কলিকাতাবাসী যুবকগণ, আমি তোমাদিগকে সংযত জীবনযাপনের জন্য অনুরোধ করিতেছি। যদি মাতৃভূমি এবং নিজেদের জাতিকে (nation) রক্ষা করিতে চাও তবে তোমরা নিজেদের সমস্ত শক্তিকে সংরক্ষিত ও সংযত কর, তোমরা সত্যপরায়ণ হও, চরিত্রকে নির্মল কর, তোমরা সংযত ও সুনীতিপরায়ণ হও। যদি তোমাদের কোনও দেশবাসী দুর্গতিগ্রস্ত হয় তবে তাহাকে উদ্ধারের জন্য তোমরা হস্ত প্রসারিত করিবে। ঐ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ কি শূদ্র, ধনী অথবা দরিদ্র সাহায্য দানের সময় এরূপ ভেদবুদ্ধি রাখিবে না। তোমরা হৃদয় উন্মুক্ত কর, সকলকেই ভ্রাতা ভগ্নী বলিয়া আলিঙ্গন কর, সকলকে সাহায্য কর, শিক্ষা দাও এবং সকলে যাহাতে দেশের সুযোগ্য অধিবাসী হইতে পারে তাহার জন্য সর্বোতোভাবে চেষ্টা কর, আর ইহাই তোমাদের সর্বপ্রথম কর্ত্তব্য হওয়া উচিত।

ব্রহ্মচর্য না থাকিলে মানুষের মধ্যে কোনও উন্নতশ্রেণীর শক্তি বিকাশ লাভ করিতে পারে না। ইহাই মহত্ত্বসাধনের প্রথম সোপান। তোমাদের মধ্যে যাহারা অবিবাহিত, পঁচিশ বৎসর বয়স না হওয়া পর্যন্ত তাহারা যেন না বিবাহ

করে। বাল্যবিবাহ কোন কোন বিষয়ে হিতকর হইলেও আবার ইহা অনেক বিষয়ে দেশের নানা অহিত করিয়াছে। অবশ্য আমি এখানে শ্রোতাদের বলিয়া রাখিতেছি যে, সমাজ সংস্কারকরূপে নয় পরন্তু একজন নিরপেক্ষ সমালোচকরূপে আমি আমাদের সমাজের দোষ গুণের উল্লেখ করিতেছি। সমাজের দোষগুণ, ভাল-মন্দ উভয়দিক আমি দেখাইয়া দিয়া তাহার পর আপনাদের সিদ্ধান্ত কি জানিবার জন্য আপনাদের নিকটে ঐ বিষয়কে আমি রাখিয়া দিব। বাল্যবিবাহ এক-সময়ে হিন্দুসমাজের কোন কোন বিষয়ে সুফল দান করিয়াছিল কিন্তু আবার অন্যদিকে ইহা সমস্ত হিন্দুজাতিকে একেবারে দুর্বল ও ক্ষীণকায় করিয়া ফেলিয়াছে। যদি আমাদের সমাজের নরনারী সুস্থ, সবল ও দীর্ঘায়ু সন্তান লাভ করিতে চায়, যদি তাহাদের অভিলাষ থাকে যে, তাহাদের সন্তানগণ মহৎ, সদ্‌গুণসম্পন্ন হইবে এবং শক্তিশালী ও সুস্থ দেহ লাভ করিবে, তাহা হইলে শরীর ও মনের পূর্ণ বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত কাহারও ছেলেমেয়েদের বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় আমি দেখিয়াছি সেখানকার শিশুগুলির দেহ সুন্দর সবল স্বাস্থ্যবান ও সুগঠিত। কিন্তু ভারতবর্ষে আমি দেখিতে পাই যে, এখানকার ছেলেরা আঠার কুড়ি বৎসর বয়সে সন্তানের পিতা হইয়া পড়ে এবং তাহাদের সন্তানদের দেখিলে মনে হয় ঐ শিশুগুলির দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ ও অপরিপুষ্ট এবং তাহারা স্বভাবতই ভীরু, অসহায় ও দুর্বল। এইরূপ ক্ষীণ ও অপরিপুষ্ট দেহযুক্ত দুর্বল সন্তানদের কাছে সমস্ত জাতি আর কী প্রত্যাশা করিতে পারে? সুতরাং হে যুবকগণ, তোমরা এ বিষয়ে সতর্ক হইবে। যদি তোমাদের

পিতামাতারা বিবাহ করিবার জন্য তোমাদের উপর জেদ করেন তবে তোমরা তাঁহাদিগকে স্পষ্ট বলিয়া দিবে যে, তোমাদের এখন বিবাহের উপযুক্ত বয়স আসে নাই। তাহার পর আমাদের দেশবাসীদের উচিত মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা এবং তাহাদিগকে শারীরিক ব্যায়ামচর্চা করা সম্বন্ধে অল্পবিস্তর শিক্ষা দেওয়া, কারণ জাতিগঠনের পক্ষে ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার। আমেরিকার ছেলে ও মেয়েদের স্কুলে প্রত্যহ দৈহিক ব্যায়ামের বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। সেখানে মেয়েরা অনেক বেশী বয়স পর্যন্ত বিদ্যাশিক্ষার চর্চায় রত থাকে। আমেরিকায় মেয়েদের দেহ সুগঠিত ও পরিপুষ্ট, তাহাদের বুদ্ধি প্রবল এবং নৈতিকতার দিক দিয়াও তাহারা উন্নত চরিত্র। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তাহারা নির্ভয়ে পুরুষদের সম্মুখীন হয় এবং প্রয়োজন হইলে এমনকি পুরুষদেরও পরাস্ত করিয়া অগ্রসর হয়। দৈহিক ব্যায়াম-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা প্রাথমিক শ্রেণীর প্রাণায়ামও অভ্যাস করে। ইহাতে তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছে। গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে ফুসফুসের প্রসারতা হয় এবং তাহাতে অনেক রোগও সারিয়া যায় ধর্মভূমি ভারতবর্ষের অধিবাসী হইয়া যোগসাধনার প্রতি আজ আমাদের অনুরাগ নাই, কিন্তু পাশ্চাত্য-বাসীরা অভারতীয় হইয়াও নিয়ত চিত্তের একাগ্রতা অভ্যাস করিতেছে। কারণ তাহারা এখন বুঝিতে পারিয়াছে যে, চিত্তের একাগ্রতাশক্তির ফলেই দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত উন্নতিই সম্ভব হইতে পারে। বহু প্রাচীন কাল হইতে এই যোগসাধনা ঋষিদের নিকট

হইতে আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছি। কিন্তু অত্যন্ত লজ্জার কথা যে তাঁহাদের বংশধর হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে আমাদের যোগসাধনার প্রতি আস্থা ও অনুরাগ নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় য়ুরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীরা কেমন আগ্রহ ও অভিনিবেশের সহিত যোগসাধনাকে এক্ষণে গ্রহণ করিতেছেন। সুতরাং আমার অনুরোধ, দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য আপনারা একটু হঠযোগ অর্থাৎ (যোগশাস্ত্র অনুযায়ী শারীরিক ব্যায়াম চর্চা) অভ্যাস করুন। অল্পাধিক পরিমাণ হঠযোগ অভ্যাসের ফলে আমাদের দেহের পেশীগুলি সবল এবং স্নায়ুগুলি সুদৃঢ় হইয়া উঠিবে এবং আমরা তাহাদের আয়ত্তে আনিতে সক্ষম হইব। যদি আমাদের পেশী এবং স্নায়ুগুলি সবল ও সুদৃঢ় হইয়া উঠে তাহা হইলে সাহস ও নির্ভীকতার সহিত আমরা যে কোন ব্যাপারের সম্মুখীন হইতে পারিব। কারণ সাহস ও নির্ভীকতা তাহাদেরই মধ্যে প্রকাশিত হয় যাহাতে পেশী ও স্নায়ুগুলি ইস্পাতের মতো সবল ও সুদৃঢ়। তাহার পর আমাদের উচিত অন্ততঃ সামান্যভাবেও চিত্তের একাগ্রতা অভ্যাস করা, কারণ আমাদের মনের গতি ও শক্তি যদি অসংখ্য দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে তাহা হইলে কী করিয়া আমরা আমাদের সমস্ত শক্তিকে সঞ্চিত ও সংরক্ষিত করিয়া তাহাকে নির্দিষ্ট কোন এক মহান্ উদ্দেশ্যসাধনে নিয়োজিত করিতে পারিব! চিত্তের একাগ্রতাই সমস্ত কার্যে সাফল্যের মূল। একাগ্রতা না থাকিলে চিত্রকর কোনক্রমেই একজন রূপদক্ষ শিল্পী হইতে পারে না। একাগ্রতা ও আধ্যাত্মিক সংস্কার না থাকিলে কোনও ভাস্কর কখনও তাহাদের

অবলম্বিত কার্যক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিভার বিকাশসাধন করিতে পারে না। এই একাগ্রতা সাধনই রাজযোগ-অভ্যাসের প্রথম সোপান। অতএব এই চিত্তসংযম অভ্যাস করা আপনাদের অতি অবশ্য কর্তব্য হওয়া উচিত। রুশ-জাপানের বিগত যুদ্ধে (১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী আরম্ভ হইয়াছিল) জাপানীরা কেমন করিয়া জয়লাভ করিল তাহার রহস্য কি আপনারা জানেন? রাশিয়ান সৈনিকেরা সুরাপানে অত্যন্ত আসক্ত বিলাসী ও আরামপ্রিয় হওয়ার জন্য বন্দুকের লক্ষ স্থির রাখিতে পারিত না। কিন্তু জাপানী সেনারা আহারা ও পানে সংযত ছিল। তাহারা সুরাপান করিত না এবং তাহাদের মন স্থির ও একাগ্র ছিল। সুতরাং স্বল্পসংখ্যক জাপানীরাই রাশিয়ানদের পরাস্ত করিয়া যুদ্ধে জয়ী হইয়া সমগ্র সভ্য জগৎকে বিস্মিত করিল ফেলিল। সেইজন্য আমাদের দেশের ছাত্র ও ছাত্রীদের আমি একাগ্রতা অভ্যাসের জন্য অনুরোধ করিতেছি। কারণ আমাদের ধর্মে পুরুষের সহিত নারীকেও সকল বিষয়ে সমান অধিকার দান করিয়াছে।[১]

সুযোগ ও অনুকূল ক্ষেত্রে পাইল বাংলার নারীরাও আশ্চার্যভাবে আপনাদের প্রতিভা ও শক্তিকে প্রকাশ করিতে পারেন। বহু শতবৎসর অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকার জন্য বাঙলাদেশের নারীজাতি নিজেদের প্রতিভা ও গুণরাশি বিকাশ করিবার কোনও সুযোগ পান

১। হিন্দুধর্মে পুরুষের সহিত নারীর সকল বিষয়ে সমান অধিকার দিবার বিধি ও তাহার সমর্থন সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত "হিন্দুনারী" গ্রন্থে বহু প্রামাণ্য উক্তি ও ঐতিহাসিক নিদর্শনের সহিত বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

নাই। সেইজন্য আজও তাঁহারা অনেক পিছনে পড়িয়া আছেন। যদি তাঁহাদের সুযোগ দেওয়া হয় তাহা হইলে তাঁহারাও নানা বিষয়ে পুরুষদের সহিত আপনাদের সমকক্ষতা প্রমাণ করিতে পারেন। তাঁহারা জীবনের অনেক ক্ষেত্রে মহাকার্যসাধন করিতে পারিবেন। আমাদের দেশেও অনেক নির্ভীক নারীযোদ্ধা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনারা নিশ্চয়ই ইতিহাস প্রসিদ্ধা চাঁদ সুলতানার কথা অবগত আছেন। সিপাহীবিপ্লবের সময়ে (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে) ঝাঁসীর নির্ভীক রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের বীরত্বর কথাও আপনারা অবশ্যই জানেন। এই মহীয়সী বরাঙ্গনা সিপাহীবিপ্লবের সময়ে নির্ভীক চিত্তে ইংরাজদের সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে অগ্রবর্তিনী হইয়া স্বাধীনতা প্রয়াসী ভারতীয় সৈন্যদলের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। ইংরাজ ঐতিহাসিক স্যার হিউরোজ (Sir Hugh Rodge) লিখিয়াছেন সিপাহীবিপ্লবের সময় ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও বীর সেনানায়ক ছিলেন ঝাঁসীর রাণী। ঝাঁসীর রাণীর আশ্চর্য বীরত্ব ও রণকৌশলে ইংরাজ ঐতিহাসিক তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া ভুল করিয়াছিলেন।[১]

কারণ রাণী লক্ষ্মীবাঈ সেনাপতির মতো সামরিক বেশে ঘোড়ায় চড়িয়া সৈন্যবাহিনীদের পরিচালনা করিতেন। আমাদের দেশে এইরূপ বহু সংগ্রামনিপুণা

১। এই প্রসঙ্গে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর দ্বারা সংগঠিত 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ'-এর অন্তর্গত লক্ষ্মীবাঈ রেজিমেণ্ট-এর অধিনায়িকা ক্যাপটেন লক্ষ্মী স্বামীনাথনের ও তাঁহার সহকর্মিণী ভারতীয়া বীরাঙ্গনাদের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই নারীবাহিনীর অন্যতমা সিপ্রা সেন, মায়া ভট্টাচার্য, মায়া গাঙ্গুলী প্রভৃতি বহু অল্পবয়স্কা বাঙালী মহিলা ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্ভীকতা ও নিপুণতার সহিত বর্মায় যুদ্ধ করিয়া বাঙলার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

বীরনারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অতএব অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা আমাদের বাঙলাদেশে নারীজাতিকে স্বাধীনতা ও সুযোগ দান করুন তাহা হইলে তাঁহারা আপনাদের সাহস, শক্তি ও শৌর্যের প্রমাণ করিবেন। আপনার জানিয়া রাখুন, সর্বশক্তিস্বরূপিণী যে জগজ্জননী কালীকে আমরা পূজা করি প্রত্যেক নারী সেই জগজ্জননীরই অংশসম্ভূতা।

আমেরিকাবাসীরা আধুনিক যুগে সর্বাপেক্ষা উন্নতিশীল জাতি। কারণ তাঁহারা শক্তিরূপিণী নারীজাতিকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন। আপনারা জানেন ছত্রপতি শিবাজী জগজ্জননী আদ্যাশক্তির উপাসনার দ্বারা অভ্যুদয় ও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আপনারা যদি ভোগলালসার দৃষ্টিতে কোন নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তাহা হইলে আপনারা মহাপাপের ভাগী হইবেন, কারণ আমাদের ধর্মের মতে এরূপ কার্য মহাপাপ। প্রত্যেক বিবাহিত ব্যাক্তি নিজের স্ত্রী ভিন্ন প্রত্যেক নারীকে মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা করিবেন —আমাদের ধর্মশাস্ত্রের ইহা একটি বিশেষ অনুশাসন। আমরা যদি আমাদের শাস্ত্রের এই নির্দেশ মানিয়া চলিতাম ও তাহা প্রতিপালন কারতাম তাহা হইলে আমেরিকানদের মতন আমরাও একটি বিশেষ উন্নতিশীল জাতি হইতে পারিতাম। অতএব প্রত্যেক নারীকেই আমরা জগজ্জননীর প্রতিনিধি ও মহাশক্তির জীবন্তমূর্তি বলিয়া সম্মান করিব। যদি আমরা উপলব্ধি করিতে পারি যে আমরা সকলেই সেই জগজ্জননীর সন্তান তাহা হইলে তাঁহার আশীর্বাদে আমাদের মধ্যে আশ্চর্য শক্তির লীলা দেখিতে পাইব। এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

আজ আমরা আমাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলিয়াছি, কারণ আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি। বন্দুক ও তরবারির দ্বারা অর্জিত রাজনৈতিক শক্তি কখনই আমাদের জাতির মুক্তি আনিতে পারিবে না। আপনাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি প্রকাশ করুন এবং তাহা হইলে আপনারা পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হইবেন। স্মরণাতীত বহু প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুরাই জগতের প্রথম ধর্মগুরুর জাতি হইবার দুর্ল্লভ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে এবং আবহমান কাল তাহারা সেই অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যাইবে। যে পুণ্যদেশে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শঙ্করাচার্য, শ্রীচৈতন্য, গুরু নানক ও শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি অলোকসামান্য ধর্ম্মগুরুর আবির্ভাব হইয়াছে সেই পবিত্রদেশ ভারতবর্ষের অধিবাসী হইয়া শ্বেতাঙ্গ মিশনারী নরনারীদের কাছে কিসের জন্য আমরা ধর্মশিক্ষা করিতে যাইব? যখন খৃষ্টানদের ধর্ম অপেক্ষা আমাদের ধর্মই শ্রেষ্ঠ, যখন তাহাদের ধর্মাদর্শ হইতে আমাদের ধর্মাদর্শ অধিকতর মহিমান্বিত তখন কিসের জন্য অবনতজানু হইয়া তাহাদের কাছে আমরা ধর্মশিক্ষা করিব? য়ুরোপ ও আমেরিকায় যদি আমার স্বদেশবাসীদিগকে যাইতেই হয় তাহা হইলে যেন অনুগ্রহপ্রার্থী ভিক্ষুকের হীন মনোবৃত্তি লইয়া তাঁহারা পাশ্চাত্য জাতিদের কাছে না যান। কিন্তু ধর্মগুরুর মহিমায় উদ্দীপ্ত হইয়া যেন ভারতবাসীরা পাশ্চাত্য দেশে গমন করেন। অন্য জাতিদের সমান পর্যায়ে উন্নীত না হইলে আমরা কিছুতে তাহাদের বন্ধুত্ব ও সম্মান লাভ করিতে পারিব না। আদানপ্রদানই বিশ্বপ্রকৃতির চিরন্তন নিয়ম। হিন্দুদের

কাছে শিক্ষা করিবার মতো কিছু আছে তাহা দেখিতে না পাইলে আমেরিকাবাসীরা কিছুতেই হিন্দুদের সম্মান করিবেন না। ইংরাজ জাতিকে শিক্ষা দিবার যোগ্য কোনও জ্ঞানের অধিকারী না হইলে তাঁহাদের নিকট হইতে শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভের প্রত্যাশা করা আপনাদের উচিত নয়। পাশ্চাত্য জাতিদের নিকট আপনাদের আত্মসংযম, পবিত্রতা, সত্যানুরাগ, চারিত্রিক পবিত্রতা, ব্রহ্মচর্য ও চিত্তের একাগ্রতাশক্তি প্রভৃতির পরাকাষ্ঠা প্রমাণ করিতে পারিলে তাঁহারা শিষ্যরূপে আপনাদের পদপ্রান্তে উপনীত হইয়া যীশুখৃষ্টের মতো আপনাকে ভক্তি করিবেন। আমাদের এই আদর্শ মহান্ ও দুঃসাধ্য, কিন্তু এই আদর্শকে ধরিয়া তাহার অনুযায়ী জীবন গঠন করিবার জন্য এখন হইতেই আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত। এই আদর্শকে সদাসর্বদা আমাদের চিত্তে জাগ্রত করিয়া রাখিতে হইবে, দেশবাসীদের কাছে ইহা প্রচার করিতে হইবে এবং ইহা অনুসরণ করিবার জন্য তাহাদিগকে বার বার আহ্বান করিতে হইবে।

পাশ্চাত্য জাতিদের কাছে আমাদের একটি বিশেষ শিক্ষনীয় বিষয় আছে। সেটি হইতেছে তাহাদের আজ্ঞানুবর্তিতার গুণ। আমাদের দেশের হাজার হাজার লোক হুকুম চালাইত চায়, কিন্তু একটিমাত্রও আদেশ পালন করিতে ইচ্ছুক ও সক্ষম এমন লোক আমাদের মধ্যে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। আজ্ঞাবাহী সৈনিকের কার্য অভিজ্ঞ ও নিপুন না হইলে কোন ব্যাক্তিই সেনাপতি হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না। ব্যক্তিবিশেষকে নয়, পরন্তু কোন উচ্চনীতি অথবা কোন সুমহান আদর্শকেই আমাদের মানিতে

হইবে, সুতরাং আপনারা কেহ কি কোন উচ্চনীতি অথবা আদর্শকে কার্যত মানিতে প্রস্তুত আছেন? যদি ভবিষ্যতে জনসমাজের নেতা হইবার অভিলাষ আপনাদের থাকে তাহা হইলে আপনারা আজ্ঞানুবর্তিতার গুণ অভ্যাস করিতে আরম্ভ করুন। পাশ্চাত্য জাতিদের মধ্যে এই আজ্ঞানুবর্তিতার গুণ সর্বাপেক্ষা অধিক। তাঁহারা নিজেদের জাতীয় আদর্শের প্রতি অতিশয় একনিষ্ঠ। আমাদের জাতীয় আদর্শ কী হওয়া উচিত তাহা আজও পর্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। কিন্তু আমাদের জাতীয় আদর্শকে নিশ্চয়ই নির্ণয় করিতে হইবে—পাশ্চাত্য জাতিদের অথবা তাহাদর সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষের হিংস্র মনোবৃত্তিকে পরিপোষণ না করিয়া এই আদর্শ আমাদিগকে নির্ণয় করিতে হইবে।

পাশ্চাত্য জাতিদের প্রতি আমাদের প্রেম, সহৃদয়তা ও স্বার্থত্যাগের ভাবই প্রদর্শন করা উচিত এবং মনে করিতে হইবে আমাদেরই মতো তাঁহারাও সেই একই বিশ্বপিতার সন্তান। বিভিন্ন জাতিরূপে আমরা পৃথিবীর মধ্যে সভ্যতার বিভিন্ন স্তর ও সোপানে অবস্থান করিতেছি। জাতিহিসাবে উহাদের এক প্রকার আদর্শ এবং আমাদের জাতীয় আদর্শ অন্য প্রকার। বাণিজ্যবাদই পাশ্চাত্য জাতিদের আদর্শকে গড়িয়াছে এবং সেই পথেই তাহাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ ও কার্যকৌশলকে পরিচালিত করিতেছে। এই বাণিজ্যবাদের আদর্শকে অনুসরণ করা আমাদের উচিত নয়—পরন্তু আধ্যাত্মিক আদর্শ আমাদের জীবনগতির পথ প্রদর্শন করিবে। কারণ ইহাই আমাদের

জাতির চরমলক্ষ্য। এই বাণিজ্যবাদকে জাতীয় আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিলে অচিরে আমরা এক বিলুপ্ত জাতিতে পরিণত হইব।

আজ্ঞানুবর্তিতা ও সহানুভূতির গুণ আমাদিগকে অতি অবশ্যই অভ্যাস করিতে হইবে। আমাদের সকলের চেষ্টাকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া আমাদিগবে মধ্যে ক্ষুদ্রাকারে বহু গণপরিষদ্ গঠন করিতে হইবে। এইভাবের গণপরিষদে আমরা কার্য করিবার ফলে সাধারণতন্ত্রমূলক (Democratic) দেশব্যাপী এক বিরাট গণপরিষদ্ গঠনপদ্ধতির প্রাথমিক বিষয়গুলি শিখিবার সুযোগ পাইব। আমেরিকা যুক্তরাজ্যে আমাদের (শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের) বেদান্ত প্রচারের কয়েকটি সঙ্ঘ আছে। আমেরিকার সাধারণতন্ত্রের শাসনপ্রণালীর মতো ইহারাও কার্যনির্বাহক পদ্ধতি গণতন্ত্রমূলক। প্রথমে আমাদিগকে এইপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণপরিষদ গড়িতে হইবে। তাহার পর ইহারই ফলে আমরা ক্রমশ এক সঙ্ঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত হইতে পারিব। সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি ভিন্ন কোন কালেই কোন মহাকার্য সম্পন্ন করা যায় নাই এবং ভবিষ্যতে কোন দিন তাহা করাও যাইবে না। বর্তমানে ভারতবাসী আমরা সঙ্ঘশক্তিহীন বিক্ষিপ্ত বিশৃঙ্খল জনসমষ্টি মাত্র। ভারতের এই কোটি কোটি বিক্ষিপ্ত নরনারীকে একতাবদ্ধ করা আজ একান্ত প্রয়োজন। আপনারা ভারতের এই জনশক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করুন, তাহা হইলে আপনারা দেখিবেন যে, উহাদিগের শক্তি কেহই রোধ করিতে পারিবে না। অতএব আসুন, পাশ্চাত্য জাতিদিগের নিকট হইতে আমরা জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া গড়িয়া তুলিবার শিক্ষা

লাভ করি। য়ুরোপ ও আমেরিকার জনসমাজ একটি বিরাট যন্ত্রের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে গঠিত। সেখানে প্রত্যেক নরনারী যন্ত্রের পৃথক পৃথক অংশের ন্যায় নিজ নিজ কাজ যথানিয়মে করিয়া যায়। সমাজের এই সমস্ত নরনারী সঙ্ঘবদ্ধ ও একত্রিত হইলে তাহা হইতে বিরাট শক্তির উদ্ভব হয় এবং তাহা সমগ্র জগৎকে বিচলিত করিয়া দিতে পারে।

য়ুরোপীয় সভ্যতার সহিত সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আমাদিগের যোগ সাধন করিয়া দিয়াছে বলিয়া ইংরাজ জাতির নিকট অন্ততঃ আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। বহুশতাব্দী ধরিয়া পৃথিবীর অন্য সমস্ত জাতিদের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকার জন্য আজ আমরা এমন অবনত অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি। কয়েক শতাব্দী পূর্বে (ব্রাহ্মণযুগে, ও খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীপর্যন্ত) আমাদের পূর্ব্বাপুরুষগণ নানা প্রকার অনুদার ও প্রগতিবিরোধী সামাজিক নিয়ম প্রবর্তিত ও প্রচলিত করিয়াছিলেন। তাহার ফলে আমরা বহুকাল জানিতে পারি নাই যে, পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে (পাশ্চাত্য জগতে) কী সমস্ত আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিতেছে। আমাদের এইসব অবিবেচক পূর্বাপুরুষদের এই ভুলের বিষময় ফল ফলিতেছে এবং আমরা এক্ষণে সেই ভুলের কুফল ভোগ করিতেছি। কিন্তু আমাদের এক্ষণে চেষ্টা করা উচিত যাহাতে এই সমস্ত ভুল (প্রগতিবিরোধী ও গোঁড়া সামাজিক নিয়মনীতি) অধিকদিন আর স্থায়ী না হয়। এখন হইতে আমাদিগকে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া দেশ ও দেশান্তরে যাওয়া আসা করিতে হইবে। বিভিন্ন জাতির সহিত মেলামেশা করিয়া তাহাদের সমস্ত গুণকে আমাদের নিজস্ব

করিয়া ফেলা চাই এবং তাহার পর সমাজে সেই সমস্ত গুণকে প্রচলিত করাইতে হইবে। আসুন, আমরা একতাবদ্ধ হই যাহাতে সমস্ত জাতি একটি অখণ্ড জাতির মতো এক মন হইয়া স্বাবলম্বী হইতে পারে। এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা করিয়া সেই শিক্ষাকে আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে ফুটাইয়া তোলা উচিত। এইরূপে কার্য করিলেই আমরা এক মহাশক্তিতে পরিণত হইতে পারিব।

ইংরাজী ভাষা এক্ষণে জগতের অধিকাংশ জাতির ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংরাজজাতির নিকট হইতে আমরা এই আন্তর্জাতিক ভাষা শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছি বলিয়া তাঁহাদের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। ইংরাজী জানা থাকিলে যে কোনও ব্যক্তি এশিয়া, য়ুরোপ ও আমেরিকার প্রত্যেক স্থানেই ভ্রমণ করিতে পারে। মাদ্রাজে যাইলে দেখিবেন ইংরাজী সেখানকার কথিত ভাষা হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমানে বাঙলা ভাষাকে নিখিল ভারতীয় কথিত ভাষারূপে প্রচলিত করিবার এক প্রস্তাব উঠিয়াছে। কিন্তু তাহা হওয়া অসম্ভব এবং এইরূপে চেষ্টা ছেলেমানুষী মাত্র। হিন্দী অবশ্য ভারতের অধিকাংশ স্থলে কথিত ভাষারূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে বিশেষতঃ মাদ্রাজে অধিকাংশ ব্যক্তিই হিন্দী জানেন না, সেখানকার অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ নিজেদের মাতৃভাষার ন্যায়ই সাধারণতঃ ইংরাজীতে কথাবার্তা কহিয়া থাকেন। দক্ষিন ভারতের লোকের চিন্তা ও মনোভাব জানাইতে হইলে আমাদিগকে ইংরাজী ভাষারই সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। সম্প্রতি কলম্বো হইতে কলিকাতা পরিভ্রমণ কালে আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে,

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী ও মহীশূর রাজ্যের সমস্ত প্রধান প্রধান সহরে শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা সাধারণত ইংরাজীতে কথাবার্তা বলেন। ইংরাজী ভাষার প্রকাশশক্তি আমার নিকট সহজ ও সাবলীল বলিয়া মনে হয় এবং এই ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত চিন্তা ও ভাবরাশি দাক্ষিণাত্যবাসীরা সহজে বুঝিতে পারেন। আর ইংরাজী ভাষা আমাদের দেশে প্রচলিত করিবার জন্য আমি ইংরাজদিগের নিকট নিজেকে ঋণী বলিয়া মনে করি। সকল সমাজে প্রচলিত এই ইংরাজী ভাষার অবলম্বনে আমরা আমাদের একতাবদ্ধ করিতে পারিব এবং আমাদের দেশের সমস্ত লোকই একই পতকার নিম্নে সমবেত হইবে বলিয়া এখন অন্তত আমি মনে করি।

শুধু বাক্যের আড়ম্বরে স্বদেশী আন্দোলনকে আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। আমাদের দেশীয় শ্রমশিল্পের (Industry) উন্নতি সাধন করিতে হইবে। বহুশতাব্দী ধরিয়া এই সমস্ত জাতীয় শিল্প উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া আছে। এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে শ্রমশিল্পের অবাধ উন্নতি না হইলে আমাদের জাতি সর্বোতভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ, পাস করিয়া কুড়ি কিংবা পঁচিশ টাকা মাহিনার কেরাণী হওয়াই আমাদের (বাঙালীদের) জীবনে এখন সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই আকাঙ্ক্ষা সত্য সত্যই কি মহাতী আকাঙ্ক্ষা! কেরাণী হওয়ার পরিবর্তে আমরা আমাদের শক্তিসামর্থ্যকে উন্নতি করিব না? কৃষি, বাণিজ্য শ্রমশিল্প ইত্যাদি নানা প্রকার বিভাগে নিযুক্ত থাকিয়া স্বদেশের আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধির দ্বারা

সুখী ও সমৃদ্ধিশালী জাতিতে পরিণত হওয়াই আমাদের উচিত। কৃষিকার্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যকে আমরা উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছিলাম বলিয়া আমরা বর্তমানে এরূপ দরিদ্র অবস্থায় পড়িয়া আছি। অবশ্য কোন কোন জেলায় বাণিজ্যের দরুন শুল্কনীতি (খাজনার হার) অত্যন্ত বেশী। কিন্তু আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধি করিবার উপায় জানা থাকিলে শুল্কের মাত্রা অত্যধিক হওয়া সত্ত্বেও জাতিহিসাবে আমরা সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারি। সুতরাং আমাদের শক্তিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রাখিয়া দিলে আর চলিবে না। এখনই ইহাকে কেন্দ্রীকৃত করিতে হইবে এবং সেই সমষ্টিবদ্ধ ও কেন্দ্রীকৃত শক্তিকে স্বদেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যেব উন্নতিসাধনে নিয়োজিত করিতে হইবে। কিছুদিন পূর্ব্বে নিউ ইয়র্কে সেন্ট লুইস একজিবিসন (St. Louis' Exhibition) হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় হিন্দুদের প্রবর্তিত ভারতীয় চিত্রকলা অথবা ভারতজাত কোন শিল্পদ্রব্যের দোকান (Stall) সেই প্রদর্শনীতে দেখিতে পাইলাম না! সেই প্রদর্শনীতে দেখিলাম একজন দেশীয় খৃষ্টান—সম্ভবতঃ সে মিশনারী—একটি ছোট দোকানমাত্র খুলিয়াছে। মিষ্টার বিমগারা (Mr. Bimgara) নামে একজন পার্শী ভদ্রলোক তাঁহার পুত্রের সহিত এই প্রদর্শনীতে এদেশজাত কয়েকটি সুন্দর শিল্পদ্রব্যপূর্ণ একটি দোকান খুলিয়াছিলেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি হিন্দুরা একতাবদ্ধ হইয়া দেশে বিদেশে নিজেদের দেশীয় শিল্পদ্রব্যের এইপ্রকার প্রদর্শনী করেন না কেন? তাঁহারা এইরূপ করিলে বিদেশীয়দের চিত্ত ভরতের প্রতি আকৃষ্ট হইবে এবং

তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন শিল্পজাত দ্রব্য-উৎপাদনে ভারতবাসীরা পশ্চাৎপদ নয়। মিষ্টার বিমগারা নিউ ইয়র্কে ভারতবর্ষজাত শিল্পদ্রব্যের একটি বৃহৎ দোকান খুলিয়াছেন। ভারত হইতে নানাবিধ পণ্যদ্রব্য লইয়া গিয়া সেখানে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেছেন। কিন্তু বাঙালী ব্যাবসায়ীরা এইরূপ চেষ্টা করেন না কেন? আমাদের দেশের বহুলক্ষ টাকার মালিকেরা এই ব্যাপারে দেশবাসীকে সাহায্য করেন না কেন। কিন্তু এখানে একটি কথা আমি বলিয়া রাখি যে পাশ্চাত্য জাতিদের সহিত বাণিজ্যব্যাপারে আমাদের দেশের লোকদের একান্তভাবে সৎপ্রকৃতি-সম্পন্ন (honest) হওয়া চাই। আমি যখন পি. য়্যাণ্ড ও কোম্পানীর (P & O Co.) কোন এক জাহাজে ভারতে আসিতেছিলাম তখন ঐ জাহাজের একজন ইংরাজ যাত্রী আমার কাছে বাণিজ্যব্যাপারে চীনাজাতির সততার প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন বাণিজ্য-ব্যাপারে চীনাজাতির সততাপরায়ণ এবং তাহারা নিজেদের কথা রক্ষা করিয়া চলে। 'সততাই কৃতকার্যলাভের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়' (honesty is the best policy) আর ইহাই চীনাজাতির ব্যবসাব্যাপারে মূলমন্ত্র। হিন্দু ব্যবসাদারেরাও যদি বাণিজ্যব্যাপারে এইরূপ সৎ হন তাহা হইলে তাঁহারাও সেখানে যাইবেন সেখানেই সম্মান ও সমাদর পাইবেন। সিংহলে আমি দেখিলাম সেখানকার চেট্টিরা (মাদ্রাজী ধনী বণিকদের সম্প্রদায়, 'চেট্টি' কথাটি 'শ্রেষ্ঠী' শব্দের অপভ্রংশ আকার) য়ুরোপীয়ান বণিকদের ও ব্যাঙ্কারদের (Bankers) বিশেষভাবে আস্থাভাজন ও সম্মানের পাত্র।

এই চেট্টিরা কোন খত (bond) না দিয়াও সেখাকার যে কোন ব্যাঙ্ক হইতে অনেক হাজার টাকা ধার লইতে পারে। তাহাদের মুখের কথাই লিখিত চুক্তি পত্রের ন্যায় মূল্যবান। তাঁহারা যাহা বলেন কাজেও তাহাই করেন। এইজন্য আবশ্যকমতো হাজার হাজার টাকা ধার পাইতে তাঁহাদিগকে কোনও মুস্কিলে পড়িতে হয় না। জাপানীরাও ব্যবসায়-ব্যাপারে এই প্রকার সততার নীতি অবলম্বন করে বলিয়া তাহাদের ব্যবসার সর্বদা উন্নতি হয়। অতএব হে ভারতের যুবক বন্ধুগণ, যদি জগতের অন্য সকল জাতির নিকট আমরা সম্মানিত হইতে ইচ্ছা করি তাহাহইলে সর্বপ্রথম সততা-পরায়ণ ও অধ্যবসায়শীল হওয়া আমাদের প্রধান কর্তব্য। এইভাবে নানাদেশের ধনী বণিকসম্প্রদায়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত ইহবার ফলে তাহাদের বাণিজ্যকৌশল শিখিয়া ও তাহা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া আমরা নানাভাবে আমাদের ব্যবসায় ও অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন করিতে পারিব। আজপর্যন্ত আমাদের দেশীয় কাপড়ের কলগুলির সমস্ত প্রয়োজনীয় তাঁত ও সুতা তৈয়ারীর কল (spinning machine) বিদেশ হইতে আমদানী করা হইতেছে। কিন্তু এদেশেই অথবা আমাদের নিজের চেষ্টায় ঐ সমস্ত যন্ত্রপাতি আমরা তৈয়ারী কবিব না কেন? সেই প্রচণ্ড কর্মশক্তি ও সেই সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা আমাদের মধ্যে কোথায় যাহার দ্বারা এই মহাকার্য সম্পন্ন করা যায়? আমাদিগকে আজ সর্বপ্রথমে একতাবদ্ধ হইতে হইবে। দেশের লোককে বিশ্বাস করিবার জন্য আমাদের উদার মনোভাব বিকাশের অভ্যাস করা উচিত। দেশবাসীদের

মধ্যে পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস স্থাপন ও বিশ্বাস রক্ষা করাই জাতীয় গৌরবলাভের একমাত্র রহস্য।

যদি আমরা নিজেদের উন্নতি করিতে চাই তবে আমাদের দেশবাসীদের ভালবাসিতে হইবে। ভালবাসা অর্থে একাত্মতা বা একপ্রাণতা বুঝায়। যেহেতু একজনের মুখের সহিত অন্য একজনের মুখের কোন সাদৃশ্য নাই সেইজন্য দেহের দিক হইতে এক হওয়ার সেরূপ কোন সম্ভাবনা হইতে পারে না। মানসিক রুচি প্রবৃত্তি অথবা বুদ্ধিশক্তির মাত্রা ও গতির দিক দিয়াও তাহা হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার স্তরে তাহা হওয়া একমাত্র হওয়া সম্ভব, কারণ স্বরূপতঃ আমরা সকলেই এক ও অভিন্ন। 'শুধু তোমার প্রতিবেশীদের নয়, সমস্ত জীবকেই তুমি নিজের মতোই ভালবাসিবে'—ইহাই আমাদের ধর্মের উপদেশ। কারণ পুরুষ ও নারী, জীব, জন্তু সকলের মধ্যে সেই এক পরমাত্মার বিকাশ। এইখানে সমস্ত মানবের একত্বের অধিষ্ঠান নিহিত, কারণ বেদশাস্ত্রের মতে আমরা সকলেই পরমানন্দের সন্তান।

'হে মানবগণ, তোমরা সকলে অমৃতের সন্তান': 'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'—বেদের এই মহাবাণীই যেন সর্বদা আমাদের শ্রবণপথে ঝঙ্কারিত হয়। যদি আমরা সকলেই সেই অমৃতের সন্তান হইয়া থাকি তাহা হইলে আমাদের সকলের স্বরূপ আত্মার মধ্যে জাতিভেত আজ কিসের জন্য থাকিবে? আত্মা সমস্ত জাতি ও সাম্প্রদায়িক ধর্মের অতীত। আত্মা শুদ্ধ সত্তাস্বরূপ। মেথর ও চণ্ডাল প্রভৃতি যে সব লোককে সামাজিক অবস্থার দিক হইতে অবনত করিয়া রাখা হইয়াছে

তাহাদের মধ্যেও পবিত্র অমৃতস্বরূপ পরমাত্মার অধিষ্ঠান। মেথর ও চণ্ডালেরাও আমদের মতো সেই পরমপিতা ঈশ্বরের সন্তান। অতএব আমরা তাহাদের সমান জ্ঞান করিব না কিম্বা তাহাদের সহায়তা দান করিব না কেন? তাহারা কি আমাদের ভাই নয়? এই সমস্ত চণ্ডাল ও মেথরদের যদি আমরা ভাই বলিয়া না ভালবাসি তাহ হইলে কি আমাদের সমদর্শী ঋষিদের প্রতি প্রকৃতপক্ষে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হইবে না? ইহাই কি আমাদের ধর্মশাস্ত্র বেদকে অবজ্ঞা করা হইবে না? বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গরু, হাতী, কুকুর চণ্ডাল প্রভৃতি সমস্ত জীবের মধ্যেই যিনি একই পরমাত্মাকে দেখিয়া থাকেন তিনিই পণ্ডিত (তত্ত্বজ্ঞানি) ও সমদশা।[১] ইহাই কি আমাদের ধর্ম শিক্ষা দেয় নাই? এই শিক্ষার ফলে আমাদের ধর্ম হইতেই আমাদের একতার শক্তি জাগ্রত হইবে এবং ইহাই আমাদের সমস্ত কর্মশক্তির উৎস সৃষ্টি করিবে। পাশ্চাত্য কোন বিশেষ দলের রাজনীতি কিছুকাল মাত্র স্থায়ী হয় এবং তাহারা সর্বদাই পরিবর্তনশীল। কিন্তু আমাদের রাজনীতির ভিত্তি শাশ্বত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইহাই চিরন্তন ঐক্যের নীতি। ইহাই আমাদিগকে সেই চরম গন্তব্যস্থলে লইয়া যাইবে; এই গন্তব্য ক্ষণস্থায়ী গন্তব্য নয়, ইহা চিরন্তন গন্তব্য, ইহা অসীম আনন্দের ধাম। আমরা সকলেই মনের সুখ ও শান্তি খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। কিন্তু জাগতিক ব্যাপারে এই সুখান্বেষণের ফলে বিরোধ

১। বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥
—গীতা ৫।১৮

বৈষম্য সংঘর্ষ হতাশা যুদ্ধবিগ্রহ এবং আরও অনেক উপসর্গ আনিয়া দেয়। প্রকৃত সুখ ও শান্তি লাভ আধ্যাত্মিক অনুভূতির পর নির্ভর করে এবং ইহা হইতে চরমে মোক্ষ অথবা মুক্তিলাভ হয়। এই মোক্ষলাভ আমাদের ধর্মের চরম-লক্ষ্য। মোক্ষলাভের জন্যই আমাদের দেশে ঋষি ও মুনিরা আপনাদের সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন, রাজা ও রাজপুত্রগণ সিংহাসন ও রাজসুখ বিসর্জন দিয়াছেন; সুতরাং এই মোক্ষ আমাদেরও আদর্শ হওয়া উচিত। হে প্রিয় যুবক বন্ধুগণ, তোমরা মনে রাখিও এই মুক্তি শুধু আধ্যাত্মিক ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ নয়, কিন্তু সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় মুক্তিলাভেও ইহা মানুষকে সমর্থ করে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

॥ বিংশ শতকের ধর্ম ॥

বিংশ শতক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, বিচার ও যুক্তিবাদের যুগ। এই যুগে বৈজ্ঞানিক সত্যের ভিত্তিতে ও যুক্তিশীলতার উপর যাহা প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত একমাত্র তাহাই আমাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করে। বিজ্ঞানই এখন আমাদের সমস্ত চিন্তা ও যুক্তির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। বিজ্ঞান-প্রদর্শিত নিয়মনীতির সহিত আমাদের দৈহিক ও মানসিক সমস্ত ব্যাপারে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলাই এখন আমাদের মনের গতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের জীবনের প্রতিদিনকার সমস্ত কর্মব্যাপারে আমরা এখন সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিক নিয়ম ও পদ্ধতিকে প্রয়োগ করিতে চাই। বিশ্ব-প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রন করিতেছে এমন বহু নিয়ম আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করিয়াছেন এবং সেই সব নিয়মের দ্বারাই আমরা আহার পান বেশভূষা ভ্রমণ এবং জীবনের অন্য সমস্ত কার্য পর্যবেক্ষণ ও নির্বাহ করিয়া থাকি। এখন আর আমরা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতবিরোধী কোন বিষয়কেই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নয়। বিজ্ঞান প্রতিদিন আমাদিগকে আমাদের পূর্বতন ধারণা ও সংস্কারগুলিকে এবং আমাদের গৃহনির্মাণ ও পুরাতন সমাজবিধির পরিবর্তে নিত্য নূতন সংস্কার ও রীতির পক্ষপাতী করিয়া তুলিতেছে।

বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সত্যকে অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অজানা রহস্যময় রাজ্যের দিকে

আমাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। বিজ্ঞানের আলোকে সাহায্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে কী বিরাট, বিশাল ও বিচিত্র তাহা আমরা ক্রমেই জানিতে পারিতেছি। বিজ্ঞানের দ্বারা আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনু পরামাণু হইতে সর্বাপেক্ষা বৃহদাকার পদার্থের মধ্যে কী আশ্চর্য সৌন্দর্য ও সর্বাঙ্গীন গঠননৈপুণ্য আছে তাহাও দেখিতে পাইতেছি। বিজ্ঞান আমাদিগকে প্রকৃতির অতল গভীর রহস্যের সন্ধান দিয়াছে। সত্যান্বেষী ব্যক্তিরা বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রতি পদক্ষেপে অভিব্যক্তিবাদের পথ অবলম্বন করিয়া মানবের দৃষ্টির অগোচর অণু-পরামাণুরাশির উপর ক্রীয়াশীল সমস্ত সুক্ষ্মশক্তির তথ্য অবগত হইতেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থ নানাপ্রকার উপাদানের সমবায়ে গঠিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাহায্যে আমরা এই সমস্ত উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণপদ্ধতির দ্বারা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি। এ্যাটম অথবা পরমাণু যে অবিভাজ্য মূল উপাদান নয় এই সত্য মানব সমাজে এতদিন জানা ছিল না। এক্ষণে বিজ্ঞানের আলোকে আমরা জানিতে পারিয়াছি এ্যাটম অথবা পরমাণু বিশ্বর আদি ও অবিভাজ্য মূল উপাদান নয়, এ্যাটমকেও বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া দেখান হইয়াছে যে, ইহা অপেক্ষা আরও সুক্ষ্মতর উপাদান আছে। প্রত্যেক এ্যাটমকে অসংখ্য ইলেকট্রন (electron) অর্থাৎ বিদ্যুতিন এবং প্রোটোনে (proton) বিভক্ত করিয়া দেখান হইয়াছে যে, ইহাদের সমবায়েই প্রত্যেকটি এ্যাটম গঠিত। এই ইলেকট্রনগুলির প্রত্যেকটি যেন ইথারের শক্তিকেন্দ্র (ethereal force-centre) এবং ঋণাত্মক (negative)

বৈদ্যুতিক শক্তিরই সমান ক্রিয়া ও গুণসম্পন্ন। অকর্ষণ ও বিকর্ষণের নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হইয়াই ইলেকট্রন-গুলি অণু বা য়্যাটম, মলিকিউল ও বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্গত নানাবিধ পদার্থের উপাদানরাশি সৃষ্টি করে।

আধুনিক যুগে আমাদের চিত্তাকাশ উদ্ভাসিত করিয়া জ্ঞানের নূতন আলোক প্রকাশ পাইতেছে। এই নূতন জ্ঞানালোকের সাহায্যে আজ আমাদের নিকট এমন সব নূতন নূতন ও আশ্চর্য বস্তু আবিষ্কার হইয়া পড়িতেছে যাহা গত শতাব্দীর বহু মনীষীরও অজ্ঞাত ছিল। সর্বব্যাপী এক শাশ্বতী মহাশক্তি (eternal cosmic energy) হইতে বিদ্যুৎ, উত্তাপ, আলোক, গতি, মাধ্যাকর্ষণ (gravitation) প্রভৃতি এই সমস্ত বিভিন্ন শক্তিগুলি সৃষ্টি হইয়া নানারূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে এবং ইহাই বিজ্ঞানের দ্বারা আধুনিক যুগে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

খৃষ্টানদের বাইবেল এবং আরও কোন কোন ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশ্বচরাচর এবং মনুষ্য ও অন্যান্য জীবজন্তুদের সৃষ্টি হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান এই সমস্ত অযৌক্তিক মতবাদ ও শিশুসুলভ বিশ্বাসকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে। পক্ষান্তরে বিজ্ঞান আমাদিগকে দেখাইয়াছে এই জগতের বর্তমান আকারে আসা হঠাৎ একদিনে ঘটিয়া উঠে নাই, ক্রমবিকাশের নিয়ম অনুসারে নানাবিধ পরিবর্তনের ভিতর দিয়া লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া জগৎ আজ তাহার বর্তমান আকারে পরিণত লাভ করিয়াছে। বাইবেলে বর্ণিত বিশ্বসৃষ্টির রূপকথা বিশেষ সৃষ্টির (special creation) মতবাদের উপর ভিত্তি করিয়া

আছে। অধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণা ও আবিষ্কার বাইবেলের বর্ণিত বিশ্বসৃষ্টির অলীক মতবাদ উচ্ছেদ করিয়া দিয়াছে।

বিংশ শতকে জ্যোতির্বিজ্ঞান এই দৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধে বহু বিস্ময়কর ব্যাপার ও বস্তুর সন্ধান দিয়াছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy) হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি পৃথিবী হইতে সূর্যের দূরত্ব নয়কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল। অধিকাংশ গ্রহই আমাদের নিকট হইতে এককোটি মাইলেরও উর্দ্ধে অবস্থিত এবং সমগ্র সৌরমণ্ডলের (solar system) ব্যাস (diameter) ছয়শত কোটি মাইল দীর্ঘ। এই দীর্ঘ দূরত্ব পার হইয়া আমাদের এই পৃথিবীতে সূর্যের আলোক আসিতে প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল গতি হইলে প্রায় আট মিনিট সময় লাগে। সূর্যমণ্ডলের বাহিরে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী গ্রহটি এতদূরে অবস্থিত যে তাহার আলোক আমাদের এই পৃথিবীতে আসিতে সাড়ে তিন বৎসর সময় লাগে আবার কোন কোন তারা পৃথিবী হইতে এত দূরে অবস্থিত যে, তাহাদের যে আলোক আজ আমরা দেখিতে পাইতেছি বহু সহস্র বৎসর পূর্বে সেই আলোক প্রথমে তাহাদের মণ্ডল হইতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল বোধ হয় তাহা যীশুখৃষ্টের জন্মের বহুবৎসর পূর্বে কিম্বা যে সময়ের মিশরের (Egypt) পিরামিড নির্মাণ করা হইয়াছিল কিম্বা বাবেলের আদিপুস্তকে (genesis) বর্ণিত বিশ্বসৃষ্টির মতবাদ উল্লিখিত সময়েরও বহুপূর্বে তাহা ঘটিয়া থাকিবে। বহুশতাব্দী পূর্বে যে তারকা হইতে আমাদের পৃথিবীতে আলো আসিয়া পৌঁছিয়াছিল উক্ত সময়ে হয়তো

সেই তারকা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতপক্ষে যে কত বিরাট ও বিশাল তাহা আপনারা চিন্তা করিয়া দেখুন। এই সমস্ত জ্যোতিষ্কের কখন্ প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল সেই বহুলক্ষ বৎসর সময়ের সহিত আপনারা শৈশবকালে যে সকল রূপকথার গল্প শুনিয়া বিশ্বসৃষ্টিসমন্ধে ভ্রান্ত ধারণা করিয়া বসিয়া আছেন তাহার সহিত বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের আলোকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কল্পনাতীত বিশালতা তুলনা করিয়া দেখুন। ভূতত্ত্বের নানাবিধ গবেষণায় (Geological researches) বর্তমানে প্রতিপন্ন হইয়াছে বাইবেলের শিক্ষা অনুযায়ী 'মাত্র ছয় হাজার বছর পূর্বে মানুষ প্রথম পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিল' তাহা আদৌ সত্য নয়। পরন্তু ভূতত্ত্ববিদ্‌দের গণনা অনুযায়ী বিভিন্ন যুগের অন্যতম মানব যুগে অর্থাৎ দশ লক্ষ বৎসর পূর্বে মানবজাতির সৃষ্টি হইয়াছে।

শরীরসংস্থানবিদ্যা ও শারীরবিজ্ঞানের (physiology) তুলনামূলক আলোচনার ফলে জানা গিয়াছে মানুষের সহিত অন্যান্য প্রাণীদের দৈহিক গঠনের বিশেষ সদৃশ্য আছে। বাইবেলের আদিপুস্তকে বর্ণিত বিশেষ সৃষ্টি (special-creation) অনুযায়ী মানুষ একদিনে উৎপন্ন হয় নাই। অতি নিম্নস্তরের জীব অভিব্যক্তিবাদের নিয়মানুযায়ী ক্রমিক উচ্চতর স্তরে উন্নত হইয়া অবশেষে মানবদেহ লাভ করিয়াছে। তাহা ছাড়া আধুনিক উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের গবেষণা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে শুধু মানুষ অথবা অন্য কোন জীবদেহে প্রাণ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে এমন নয়, গাছপালার মধ্যেও প্রাণশক্তি

আছে। এক্ষণে ইহাও আমরা জানিতে পারিয়াছি উদ্ভিদেরও চক্ষু এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় আছে এবং তাহা ছাড়া তাহাদের স্নায়ুরাশি থাকার জন্য নিঃশ্বাস লওয়া, হৃৎকম্পন ও সুখ-দুঃখ অনুভব হওয়া প্রভৃতি কার্য তাহাদের দেহে ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যর জগদীশচন্দ্র বসু প্রণীত *Response in the Living and Non-living* 'চেতন ও অচেতনার প্রাণস্পন্দ' নামক গ্রন্থ পড়িয়াছেন তাঁহাদের মনে থাকিতে পারে লৌহা টিন প্রভৃতি ধাতুর মধ্যেও জীবনীশক্তি আছে এবং কোনও প্রাণীর পেশী ও মাংসতন্তুর (tissue) ন্যায় লৌহা টিন প্রভৃতি ধাতুগুলিও বিদ্যুতের স্পর্শে তখনই সাড়া দিতে পারে। ডক্টর বসুর এই আবিষ্কার জড় ও চেতন পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের পূর্বতন ধারণাকে একেবারে পরিবর্তন করিয়া দিয়াছে। বহু প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে প্রাচীন আর্যঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন সমগ্রবিশ্বের প্রাণবস্তু মূলতঃ এক, অখণ্ড ও সর্বব্যাপী, কিন্তু বিভিন্ন জীব ও পদার্থের মধ্য দিয়া ইহা নানাভাবে প্রকাশিত হয়। স্যর জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কারে বেদের এই প্রাচীন সত্যই সভ্যজগতে প্রমাণিত ও দৃঢ়সমর্থন লাভ করিয়াছে।[১]

১। লণ্ডনে রয়্যাল সোসাইটিতে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মনীষীদের সম্মুখে আচার্য স্যর জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার নিজস্ব উদ্ভাবিত *High Magnification of Cresograph* নামক যন্ত্রের অবলম্বনে গাছপালার প্রাণস্পন্দন ও সুখ দুঃখ অনুভব করিবার ক্ষমতা আছে তাহা প্রমাণ করেন। তাহা ছাড়া এক টুকরা টিন লইয়াও তিনি ঐ সভায় প্রমাণ করেন প্রকৃতপক্ষে জড়পদার্থ বলিয়া কোন বস্তু নাই। প্রাণশক্তির বিকাশের তারতম্য অনুসারে বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থ চেতন ও জড় বলিয়া মনে হয়।

খৃষ্টানদের বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত আছে তাঁহাদের ঈশ্বর জিহোভা নিজের অলৌকিক শক্তির দ্বারা প্রথম মানব আদমের দেহে প্রাণশক্তি উৎপন্ন করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে আদম জীবন্ত মনুষ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন।[১] বাইবেলের অভিমত অনুসারে মনে হয় যেন মানুষ ছাড়া অন্য জীবেরা নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস লইতে পারে না অথবা তাহাদের প্রাণ নাই। আধুনিক যুগে প্রাণবিজ্ঞান (Biology) এই প্রকার যুক্তিহীন পুরাতন মতকে একেবারে বাতিল দিয়াছে। অপরপক্ষে প্রাণবিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণপঙ্ক, প্রাণবীজ ও জীবাণুরও (protoplasm, bioplasm and amoeba) প্রাণ আছে। শুধু তাহাই নয়, প্রাণ-জগতের সমস্ত পদার্থেরই প্রাণ আছে। যে পদার্থে প্রাণশক্তি সক্রিয় তাহাকে আমরা চেতন অথবা জীব বলি এবং যে পদার্থে প্রাণশক্তির ক্রিয়া অব্যক্ত অবস্থায় থাকে সেই পদার্থকে আমরা জড় বলিয়া মনে করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির সমস্ত প্রাণী ও পদার্থের এক অখণ্ড অসীম ও অবিভাজ্য প্রাণবস্তু অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে। আচার্য বসু রয়াল সোসাইটিতে তাঁহার আবিষ্কারের সত্যতা প্রতিপন্ন করার পর বক্তৃতার উপসংহারে বলিয়াছিলেন: "এই ভাবে বহুবৎসর ধরিয়া অক্লান্তভাবে গবেষণা ও আলোচনার ফলে আমি আবিষ্কার করিলাম যে এই দৃশ্যমান জগতের পশ্চাতে এক অসীম অখণ্ড প্রাণশক্তি শাশ্বত কাল ধরিয়া বিরাজিত এবং চেতন ও অচেতন যাবতীয় পদার্থকেই ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করিতেছে। নানাবিধ ও বিভিন্ন পদার্থের পশ্চাতে এই এক তত্ত্বই চিরকাল বর্তমান। বহুশতবৎসর পূর্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তপোবনে এই সত্যকে উপলব্ধি করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন: "সেই এক অনাদি সত্তা সমস্ত অনিত্য পদার্থের মধ্যে অন্তর্নিহিত সমুদয় চেতন পদার্থের চৈতন্যস্বরূপ। যাঁহারা আপনাদের মধ্যে এই তত্ত্বকে উপলব্ধি করেন তাহাদেরই শাশ্বতী শান্তি লাভ হয়।

১। "And the Lord God formed man of the dust of the ground and. breathed into his nostrils the breath of life ; and man became aliving soul."—*Genesis*, 117.

বিজ্ঞানের মতে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক অখণ্ড প্রাণশক্তি অনুস্যূত ও ওতঃপ্রোত আছে। সম্পূর্ণ অচেতন পদার্থ বলিয়া প্রকৃতপক্ষে কোন বস্তুরই সত্তা নাই। কোন অলৌকিক শক্তির ফলে মানবদেহে প্রাণশক্তি হঠাৎ উৎপন্ন হয় নাই, কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্গত স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে গাছ পালা জীব জন্তুর ন্যায় মানুষের মধ্যেও প্রাণশক্তি চিরকাল বর্তমান।

মনোবিজ্ঞানের তুলনামূলক আলোচনা ও বিচারের ফলে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, আমাদের ন্যায় অন্যান্য জীবজন্তুদেরও সুখদুঃখবোধের, ভালমন্দ বুঝিবার ও পূর্বেকার ঘটনা মনে রাখিবার এবং আরও অনেক মানসিক বৃত্তি আছে। প্রকৃতির কার্যব্যাপারে মানুষের ন্যায় অন্যান্য জীবজন্তুদেরও অস্তিত্বের প্রয়োজন আছে। বর্তমান যুগে আমরা শিক্ষা করিয়াছি জড়জীবদের ন্যায় মনেরও ক্রমিক অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। মনের গঠনসমন্ধে আলোচনা ও গবেষণার ফলে সম্প্রতি প্রতিপন্ন হইয়াছে মনের মধ্যে ঈথারনির্মিত (ethereal) সূক্ষ্মতম কণারাশির স্পন্দনের ফলে যাবতীয় মানসিক বৃত্তির উদ্রেক হয়। মানবমনের চিন্তাপ্রবাহের সহিত বাহ্যজগতে ক্রিয়াশীল জড় শক্তিপ্রবাহের ঘনিষ্ঠ ও পারস্পারিক সম্বন্ধ আছে। শারীর বিজ্ঞান ও অভিব্যক্তিবাদ এক্ষণে প্রমাণ করিয়াছে শক্তি চিরকাল একভাবেই থাকে ও তাহার ক্রিয়া বিভিন্ন আকারে হইলেও তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ বর্তমান এবং জগতে বিভিন্ন শক্তি যে নানাভাবে কার্য করিতেছে তাহারা এক অনাদি মূলশক্তির নানা আকারে

ও গতিতে প্রকাশ মাত্র। মনোবিজ্ঞানও প্রমাণ করিয়াছে মনের প্রত্যেক স্তরে নানাভাবে বিভিন্ন প্রকার শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া গেলেও তাহারা প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন নয় তাহাদের পশ্চাতে অচ্ছেদ্য ঐক্য সর্বদা বিদ্যমান।

একজনের মন হইতে অপরের চিন্তাপ্রবাহ সংক্রমণ (thought-transference) ও অপর ব্যক্তির মনের মধ্যে চিন্তা অবগত হওয়ার (mental telepathy বা পরবিত্তজ্ঞান) ফলে প্রমাণ হইয়াছে যে বিভিন্ন ও অসংখ্য ব্যষ্টি মনের (individual minds) মধ্যে একটি ঐক্যের সম্বন্ধ আছে। জগতের অসংখ্য মানব-মন যেন এক বিরাট বিশ্বমনের মধ্যে বিশাল সমুদ্রে উত্থিত অগণিত আবর্ত অথবা ঘূর্ণির ন্যায় বিরাজ করিতেছে। আমাদের প্রত্যেক চিন্তাই বহু দূরবর্তী অথবা সন্নিকটে অবস্থিত অপর ব্যক্তিদের মনকে স্পর্শ ও প্রভাবিত করে। স্থূল জগতের দিক দিয়া বহু হইলেও পরবর্তী মনোজগতেব ব্যাপারে সেই দূরত্বের ব্যবধান কোনরূপে প্রতিবন্ধক বা অন্তরায় হইতে পারে না।

বাহ্যজগতে আমরা দেখিতে পাই বেতারবার্তা (wireless telegraphy) আদানপ্রদানের যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে আমরা স্থানের দূরত্বকে অনায়াসেই অতিক্রম করিয়াছি এবং ইহা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে কারখানায় ডায়নামো প্রভৃতি যন্ত্রাদির সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তি অপেক্ষা সমগ্র বায়ুমণ্ডলে পরিব্যপ্ত বৈদ্যুতিক শক্তি কত বেশী শক্তিশালী। সেইভাবে বহুশত ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত দুইব্যক্তির মধ্যে চিন্তাবিনিময় (thought-transference) করার এবং দূর অথবা নিকটের কোনও ব্যক্তির

অব্যক্ত মনেভাব অবগত হওয়ার (telepathy) কার্যে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে পাশাপাশি দুইজন লোকের কথাবার্তা ও ভাব-বিনিময়ের জন্য যে পরিমাণ শক্তি প্রকাশিত হয় পূর্বোক্তভাবে আলাপ-আলোচনা ও ভাব-বিনিময়ের ব্যাপারে তাহা অপেক্ষাও কত অধিক গুণে কী বিরাট শক্তি নিহিত। যদি আমরা আমাদের ব্যষ্টি মনকে অসীম বিশ্ব-মনের সমান স্তরে উন্নীত করিয়া তাহার সহিত আমাদের মানসিক শক্তির ঐক্য ও সমত্ব উপলব্ধি করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের মধ্য হইতে অনন্ত শক্তি অসীম কর্ম-সম্পাদনার স্ফুরণ হইবে।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সহিত ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নিয়োজিত মনোবিজ্ঞান (Applied psychology) অধ্যয়নের ফলে আমাদের জীবনদৃষ্টি এক্ষণে পূর্বতন শতাব্দী অপেক্ষা এত অধিক দূরে প্রসারিত হইয়াছে যে যেখানে আমরা কোন কিছুতে জীবনের অভিব্যক্তি দেখিতে পাই সেখানেই তাহার সহিত মনের কোন না কোন প্রকার বৃত্তি কার্য করিতেছে ইহা নির্ণয় করিতে পারি। যে উচ্চতর নিয়মনীতি ও সূক্ষ্মতর শক্তির গতি বিশ্বজগৎকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে তাহাদিগকে আবিষ্কার করায় এবং আধুনিক বিজ্ঞানের নানারূপ আশ্চর্য যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত হওয়ার ফলে আমাদের এই ধারণা হইয়াছে যে, মানবের ইচ্ছাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি সেই সর্বব্যাপী পরমেশ্বরের অনন্ত জ্ঞান ও অসীম ইচ্ছাশক্তিরই অস্ফুট প্রকাশ মাত্র।

মন ও জড় পরমাণু ইহারা উভয়ে দুইটি স্বতন্ত্র বস্তু—ইহাই ছিল বহুপূর্ব কাল হইতে প্রচলিত মানবসমাজর

ধারণা। এক্ষণে বৈজ্ঞানিকদের প্রমাণিত একত্ববাদ (monism) বর্তমান যুগে ঐ পূর্বপ্রচলিত দ্বৈতমতবাদকে (dualistic theory) খণ্ডন করিয়া দিয়াছে। এক্ষণে আমরা জানি যে মন ও জড়পরমাণু একই অবিকারী অবিনশী মূল সত্তার দুই বিভিন্ন প্রকাশ।[1] এই আনন্দ অবিকারী মূলসত্তাকে আধুনিক বিজ্ঞানে 'অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় তত্ত্ব' (Unknown and Unknowable) বলিয়া অভিহিত করা হয়। মনীষী হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) বলিয়াছেন: "জড় পরমাণু, শক্তির গতি (motion) ও শক্তিবেগে (force) প্রকৃতপক্ষে জগতের মূল সত্তা নয়, ইহারা প্রত্যেকেই সেই চরম-মূলসত্তারই এক একটি বাহ্য প্রতীক মাত্র"।[2] স্পেন্সার তাঁহার psychology (মনো-বিজ্ঞান) সম্বন্ধীয় গ্রন্থেও লিখিয়াছেন: "এই মূলসত্তাই মনোজগতে ও বহির্জগতে দুই বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে"।[3] বহির্জগতে এই মূলসত্তা জড় পরমাণুরূপে (matter) প্রকাশিত হয় এবং ইহার প্রকাশ অন্তর্জগতে মন (mind) রূপে দেখা যায়। বৈদ্যুতিক শক্তি, মাধ্যাকর্ষণ, উত্তাপ, গতি প্রভৃতি রূপে জড়জগতে যে সমস্ত শক্তি কার্য করিতেছে তাহারাই আবার মনোজগতে বুদ্ধিবৃত্তি, অনুভব-শক্তি, ভাবাবেগ, ইচ্ছাশক্তি ইত্যাদি রূপে প্রকাশিত ও

১। এবিষয়ে স্বামী অভেদানন্দ *Self-knowledge* (আত্মজ্ঞান) পুস্তকের Spirit and Matter (জীব ও জড়) অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

২। "Matter, motion and force are not the reality, but the symbols of reality." —Herbert Spencer

৩। "The same reality is manifested objectively and subjectively." —Ibid.

ক্রিয়াশীল আছে। বিশ্বজগতের মূলতত্ত্ব এক কিন্তু ইহার প্রকাশ বিচিত্র, বিভিন্ন ও বহুমুখী। সেইজন্য আধুনিক বিজ্ঞান একত্ববাদের সিদ্ধান্ত করিয়াছে নামরূপযুক্ত বহুত্বের পশ্চাতে এক অখণ্ড ঐক্যতত্ত্ব আছে। এই একত্ব-বাদের বৈজ্ঞানিক সত্য প্রমাণ হওয়ার ফলে আমরা জানিতে পারি যে বিশ্বসৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্তকারণ মূলতঃ একই অনাদি অনন্ত অবিকারী সর্বব্যাপী সত্তা। এই মূল অনাদি সত্তাই যাবতীয় মানসিক ও জড়শক্তির শাশ্বত উৎস।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন স্বর্গে অবস্থিত কোন এক পুরুষ (extra-cosmic Being) শূন্য হইতে এই জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন বিজ্ঞানের কোন ছাত্রই আধুনিক যুগে ইহা বিশ্বাস করিতে পারে না। অসত্তা বা শূন্য হইতে বিশ্বসৃষ্টির এই কুলংস্কারপূর্ণ প্রাচীন মতবাদ আধুনিক বিজ্ঞান অলীক বিশ্বাস বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে। কারণ বিজ্ঞান এসম্বন্ধে বহুবার প্রমাণ করিয়ছে যে জড়পরমাণু প্রভৃতি ন্যায় প্রাণবীজকেও কেহ সৃষ্টি করিতে পারে না, ইহা সম্পূর্ণরূপে উৎপত্তিহীন অসৃষ্ট বস্তু এবং ইহার ধ্বংস নাই। কার্য-কারণের নিয়মানুযায়ী ইহা সূক্ষ্ম ও অব্যক্ত অবস্থা হইতে স্থূলবহির্জগতে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হয়। এই প্রাণবীজের মধ্যে অসীমশক্তি ও কার্যকারিতা অব্যক্ত হইয়া আছে। পিতামাতা হইতে এই সন্তানের প্রাণের সৃষ্টি হয় না। সাধারণতঃ আমাদের বিশ্বাস পিতামাতা হইতেই সন্তানের আত্মা জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়, পিতামাতা শুধু সন্তানের দেহের উৎপত্তির

প্রধান অবলম্বন বা পথ (channel) মাত্র। পিতামাতার দেহ অবলম্বন করিয়াই জীবাত্মা নূতন দেহ সৃষ্টি করে ও তাহার মধ্যে আপনার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তিকে প্রকাশ করিয়া জীবজগতে আবার ব্যক্ত হয়। বিশ্বজগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কোনও এক পুরুষ 'শিশুদের জন্মকালে আসিয়া তাহাদের দেহে প্রাণের বীজকে সৃষ্টি করেন' এইরূপ প্রাচীন বিশ্বাসের ভিত্তিকে বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক সত্য ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে। অধিকন্তু প্রাণশক্তি অবিনাশি ইহা প্রমাণ হওয়ায় জন্ম ও মৃত্যুর বিষয়ে সমস্ত সমস্যা এবং পূর্বজন্ম ও পরজন্মের সত্যতা সম্বন্ধে মীমাংসা হইয়াছে। এই জন্মই মানুষের প্রথম জন্ম নয়। আমাদের বর্তমান দেহে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বেও আমরা বহুবার মানবজন্ম লাভ করিয়াছিলাম এবং আমাদের এই দেহ ধ্বংস হইয়া গেলেও আমরা আরও বহুবার দেহ ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিব।

বর্তমান যুগে আমরা জানিতে পারি যে আমরা কখনই মরিয়া যাইতে পারি না অথবা আমাদের সত্তা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে না। কিন্তু যতক্ষণ আমাদের প্রাণবীজ থাকিবে ততক্ষণ নূতন নূতন দেহে তাহা বারবার প্রকাশিত হইবে। এই সিদ্ধান্ত হইতে মানবের পুনরায় জন্মগ্রহণ অথবা পুনর্জন্মবাদের সত্যতা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয়।[১]

১। পুনর্জন্মবাদ ও মানবাত্মার পূর্বজন্ম সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ Reincarnation ও Life Beyond Death পুস্তকে বিশেষভাবে আলোচনার দ্বারা ইহাদের সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই দুইটি পুস্তকে খৃষ্টান, মুসলমান ও ইহুদের অবলম্বিত একজন্মবাদের প্রচলিত মতকে যুক্তিকৌশলে ও ঐতিহাসিক প্রমাণের দ্বারা খণ্ডন করিয়া স্বামিজী মহারাজ হিন্দুদের পুনর্জন্মবাদের সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

কার্য-কারণের নিয়মানুযায়ী মানুষের স্বাধীনভাবে কর্ম ও তাহার শুভাশুভ ফল ভোগ করিবার অধিকার আছে। পুনর্জন্মবাদের ইহাও অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয়। নিজের অনুষ্ঠিত কর্মরাশি দ্বারাই মানুষ তাহার ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করে। এই অনুষ্ঠিত কর্মরাশি অনুযায়ী পরলোকে তাহার উচ্চ অথবা নীচ গতি হয়। ইহারই ফলে মানুষ উচ্চ হইতে উচ্চস্তরে অভিব্যক্তি লাভ করিয়া চরমগতিরূপ মুক্তিলাভ করে। মানুষ স্বরূপতঃ অবিনাশী। এই দেহ ধ্বংস হইয়া গেলেও তাহার আত্মা স্থূল অথবা সূক্ষ্মদেহে কোন না কোন লোকে অবস্থান করে। এই ধারণাই আমাদের ভারতের বরেণ্য সত্যদ্রষ্টা দার্শনিকদিগের প্রতিপন্ন দার্শনিক মতবাদকে বুঝিতে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে। আত্মা স্বভাবত অবিনাশী ও অক্ষয় এবং ইহাই ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত দার্শনিকদের সিদ্ধান্ত ও বিচার্য বিষয়। আধুনিক বিজ্ঞান যাহাকে প্রাণবীজ বলিয়া নির্দেশ করে হিন্দু দার্শনিকগণ তাহাকেই আত্মা বলেন।

এইরূপে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে আলোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বের প্রতিষ্ঠা করাই বিশ্বপ্রকৃতির চিরলক্ষ্য। এক অনাদি অনন্ত মূলসত্তাই বিশ্বসৃষ্টির নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। জীবগণের প্রাণজীব কখনও কোন কালে কাহারও দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই। তাহারা স্বতন্ত্রভাবে শাশ্বতকাল বর্তমান।

এক্ষণে এই ব্যাপারগুলি লইয়া একেশ্বরবাদী ধর্মতত্ত্বগুলির সহিত বিজ্ঞানের বিরোধ লাগিয়া আছে। প্রাচীনকালে ধর্মই বিজ্ঞানের স্থান লইয়া জগতের যাবতীয় ব্যাপার

এবং তাহাদের কারণগুলি নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিত। জগতের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের গোঁড়া প্রচারকরা ও আচার্যেরা এতদিন যে সমস্ত ভ্রান্তি ও অজ্ঞানতার পরিচয় দিত আধুনিক বিজ্ঞান তাহার নিত্য নূতন আবিষ্কারের দ্বারা সেই ভুলগুলি দেখাইয়া দিয়াছে। ইহার ফলে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের চিন্তাধারা অগ্রগতির বহু পশ্চাতে তথাকথিত ধর্ম্মযাজক, প্রচারক ও আচার্যেরা পড়িয়া আছে।

সাম্প্রদায়িক ধর্মমত ও বিজ্ঞানের এই বিরোধ বিগত শতক হইতে চরমে উঠিয়াছে এবং সেই বিরোধ এখনও শেষ হয় নাই। ইহার ফলে সাম্প্রদায়িক ধর্মগুলির মতবাদের ভিত্তি নড়িয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত ধর্মমত ও বিজ্ঞানের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য আনিবার অনেক চেষ্টা হইয়াছে বটে কিন্তু তাহার কোন চেষ্টাই সফল হয় নাই। এই সকল সাম্প্রদায়িক মতগুলি এখন বিজ্ঞানের সহিত সমানভাবে পা ফেলিয়া চলিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে যে সমস্ত অভিমত ও জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত এবং যেগুলি বিজ্ঞানের বিরোধী সেগুলি এখন তাহারা এক্ষণে বাতিল করিতে বাধ্য।

বেশী দিনের কথা নয়, ওয়েষ্টমিনিষ্টার য়্যাবের ডীন্ (Dean of Westminester Abbey) তাঁহার কোনও এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে সমস্ত ব্যাপার আমাদের পূর্বতন ধর্মযাজকদের দ্বারা নির্বিচারে গৃহীত হইত এখন আর সেগুলির পূর্বেকার মতো অবিকল গ্রহণ করা যায় না।

বাইবেলের প্রথম গ্রন্থে (Genesis) লিখিত আছে এই জগৎ মাত্র ছয় দিনে সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু এই উক্তি এখন আর আমাদিগের নিকট পূর্বপ্রচলিত অর্থে গৃহীত হয় না। জেনেসিসের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে ঈশ্বর কাদার তাল লইয়া একটি মনুষ্যমূর্তি গড়িয়া তাহার নাকে ফুঁ দিতেই সে জীবন্ত হইয়া উঠিল এবং তাহার একটি পাঁজর লইয়া তিনি প্রথমজাতা নারী (ইভের) সৃষ্টি করিলেন। আগেকার অর্থে ইহাকে এখন আর ব্যাখ্যা করা চলে না। তাহা ছাড়া বাইবেলে লেখা আছে সাপ ও গাধা কথা কহিতেছে। কিন্তু এ সমস্ত গল্পকাহিনীকে আর এখন ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। মনে হয় রূপকথার আবরণে এগুলি ধর্মোপদেশ মাত্র।

অনেক লোক এখনও বিশ্বাস করিয়া থাকে যে তাহাদের ধর্মশাস্ত্র স্বয়ং ঈশ্বর হইতেই বিকশিত বা নিঃসৃত (revealed) হইয়াছে এবং সেইজন্য তাহা সম্পূর্ণরূপে ভ্রম ও প্রমাদহীন। এই সমস্ত লোকের মানসিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। জনসমাজের দৃষ্টি এখন বৈজ্ঞানিক সত্য নির্ণয়ের দিকে ধাবিত হইয়াছে এবং জগৎ এখনও চায় ধর্ম ও বিজ্ঞানের সহিত একটি সামঞ্জস্য স্থাপিত হউক।

এইরূপে মানব-মনে ক্রমশই সত্যলাভের আকাঙ্ক্ষা বলবতী হওয়ায় য়ুরোপ ও আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি-সম্পন্ন লোকের সংখ্যা ক্রমশই অধিক হইয়া উঠিল এবং তাঁহারা অতিপ্রাকৃতি অলৌকিক বলিয়া অজ্ঞ জনসাধারণের সমর্থিত বাইবেল বর্ণিত সমস্ত অলীক ব্যাপারের বিরুদ্ধে তাহারা দণ্ডায়মান হইয়া সেগুলির যুক্তিহীনতা ও ভুল দেখাইতে

লাগিলেন। এই অবস্থায় উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন ধর্মযাজকগণ ধর্ম ও বিজ্ঞানের সহিত প্রকাশ্যভাবে বাদানুবাদ পরিত্যাগ করিয়া ঐতিহাসিক ঘটনার রক্ষা-প্রাচীরের পশ্চাতে নিজেদের গোঁড়ামী ও অন্ধবিশ্বাসগুলিকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা শুধু সাম্প্রদায়িক বিশ্বাসকে ভিত্তি করিয়া নিজেদের মতামতকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কারণ তাঁহাদের মতে বিশ্বাস সর্ববিধ সমালোচনার অতীত বস্তু। কিন্তু বাইবেলের প্রাচীন ও নবীন দুই পুস্তক (Old Testament and New Testament) সম্বন্ধে প্রশ্নতাত্ত্বিক গবেষণা পরীক্ষামূলক বিচারের (Higer Criticiam) ফলে বর্তমান যুগের জনসমাজের মনে জ্ঞানের নূতন আলোক দেখা দিয়াছে। তাহাতে বাইবেলের ভিন্ন ভিন্ন অংশ কবে কোথায় ও কাহাদের দ্বারা রচিত হইয়াছিল সে সমস্ত ঐতিহাসিক তত্ত্ব ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছে। তুলনামূলক পরীক্ষার দৃষ্টিতে আমরা যদি বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রগুলি অধ্যয়ন করি তাহা হইলে দেখিতে পাই যে একটির ন্যায় অপর ধর্মসম্প্রদায়ের শাস্ত্রগ্রন্থগুলিও প্রায় সমান বিশ্বাসই পোষণ করিতেছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই বলে তাহাদের ধর্মশাস্ত্র সাক্ষাৎ ঈশ্বর হইতে আগত। আবার অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও নিজেদের শাস্ত্রের ঐশ্বরিক সূত্র হইতে সৃষ্টির জন্য একই প্রকার যুক্তি ও প্রমাণ দেখায়। কোন একটি ধর্মশাস্ত্রকে ঈশ্বরের নিজের বাণী বলিয়া স্বীকার করিলে অপর শাস্ত্রগুলিকেও আমাদিগকে ঠিক সেইভাবেই স্বীকার করিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা এগুলি খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতকের রূপকথা

পৌরাণিক কাহিনীতে পরিণত হইয়াছিল। ইহুদিজাতির বিশিষ্ট ধর্মনেতা ও পূর্বপুরুষ এব্রাহামের (Abraham) সম্বন্ধে এই সুবিদ্বান অধ্যাপক বলিয়াছেন ঃ "যাভের (Yahaeh) আদেশে সুদূর প্রাচ্য হইতে আনীত ও ক্যানান (Canan) দেশকে অধিকার করিবার জন্য নির্দিষ্ট প্রাগৈতিহাসিক ইজরেল (Isarel) জাতিদের স্বভাব ও রীতিপ্রকৃতির বিশিষ্ট প্রতীকের ন্যায় বলিয়া এব্রাহামকে মনে হয়"। তাহা ছাড়া অধ্যাপক বেকন আরও বলিয়াছেন ঃ "নিউ টেষ্টামেণ্টে বর্ণিত এব্রাহাম আদৌ কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন, যদি তাঁহার অস্তিত্ব সত্য হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে তিনি যাভের (Yahaeh) আদর্শ অনুযায়ী তাঁহার মনোনীত উত্তরাধিকারী। আসল এব্রাহাম একটি কল্পিত আদর্শ মাত্র এবং ইঁহার বাসভূমি ইহুদি প্রবক্তা ও প্রেরিত পুরুষদের মনের মধ্যে"। বাইবেলবর্ণিত মহাপ্রলয়ের বিশ্বপ্লাবী বন্যা (Deluge) এবং ইজরেলদের প্রথম প্রবক্তা নোয়ার (Noah) নানা জীবদের উদ্ধারকারী বিরাট নৌকা (Noah's Ark) প্রভৃতির কথা অধ্যাপক হাক্সলি (Prof.-Huxley) ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু বৈজ্ঞানিক মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

মানবজাতীর উৎপত্তিসম্বন্ধে ঠিক এই একই প্রকার যাইতে পারে যেমন বাইবেলকে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ উক্তিরাশি বলিয়া মানিলে বেদ, কোরাণ এবং জেন্দাবেস্তকেও ঠিক সেইরূপ ঐশ্বরিক বাণীসম্ভার বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাহা ছাড়া সমস্ত ধর্মকে পাশাপাশি রাখিয়া তুলনামূলক দৃষ্টিতে আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে কোন

ঈশ্বরাগত নয়, ববং প্রত্যেকটি ধর্মই মানব-মনের সত্যকে জানিবার ও বিশ্বরহস্যকে বুঝিবার প্রচেষ্টা হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে।

দেশ বিদেশের বিভিন্ন পুরাণগুলি পরস্পর তুলনা করিয়া অধ্যায়নের পর দেখা যায় খৃষ্টানদের পৌরাণিক গ্রন্থগুলি অন্যান্য অখৃষ্টান ধর্মের পুরাণগুলির সহিত সমান প্রকৃতি-বিশিষ্ট। ইহাদের বহু কাহিনীর মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত পৌরাণিক গ্রন্থগুলিতে অনেক উপকথা আছে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি প্রাকৃতিক শক্তিসকলের উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কতকগুলি রূপকের পরিণতি, কতকগুলি আদিম কুসংস্কারের ধ্বংসাবশেষ। আবার আরও কতকগুলি কাহিনী মহাপুরুষদের ও সিদ্ধ যোগিগণের প্রকৃত জীবনের ঘটনাবলীর অতিরঞ্জিত বর্ণনামাত্র।

ইয়েল ইউনিভর্সিটির বিখ্যাত অধ্যাপক বেকন (Professor Bacon of the Yale University) বলিয়াছেন : "বাইবেলের প্রথম পুস্তক জেনোসিসে (Genesis) বর্ণিত বহু উক্তিই প্রবক্তাদের বাণীর সহিত সমান প্রকৃতির। বহুশ্রেণীর জীবকে ঈশ্বরের আদেশ ও শক্তির বলে রক্ষা করিয়াছিলেন। চীনজাতিও প্রাচীন মিশরবাসীদের (Egyptian) মধ্যেও জগতের মহাপ্লাবন ও পুনরায় জীব-জন্তু ও মানবজাতীর উৎপত্তিসম্বন্ধে এইপ্রকার কাহিনীপূর্ণ পৌরাণিক গ্রন্থ আছে।

খৃষ্টানদের বিশ্বাস যীশুখৃষ্ট কোন মানুষের পুত্র নহেন। তিনি স্বয়ং ঈশ্বরের পুত্র এবং অলৌকিক উপায়ে কুমারী

মেরীর তাঁহার জন্ম হইয়াছিল (Immaculate conception of the Virgin Mary and miraculous birth of Jesus the Christ)। কিন্তু অপর ধর্মসম্প্রদায়ের সংস্থাপক অবতারপুরুষেরদের শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব প্রভৃতি জীবনচরিত পড়িলে দেখা যায় তাঁহাদের ও ঐপ্রকার অলৌকিক ভাবে জন্ম হইয়াছিল। এই সমস্ত অবতার ও ধর্মযাজকগণ যীশুখৃষ্টের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রীসের অধিবাসী ইসাকিউলাপিয়াসের কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি আশ্চর্যভাবে সরাইয়া দিবার কথাপ্রসঙ্গে নিউটেষ্টামেণ্টের সেণ্টমার্কে বর্ণিত যীশুখৃষ্টের দ্বারা বহু-লোকের নানা দুশ্চিকিৎসা রোগ সরাইয়া দিবার কাহিনী মনে পড়ে। এইভাবে দেখা যায় আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে জনশ্রুতি ও কল্পিত কাহিনীর ভিত্তিতে স্থাপিত ধর্মসম্প্রদায়গুলির সমস্ত অবলম্বন একেবারে সরাইয়া ফেলিতেছে।

যাঁহারা মনে করেন শুধু বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া খৃষ্টানধর্ম দাঁড়াইয়া আছে তাঁহারা এই 'বিশ্বাস' শব্দটির অপব্যয় করিয়া থাকেন। ভ্রান্তিবশতঃ অনেক মনে করেন 'বিশ্বাস'-শব্দের অর্থ নির্বিচারে যে কোন বিষয়কেই মানিয়া লওয়া খামখেয়ালী। এই শ্রেণীর অধিকাংশ ব্যক্তির মতানুসারে বিশ্বাস কোন কিছু মানিয়া চলাকে বুঝায়। যেমন ফাদার টারটুলিয়ন (Farther Tertullion) বলিতেন যেহেতু ইহা অসম্ভব ব্যাপার আর সেইজন্য ইহাতে আমি বিশ্বাস করি (credo quia impo-ssibeest)। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা এই

প্রকার অন্ধবিশ্বাস অথবা নির্বিচারে কোন-কিছু মানিয়া লওয়ার কার্যকে কখনই সমর্থন করিতে পারেন না। বিংশ শতাব্দীর উপযোগী ধর্মাদেশের সৌধ এই প্রকার অনিশ্চিত ঘটনার ভিত্তিতে তাঁহারা স্থাপন করিতে প্রস্তুত নহেন।

এই বিংশ শতকের এমন এমন একটি ধর্মের প্রয়োজন হইয়াছে যাহা বিজ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কৃত সমস্ত সত্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের আবিষ্কারনীতির উপর যুগোপযোগী ধর্মের ভিত্তি স্থাপিত হওয়া উচিত। এই ধর্মমত যেন স্বীকার করে যে, বিশ্ব-জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ মূলত একই।

বিংশ শতক সে ধর্মকে চায় যাহা মানুষমাত্রে বাক্য ও চিন্তার স্বাধীনতাকে স্বীকার ও সমর্থন করিবে এবং যাহার সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত শেষ-সিদ্ধান্তগুলির সহিত নিজের ভাবের ঐক্য দেখাইতে পারিবে। এখনকার দিনে এমন একটি ধর্মের প্রয়োজন হইয়াছে যাহার যুক্তির অটল পর্বতের উপর স্থাপিত এবং যাহা উচ্চশ্রেণীর অথবা সাধারণ যে কোন আপত্তি ও বিরুদ্ধ সমালোচনার ও আঘাতে আদৌ বিচলিত হইবে না। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রকৃতি ও আদর্শ স্বাধীনচিন্তার সমর্থক। কোন ব্যক্তি অথবা পুস্তককে ইহা নির্বিচারে স্বীকার করে না অথবা একেবারে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করে না। একমাত্র সত্যকে আবিষ্কার ও শুধু সত্যের উপাসনা ইহার লক্ষ্য। সে প্রকার যে ধর্মকে আমরা এই যুগের উপযুক্ত বলিয়া মনে করি তাহাও সত্তের অভেদ্য ও অচল শৈলের প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। আর এই সত্য বিজ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কৃত ও সমর্থিত যে সত্য সেই সত্যই আধুনিক

যুগের উপযোগী ধর্মের ভিত্তি হইবে। ইহাই প্রকৃত ধর্ম, অতএব ইহা সমস্ত সত্যান্বেষী ব্যক্তিদের সংস্কার মুক্ত চিত্রের উপর আপনার সম্পূর্ণ প্রস্তাব বিস্তার করিতে পারিবে। বিজ্ঞানসমর্থিত এই ধর্মে সাম্প্রদায়িক ধর্মের মতো মুক্তির কোনও বাঁধাধরা যুক্তিহীন পরিকল্পনা থাকিতে পারিবে না। এই বিশ্বজনীন ধর্মে স্বর্গ অথবা নরকে প্রচলিত গোঁড়ামী ও ভ্রান্ত ধারণা কোন স্থান থাকা উচিত নয়। অনন্ত নরকের শাস্তির ভয় এই ধর্মে কোন ক্রমেই কেহ বিশ্বাস করিবে না।

আমেরিকায় সম্প্রতি প্রেততত্ত্বানুশীলন সমিতির Psychical Research Society আন্দোলন এখন সমস্ত দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই সমস্ত প্রেততত্ত্ববিদ্যা সমিতির গবেষণা অনন্ত নরকের শাস্তিসম্বন্ধে প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপর মৃত্যু শেল নিক্ষেপ করিয়াছে। যে ধর্ম-পদ্ধতির আজিকার দিনে প্রয়োজন হইয়াছে তাহা কোনও পুরোহিতপ্রথার নির্দেশ মানিবে না। ধর্মযাজকদের তথা-কথিত ঐশ্বরিক আবিষ্কারের দাবিতে এই ধর্ম আদৌ স্বীকার করিবে না। যে কোন শাস্ত্রেই হউক না কেন অন্ধভাবে তাহার অনুশাসনকে ইহা মানিয়া চলিবে না। যে সমস্ত যুক্তিহীন আচার-অনুষ্ঠান ও পূজা-উৎসব ধর্মের অসার অংশ এবং যাহা মানবাত্মর মুক্তি সাধনার ব্যাপারে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয় না বর্তমান যুগের ধর্ম তাদের ধরিয়া বসিয়া থাকিবে না। বিংশ শতক সেই ধর্মাচার যাহাতে যুক্তি বিরুদ্ধ ও বিজ্ঞানবিরোধী মতবাদ, বিশ্বাস প্রভৃতিকে সমর্থন করা হয় না। বিংশ শতক একমাত্র চায় সেই ধর্মকে যাহা সমস্ত কুসংস্কার হইতে মুক্ত। শূন্য অথবা অনস্তিত্ব হইতে মানুষ

জীবজন্তু সৃষ্টি হইয়াছে এই সমস্ত ভ্রান্ত মতবাদপূর্ণ ধর্ম-মতকে যাহা স্বীকার করে না বিংশ শতাব্দীর যেই যুক্তি প্রধান ধর্মের একমাত্র পক্ষপাতী।

বিংশ শতক উপযুক্ত ধর্মে ঈশ্বরীয় ধারণার অভিনবত্ব থাকা চাই। এই ধর্মানুসারে ঈশ্বর সগুণ ও নির্গুণ এবং তাহারও অতীত! এই ধর্মের ঈশ্বরসম্বন্ধে ধারণার চরমাবস্থা অথবা পরাকাষ্ঠা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নির্বিশেষ মূলসত্তার সহিত স্বরূপত এক ও অভিন্ন হইবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই মূলসত্তা বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দার্শনিক স্পিনোজা (Spinoza) ইহাকে 'অদ্বৈত চিৎসত্তা' (Substistan) বলিয়াছেন, হার্বাট স্পেন্সার (Herpert Spencer) ইহাকে বলিয়াছেন 'অজ্ঞেয় ও অজানিত তত্ত (Unknown anb Unknowable) প্লেটো ইহার নাম দিয়াছেন 'মঙ্গল-স্বরূপ' (Good), এমার্সনের নিকট ইহা 'পরমাত্মা (Over soul), কান্টের মতানুসারে ইহা 'বিশ্বাতীত স্বরূপসত্তা' (Ding an sich or the transcendental Thing-in-inself)। এই নামরূপাতীত নির্বিশেষ সত্তা বিশ্বাতীত (transcendent) হইলেও সমগ্র বিশ্বাচরাচরে পরিব্যাপ্ত ও ওতঃপ্রোত (immanent and resident in nature)। ইনি আমাদের আত্মার আত্মা, প্রাণের প্রাণ কোন ও বিশেষ নাম ও রূপের দ্বারা এই অসীম চৈতন্যস্বরূপ অনাদি অনন্ত নির্বিশেষ সত্তাকে কোন-কিছু দিয়া আবদ্ধ করা যায় না।

প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের কোনও নাম ও রূপ নাই। কিন্তু যখনি আমরা তাঁহাকে কোন নাম ও রূপের অবলম্বনে উপাসনা করি তখনই আমরা তাহার উপর আমাদের নিজের

ধারণা সংস্কার ও চিন্তারাশি অনুযায়ী তাঁহাকে এক মহান ব্যাক্তিত্বশালী বিরাট শক্তিমান পুরুষ বলিয়া মনে করি। আমাদের নিজের মনগড়া মতবাদ, কল্পনা ও ধারণার সীমায় ঈশ্বর কিসের জন্য আবদ্ধ থাকিবেন? তিনি যে অসীম ও সর্বব্যাপী তিনি আমাদের সমস্ত ধারণা ও কল্পনার অতীত এই ভাবেই তাঁহাকে আমাদের উপলব্ধি করিতে হইবে। আর এই ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণা এমনই যুক্তিপূর্ণ ও উদার হওয়া চাই যাহাতে সেই ঈশ্বর ধারণা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক মনীষীদের সর্বোচ্চ আদর্শের মধ্যে ভাবের সমন্বয় ও ঐক্য দেখাইতে পারে। এই ভাবেই আমরা ধর্ম ও বিজ্ঞানের সহিত সম্পূর্ণ সমন্বয় স্থাপন করিতে পারি।

বিংশ শতক চায় একমাত্র সেই ধর্মকেই যাহা সকল দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের চরমসিদ্ধান্ত গুলির সহিত স্বীয় চিন্তাধারার ঐক্য প্রমাণ করিতে পারিবে এবং যে সমস্ত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নিয়ম আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে এই ধর্ম তাহাদেরই উপর স্বীয় ভিত্তি স্থাপন করিবে। এযাবৎ বিজ্ঞান বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সমস্ত সত্যকে আবিষ্কার করিয়াছে শুধু তাহাদেরই নয় পরন্তু ভবিষ্যতেও যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কৃত হইবে এই ধর্মের সুবিশাল আয়তনে তাহারাও স্থান পাইবে।

আধুনিক বিজ্ঞান যেমন পূর্বপ্রচলিত বিশ্বাস জনশ্রুতির প্রতি অন্ধবিশ্বাস হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া শুধু একমাত্র সত্যকই সমর্থন করে বর্তমান শতকের উপযোগী ধর্মেরও ঠিক সেই একই প্রকার লক্ষ্য, আদর্শ ও উদ্দেশ থাকা উচিত। এক্ষণে এই প্রশ্ন উঠে যে এমন কোনও ধর্ম আছে কি যাহা

বিজ্ঞান ও পৃথিবীর সমস্ত উচ্চাঙ্গের দর্শনিক মতাবলম্বীদের সহিত সম্পূর্ণরূপে ভাবের ঐক্য রক্ষা করিতে পারে। তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে—হ্যাঁ সে প্রকার ধর্ম সত্য সত্যই আছে। যাহা প্রকৃত ধর্ম তাহার সহিত বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ-রূপে ভাবও আদর্শের ঐক্য আছে। প্রকৃত ধর্ম ও বিজ্ঞানের সহিত কোনদিন কোনও কালে বিরোধ হয় নাই যেহেতু আদর্শের দিক দিয়া ইহাদের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে।

অধ্যাপক হক্সলি (Prof Huxley) বলিয়াছেন ধর্মের নামে যে তথাকথিত অজ্ঞানের গুরুশিলাভার মানুষের উপর চাপিয়া বসিযা আছে প্রকৃত বিজ্ঞান তাহা হইতে মানুষকে মুক্ত করিবার মহাকল্যাণকর কার্য চিরকাল ধরিয়া করিয়া যাইবে। হার্বার্ট স্পেন্সারের (Herbert Spencer) মনেও ঠিক এই ধারণাই ছিল! কারণ তিনি বলিয়াছেন: ধর্মের যে সর্বাপেক্ষা নির্বিশেষ সত্য তাহার সহিত বিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা নির্বিশেষ (abstract) সত্যের স্বরূপগত ঐক্য থাকা চাই এবং এই ঐক্যের মধ্যেই ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয় সম্ভব। বিজ্ঞান ও ধর্মে আপতদৃষ্টে অনেক প্রভেদ ও বিরোধী ভাব দেখা যায়। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী এমন উদার ও উন্নত হওয়া চাই যাহাতে আমরা অনুভূতি ও ধারণার এমন এক উচ্চস্তরে উঠিতে পারিব যেখান হইতে আমরা দেখিতে পাইব বিজ্ঞান ও ধর্মের সমস্ত বিরোধীভাব এক বিশ্বজনীন ঐক্যের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। এই ঐক্যতত্ত্ব আবিষ্কারের ফলে মানবের চিন্তাজগতে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দিবে এবং তাহার ফল অতিশয় কল্যাণকর হইবে। এই বিষয়ে চেষ্টা করা সর্বোতভাবেই সমীচীন হইবে"।

বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে ঐক্যতত্ত্ব উপলব্ধি করিবার দিন এখন আসিয়াছে। জগতের বিখ্যাত ধর্মমতগুলির মধ্যে কোন্‌টি বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বকে উপলব্ধির উপর ভিত্তি করিয়া আছে, এবং এক অপরিণামী অনাদি অনন্ত সত্ত্বাকে বিশ্বজগতের যুগপৎভাবে নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া স্বকার করে—ইহা তন্ন তন্ন করিয়া সংস্কারমুক্ত বুদ্ধিতে ও নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করা আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় কর্তব্য।

আমরা যদি ইহুদী, ধর্ম খৃষ্টান ধর্ম, মুসমান ধর্ম জরথুস্ত্রীয় ধর্ম এবং অন্যান্য ধর্ম মতগুলি বিশেষ যত্নের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখি তাহা হইলে দেখিব যে বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বনীতির উপর তাহাদের ভিত্তি স্থাপিত নয়; কারণ তাহারা একজন কল্যাণকারী ঈশ্বর ও আর একজন অশুভকারী ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, অর্থাৎ তাহারা ভগবান (Creator of good) এবং শয়তানকে (Creator of evils) মানিয়া থাকে। ইহাই তাহাদের ধর্মের প্রধান শিক্ষা। এই ধর্মমতগুলি দুইটি স্বতন্ত্র প্রকৃতিসম্পন্ন ঈশ্বরে বিশ্বাসী (Dualistic), ইহাদের মতে কল্যামময় ঈশ্বরের সহিত চিরকাল অশুভকারী ঈশ্বরের বিরোধ লাগিয়াই আছে। সুতরাং তাহাদের ধর্মগুলি বৈচিত্র্যের মধ্যেই একত্ব অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপাতবিরোধী বহুবিধ ব্যাপারের পশ্চাতে যে ঐক্যতত্ত্ব আছে এই শিক্ষা দেয় না। জগতের চরমতত্ত্ব এক ও অদ্বিতীয় অনাদি অনন্ত সত্যের পরিবর্তে ইহারা জগতের দুইটি মূলকরণ আছে ইহাই বিশ্বাস করে।

বৌদ্ধধর্মও বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব (unity in variety) তত্ত্বকে শিক্ষা দেয় না।

পৃথিবীতে মাত্র একটি ধর্মই আছে যাহা বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব (unity in diversity) বর্তমান এই শিক্ষা মানব-জাতিকে প্রাগৈতিহাসিক অতীত কাল হইতে বহু শতাব্দী ধরিয়া শিক্ষা দিয়া আসিতেছে। এই ধর্ম বেদান্তপ্রতিপাদ্য সনাতন ধর্ম। এই ধর্মকেই এক্ষণে সমগ্র জগতে প্রচার করা উচিত। আমরা উপনিষদে দেখিতে পাই : "একই অগ্নি যেরূপ জগতে প্রবিষ্ট হইয়া বিভিন্ন প্রকার দাহ্য পদার্থের অকৃতি অনুসারে বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সেইরূপ সর্বভূতের অন্তরে অবস্থিত আত্মাও এক হওয়া সত্ত্বেও নানাপ্রকার নাম ও রূপযুক্ত জীবদিগের উপাধি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া দেখাইতেছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি এক ও অপরিণামী অবস্থাতেই থাকেন। নাম ও রূপ ভিন্ন হইলেও অথবা সমস্ত জীবের আকৃতির ও শ্রেণীর বিভিন্নতা থাকিলেও তাহাদের স্বরূপসত্তারূপ আত্মা চিরকালই এক। দেহের বিকৃতি ও পরিণামের সহিত আত্মার কখনও বিকার ও পরিবর্তন হয় না। আত্মা নিত্য, নির্বিকার নিরাময় ও নির্লিপ্ত"।[১] উপনিষদে আবার বলা হইয়াছে : "বায়ু সদা সর্বদাই এক এবং সমগ্র জগতে সকলের ভিতর পরিব্যাপ্ত। যে সমস্ত পদার্থের মধ্য দিয়া বায়ু প্রবাহিত হয় তাহাদের আকৃতি অনুযায়ী বায়ুকে সেই

১। অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো, রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা, রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥
— কঠোপনিষৎ ২।২।৯

আকৃতিযুক্ত বলিয়াই লোকে মনে করে। আত্মাও সেইপ্রকারে সর্বজীবের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। জীবদিগের নানাজাতী ও নানাবিধ নাম-রূপের জন্য তাহারা আপাতঃদৃষ্টে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মনে হয়।[২] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের অস্তিত্বের মূলভিত্তি আত্মা এক ও অখণ্ড। এই অসীম অখণ্ড সত্বাই সমগ্র বিশ্বচরাচরের প্রাণ, ইহাই সমস্ত জীবের জীবনীশক্তি। এই অসীম ও অখণ্ড প্রাণের স্পন্দনের ফলেই মন, ইন্দ্রিয়শক্তি, কঠিন, তরল ও বাষ্পীয় পদার্থ এবং সমস্ত দেশের (space) অভিব্যক্তি হইয়াছে[১]। একমাত্র বেদ ভিন্ন পৃথিবী আর কোনও ধর্মশাস্ত্রে এই প্রকার উচ্চতত্ত্ব বর্ণিত হয় নাই।

বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম কোনও বিশেষ নামে অথবা বিশেষ আকারে আবদ্ধ নয়। বিজ্ঞানের রীতি প্রকৃতির সহিত ইহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বর্তমান। বিশ্বজগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ মূলতঃ এক অবিনাশী নির্বিশেষ অনাদি ও অনন্ত সত্বা আর বেদান্ত ইহাই শিক্ষা দেয়। ক্রমিক অভিব্যক্তির ফলেই এই বিশ্বজগৎ এবং যাবতীয় জীব ও জড়-পদার্থের উৎপত্তি ইহাও বেদান্তধর্মের প্রদত্ত শিক্ষাসমূহের মধ্যে অন্যতম। বাইবেল প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত ছয়দিনেই জগতের সৃষ্টির বিশেষ মতবাদকে (Special Creation)

২। বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো, রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥
—কঠোপনিষৎ ২।২।১০

১। এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী।
—মুণ্ডকোপনিষৎ ২।১।৩

বেদান্ত স্বীকার করে না। কিভাবে ক্রমিক অভিব্যক্তির ফলে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে সে সম্বন্ধে বেদে এইরূপ বর্ণনা আছে: "সেই নির্বিশেষ অনাদি অনন্ত পরম সত্তা হইতে আকাশ (দেশ) অভিব্যক্ত হইল। আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি, বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল। অগ্নি হইতে জল, জল হইতে মৃত্তিকা, মৃত্তিকা হইতে উদ্ভিদ, তাহার পর কীট পতঙ্গ সরীসৃপ পশুপক্ষী অবশেষে মানবজাতি উৎপন্ন হইয়াছে।[১] এই মানবই ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া দিব্যদ্রষ্টা মহামানবে পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই ভাবে বেদান্ত প্রমাণ করিয়াছে যে এই সমগ্র বিশ্বচরাচরের নানাবিধ জীব ও পদার্থের বৈচিত্র্যের পশ্চাতে এক অপরিণামী নিত্যবস্তু বিদ্যমান আছে। এই মূলসত্তা ব্রহ্মের অনির্বচনীয় শক্তি বা প্রকৃতি হইতে সমগ্র জীবজগতের অভিব্যক্তি হইয়াছে। এই প্রকৃতি এক ও বিশ্বব্যাপিনী। বেদান্তের মতে ঈশ্বর ব্যক্তিত্বশালী (সগুণ) আবার সর্বব্যক্তিত্বের অতীত (নির্গুণ) উভয়ই। বেদান্তের মতে শূন্য অথবা অনস্তিত্ব হইতে সমস্ত জীবের উৎপত্তি হয় নাই, পরন্তু জীবমাত্রেই নিত্য এবং তাহাদের মধ্যে অবিনাশী প্রাণের বীজ বর্তমান আছে এবং তাহারা কার্য-কারণের নিয়মসূত্রে

১। (ক) প্রাণো হ্যেষ সর্বভূতৈর্বিভাতি—।

—মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।১।৪

(খ) "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।"

—কঠোপনিষৎ ৩।২।২

(গ) "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধিভ্যোঽন্নম্। অন্নাদ্রেতঃ। রেতসঃ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ।"

— তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।১

আবদ্ধ। জীবমাত্রেই জন্ম-মৃত্যুহীন এবং তাহাদের ধ্বংস নাই। জীবের স্বাধীনভাবে কর্ম করিবার অধিকার আছে, কিন্তু তাহার কর্মফল দান করেন স্বয়ং ঈশ্বর। প্রাণীগণ সর্বদা নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। মন ও জড় পদার্থ (mind and matter) একই নিত্য সত্তারই দুইটি বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র এবং ইহাও বেদান্ত শিক্ষা দান করে।

বিশ্ববৈচিত্র্যের পশ্চাতে অখণ্ড সত্তা বিরাজিত আর আধুনিক যুগের চিন্তাধারার ইহাই বিশেষত্ব। আধুনিক যুগের এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে বহুসহস্র বৎসর পূর্বে ভারতের প্রাচীন সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন স্থতরাং এই বিষয় কি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিবার যোগ্য নয়? তাঁহাদের মতে এক অদ্বিতীয় অনাদি সত্তাই জগতের সর্বজীব ও পদার্থের মূলভিত্তি এবং তাহাদের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। সমস্ত আপেক্ষিক সত্যের মধ্যে ইহাই নিরপেক্ষ ও অপরূপ সত্য। ভারতীয় ঋষিগণের দ্বারা আবিষ্কৃত এই প্রাচীন সত্যই আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে দৃঢ়ভাবে সমর্থিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। দেশে বিদেশের মনীষিগণ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিশ্বের মূলতত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য আপনাদের ভাবনা ও চিন্তাশক্তির স্বাতন্ত্র্যের বিষয়কে পৃথক পৃথক পথে অনুসন্ধান করিলেও অবশেষে তাঁহারা একই চরম-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। আধুনিক যুগে এই সত্যকেও বিজ্ঞান প্রমাণ করায় ঋষিদের এই উক্তির সত্যতা আবার নূতন ভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ আপনাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও ধারণা হইতে এই

সত্যকে স্বরূপগতভাবে দেখিয়া অবশেষে এই যুক্তিদৃঢ় সিদ্ধান্তে জ্ঞানের চরম গন্তব্যস্থলে উপনীত হইয়াছিলেন। অন্যদিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের লব্ধ জড়পদার্থসমূহের বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গী হইতে মূলসত্যকে নির্ণয়ের অন্বেষণ করিতে করিতে সেই একই চরম গন্তব্যস্থলে উপনীত হইয়াছেন। এই দুই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর সমপ্রকৃতি আবিষ্কারের ফলে প্রকৃত ধর্ম ও প্রকৃত বিজ্ঞানের মধ্যে অতি-আশ্চর্য সমন্বয় স্থাপিত হইবে।

আধুনিক বিজ্ঞান কার্য-কারণবাদের মধ্যে নিহিত সত্যের উপযোগিতা সবেমাত্র আরম্ভ বুঝিতে করিয়াছে। প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে তাহার কারণ অব্যক্ত অবস্থায় থাকে, যেহেতু কার্যই কারণের স্থূল অভিব্যক্ত রূপ। অতএব কার্য ও কারণ একই পদার্থেরই ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থা মাত্র। এই সত্য পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণও এক্ষণে অল্পাধিক অনুভব করিতেছেন। কিন্তু বহুশত বৎসর পূর্বে ভারতে এই সত্য সর্বপ্রথমে শিক্ষা দেওয়া ও প্রচার করা হইয়াছিল।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠানরূপ অবিনাশী সত্যকে আবিষ্কার করিবার জন্য বিজ্ঞান অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিতেছে। আর এই বিশ্বজনীন শাশ্বত সত্যকে উপলব্ধির জন্য ধর্মের সমস্ত প্রচেষ্টা নিযুক্ত হইয়া আছে। কিন্তু এই সার্বজনীন শাশ্বত সত্যের উপাসনা তখনই সম্ভব যখনই ইহাকে যথাযথ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে আবিষ্কার করিতে পারা যাইবে। সত্যকে আবিষ্কারের উপরেই সত্যের উপাসনা নির্ভর করে। শাশ্বত সত্যের সহিত আমাদের পরিচয় না থাকিলে তাহার উপাসনা করা কী প্রকারের আমাদের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে?

আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্তগুলির সহিত যে সমস্ত বিষয়ের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য ও ঐক্য নাই সেগুলিকে আমাদের বর্জন করিতে হইবে। সুতরাং আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে বেদান্তের এই বিশ্বজনীন ধর্মের বিশেষ কোন নাম নাই। ইহা সম্পূর্ণরূপে এক এবং জগতের সমস্ত ধর্মমতকে আপনার অঙ্গীভূত করিয়া ফেলিতে পারে। অন্যান্য ধর্মমতের অস্তিত্ব অল্পাধিক পরিমাণে কোন না কোন মহামানবের ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর কবিয়া আছে। এই জন্য সেগুলি কখনও বেদান্তের ন্যায় বিশ্বজনীন ধর্ম হইতে পারে না। খৃষ্টান ধর্ম যীশুখৃষ্টের ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধদেবের ব্যক্তিত্বের উপরেই নিজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। মুসলমানধর্মের অস্তিত্ব মহম্মদের জীবন ও বাণীর উপরে নির্ভর করিয়া আছে। খৃষ্টান সায়েন্সের ভিত্তি মিসেস এডি-র (Mrs E. Baker Eddy, 1821-1910 A. D.) জীবন ও কার্যাবলীর উপবে স্থাপিত। কোনও মহামানব যতই মহৎ, জ্ঞানী ও পবিত্র হউন না কেন তথাপি তাঁহার জীবন ও বাণী কখনও সর্ববাদীসম্মত আদর্শরূপে গৃহীত হইতে পারে না। এইজন্য যে সমস্ত ধর্মমত কোনও মহামানবের উপরে নিজের ভিত্তি স্থাপন কবিয়াছে তাহারা কখনই বিশ্বজনীন হইতে পারে না। কারণ ব্যক্তিবিশেষ যতই মহৎ, জ্ঞানী ও পবিত্র হউন না কেন, তিনি কখনও সমস্ত মানুষের দ্বারা সমানভাবে গৃহীত হইতে পারেন না। কিন্তু বেদান্ত প্রতিপাদিত এই ধর্ম কোনও ব্যক্তিবিশেষের উপর নিজের ভিত্তিকে স্থাপন করে নাই, পরন্তু যে সমস্ত নিয়ম অনাদি কাল হইতে আমাদের অধ্যাত্ম জীবনকে

নিয়মিত করিতেছে সেই সমস্ত শাশ্বত নিয়মই এই ধর্মের মূলনীতি ও সেই ভিত্তিতে ইহা স্থাপিত হইয়া আছে। বেদান্তের এই ধর্ম পাঁচ সহস্র বৎসরেরও অধিককাল হইতে বর্তমান আছে এবং ভবিষ্যতেও ইহা সমগ্র জগতের ধর্ম বলিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী একভাবে বিরাজ করিতে থাকিবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও অভিব্যক্তির কারণ নির্ণয়সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান যে নিয়ম, নীতি ও পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে বেদান্তও সেই নীতি ও পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া থাকে। জগতের সমস্ত ব্যাপারের আনুপূর্বিক তথ্যনির্ণয়ের কার্য আধুনিক বিজ্ঞানের উপর এক্ষণে ন্যস্ত হইয়াছে। বেদান্তের মতে প্রেম ও ভক্তির দ্বারা ঈশ্বর উপাসিত হন। ঈশ্বর অখণ্ড সত্তাবান এবং আমরা প্রত্যেকেই তাঁহার এক একটি অংশমাত্র। যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন: 'আমার পরম পিতা ও আমি এক' (I and my Father are one)। বেদান্তের অদ্বৈতমতাবলম্বীরাও বলেন: "অহং ব্রহ্মাস্মি, সোঽহং',—আমরা প্রত্যেকেই নির্বিশেষ অনন্ত সত্তা ব্রহ্মের সহিত স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন। আমরা প্রত্যেকেই সেই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মারই বহুরূপে প্রতীয়মান প্রতিচ্ছবি মাত্র। এই পরমাত্মাই সমগ্র বিশ্বচরাচরের একমাত্র নিয়ন্তা ও অধীশ্বর। যাঁহাকে বিশ্বজগতের স্রষ্টা বলা হয় তিনি ইহারই প্রথম অভিব্যক্তি। এই হিরণ্যগর্ভই সর্বাগ্রে জাত ও সকল জীব ও জগতের অধিপতি[১]।

যে এক মূলনীতিকে আধুনিক বিজ্ঞান আবহমান কাল

১। "হিরণ্যগর্ভ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাত পতিরেকাসীৎ।"

—ঋগ্বেদ ১০।১২১।১

ধরিয়া পালন করিয়া আসিতেছে বেদান্ত সেই নীতিকে যীশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের বহুশতাব্দী পূর্বেই আবিষ্কার করিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানে আমরা ইহার সিদ্ধান্ত এইরূপ দেখিতে পাই বিশ্বজগৎ ক্রমশঃ স্থূলভাবে অভিব্যক্ত হইতে আবার পরিণামে সূক্ষ্ম অবস্থায় যায়। সৃষ্টির চরম-অভিব্যক্তির পরে প্রলয়ে তাহা আবার কারণাকারে ফিরিয়া যায়। জগৎ সূক্ষ্মাবস্থায় অভিব্যক্তি লাভ করিয়া যে কাল পর্যন্ত বর্তমান থাকে তাহাকে এক একটি পর্ব (cycle of evolution) বলা হয়। সৃষ্টির এই স্থিতিকাল বা পর্ব প্রলয়ে পরিণতি লাভ করে। সৃষ্টি (ব্যক্ত অবস্থা) প্রলয়ের (অব্যক্ত অবস্থার) অনুসরণ করিতেছে আর এই নিয়ম অনাদি কাল ধরিয়া চলিয়া অসিতেছে। অতএব জগতের অভিব্যক্তির আদি অন্ত আছে কিন্তু অণু পরমাণু, শক্তি, গতি, বেগ ইহাদের কোন আদি অন্তও নাই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলসত্তা অবিনাশী ও অপরিণামী, ইহার কোন আদি নাই এবং অন্তও নাই।

অতএব নাম ও রূপেরই আদি ও থাকিতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক জীবাত্মার দেহকে উৎপন্ন করিয়া তাহাকে প্রাণবন্ত করিয়া যাহা রাখে সেই অপরিণামী সত্তার কোন আদি, উৎপত্তি অথবা কারণ নাই। পত্যেক জীবাত্মাই কার্য্য-কারণের সূত্রে আবদ্ধ। বেদান্তে ত্রই কার্য-কারণের সূত্রকে কর্মবাদ বলা হয়। এই কার্য-কারণবাদ প্রত্যেক কর্ম ও তাহাদের শুভাশুভ ফলের (প্রতিক্রিয়ার) বিচারসহকারে অনুধাবন কনিয়া আমরা জগতের পাপ, তাপ, দুঃখ, জড়া ব্যাধি ও যন্ত্রণাভোগ প্রভৃতি কারণের বিজ্ঞানসম্মত মীমাংসা পাইয়া থাকি। মানুষের শুভকারী একজন ঈশ্বর এবং আর

একজন অহিতকারী ঈশ্বর আছেন এইরূপ অযৌক্তিক মতবাদকে বেদান্ত কখনও স্বীকার করে না। বেদান্ত বলে জগতে ভাল যতদিন আছে ততদিন তাহার সঙ্গে মন্দও থাকিবে, ইহাদের একটিকে গ্রহণ করিলে অপরটিকেও আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। এই দুই আপেক্ষিক পদার্থকে অতিক্রম করিলে আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব যে, আত্মা ভাল মন্দ, পাপ পুণ্য সুখ দুঃখ প্রভৃতি সমস্ত দ্বন্দ্বাবস্থার (relativities) অতীত। অশুভই অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানের অবস্থা। এই অজ্ঞানতার বশবর্তী হইয়া আমরা যে কোন কার্যই করি সে'সমস্তই ভ্রমপূর্ণ হইয়া থাকে। এই সমস্ত ভুল করিতে করিতে পরিণামে আমরা অনেক শিক্ষা পাই। অতএব প্রত্যেক পাপকার্যের তাহার নিজের দিক দিয়াও উপযোগিতা আছে ; কারণ এই সমস্ত ভুল করিতে করিতে অবশেষে আমরা জানিতে পারি যে, কোন সূত্র হইতে মানুষের এই পাপপ্রবৃত্তি আসিয়া থাকে। এই ভাবের সমস্ত পাপকর্মই ভুল, এবং কোনও অজানিত প্রবৃত্তির বলে আমরা এই সমস্ত ভুল করিয়া থাকি। এই জগতে আমরা সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার জন্যই জন্ম জন্ম ধরিয়া ক্রমাগতই চলিতেছি। এইভাবে চলিতে চলিতে অবশেষে আমরা স্থির করিতে পারি প্রকৃতপক্ষে আমাদের বাঞ্ছনীয় বস্তুটি কী? বেদান্তর মতে মানুষের হিতকারী অথবা অহিতকারী কোনই ঈশ্বর নাই। কর্মবাদের রহস্য উপলব্ধি করিতে পারিলেই এই সমস্ত বৈষম্য ও বিভিন্ন প্রকৃতির ও অবস্থার যাবতীয় সমস্যাই সমাধান করা যাইবে। জগতের এই সমস্ত কর্মরাশির রহস্য অবগত হইলেই আমরা জানিতে পারিব যে ঈশ্বর

কাহারও পুণ্যের পুরস্কার এবং পাপের শাস্তি দান করেন না। পাপীর শাস্তিভোগ, পুণ্যবানের স্বর্গসুখপ্রাপ্তি অথবা পাপ-কার্য্যের ফলভোগ—এসমস্ত ধারণা আমাদের ভ্রান্তি ও অজ্ঞানতার জন্য হইয়া থাকে।[১] প্রকৃতপক্ষে এগুলি আমাদের নিজকৃত সু অথবা কু কর্মেরই প্রতিক্রিয়া। প্রত্যেক মানব যে কার্যই করে তাহার ফল অনিবার্যভাবে তাহার উপরে আসিয়া পড়ে। পুণ্যের পুরস্কার বলিয়া যাহাকে আমরা মনে করি তাহাও আনাদের নিজকৃত সৎকর্মরাশির অনিবার্য প্রক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নয়। অতএব নিজে দুঃখ কষ্ট পাইলে তাহার জন্য আমরা ঈশ্বরকে দোষী অথবা দায়ী করিব কেন? ঈশ্বর অনন্ত প্রেমের সমুদ্র, তিনি অসীম জ্ঞনের আধার ও তিনি ন্যায়পরায়ণতার স্বরূপ।

আধুনিক বিজ্ঞানের মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মূলকারণ অজ্ঞেয় ও অজানিত। বেদান্তের মতে বিষয়বাসনামুগ্ধ চঞ্চল ও অশুদ্ধ মনের নিকটেই বিশ্বের মূল কারণ অজ্ঞায় ও অজ্ঞেয় হইয়া আছে। কিন্তু শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ আত্মার দ্বারা ইহার প্রকৃতি ও স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। কারণ আত্মা ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ একই বস্তু। মন হইতে আত্মা আমাদের আরও নিকটতর। আর বিশ্বের মূলতত্ত্ব স্বরূপ যে ব্রহ্ম, তাহা আমাদেরই আত্মার আত্মা। এই নির্বিশেষ শুদ্ধ চিৎসত্তাই

১। ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে ॥
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥
—গীতা ৫।১৪-১৫

আমাদের অস্তিত্বের চির-অধিষ্ঠান। মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের পরপারে সমাধির অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিশ্বের এই মূলতত্ত্বকে উপলব্ধি করা একমাত্র সম্ভব। এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি যে বেদান্ত আধুনিক বিজ্ঞানের একত্ববাদের (monism) সহিত সমন্বয় স্থাপন করিতে পারে। তবে আধুনিক বিজ্ঞানের একত্ববাদের প্রতিপাদ্য বস্তু জড়, ইহার মতে বিশ্বের মূল-উপাদানও জড়। কিন্তু বেদান্তের মতে বিশ্বের মূলতত্ত্ব জড় নয়, ইহা অখণ্ড অসীম চৈতন্যস্বরূপ, ইহা সকল চেতনধর্মী জীবেরই চৈতন্যের অনাদি কারণ। ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ ও সকল জীবেরই চেতনার কারণ ইহা স্বীকার না করিলে প্রশ্ন উঠিবে যে, তবে কোন সূত্র হইতে আমরা জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি লাভ করিয়া থাকি? চৈতন্য কি কখনও চৈতন্যবিহীনতা হইতে উদ্ভূত হইতে পারে? এইরূপ ধারণা অলীক, কারণ তাহা হইলে বিশ্বাস করিতে হয় যে, অনস্তিত্বের সৃষ্টি হইয়াছে। বেদান্তের মতে অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব এবং অস্তিত্ব হইতে কখনও অনস্তিত্বের উৎপত্তি হইতে পারে না[১]। প্রাচীন ভারতের তত্ত্বদর্শী ঋষিয়া এই তত্ত্বকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অতএব বেদান্তের এই মত পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক একত্ববাদ অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিপূর্ণ এবং ইহ বৈজ্ঞানিক নিয়মপদ্ধতিকে আরও ঐকান্তিকতার সহিত অনুসরণ করে। একমাত্র বেদান্তই ধর্মকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপিত ও ইহার বিজ্ঞানসম্পন্ন যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যান প্রদান করিতে পারে; কারণ বিজ্ঞানের সত্যনির্ণয়ের সমস্ত পদ্ধতিকেই অবলম্বন করিয়া ও বিজ্ঞানের আলোকেই বেদান্ত স্বীয় ধর্মমতকে

১। নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ। —ভগবদ্‌গীতা ২।১৬

ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। অথবা অন্যভাবে বলিতে গেলে ব্যাপ্তিজ্ঞান (inductive) ও অনুমান (deductive) ন্যায়-শাস্ত্রের (Logic) এই দুই স্বীকৃত নিয়মকে মানিয়া লইয়া বেদান্ত স্বীয় প্রতিপাদ্য সত্যকে নির্ণয় করিতে চেষ্টা করে। যুক্তিবাদের প্রাধান্য দান করাই বেদান্তের অন্যতম বিশেষত্ব। যে কোনও দার্শনিক মতবাদ (system) ন্যায়শাস্ত্রের ব্যাপ্তিজ্ঞান ও অনুমানের এই দুই নিয়মকে সমর্থন করে এবং তাহা সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমরা যদি জগতে অন্য সমস্ত প্রচলিত ধর্মমতগুলিকে যেমন ইহুদীধর্ম, খৃষ্টানধর্ম, জরথুস্ত্রীয় ধর্ম প্রভৃতিকে যুক্তি-বাদের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিতে যাই তাহা হইলে আমরা প্রতিমুহূর্তেই দেখিতে পাই যে তাহারা কোনও যুক্তির সহিত সন্মুখীন হইতে পারে না, যুক্তির প্রচণ্ড আঘাতে তাহারা ছিন্ন ভিন্ন, চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। বেদান্তের বিশ্বজনীন ধর্ম ভিন্ন আর এমন কোনও ধর্ম নাই যাহা বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের সন্মুখীন হইতে পারে। অতএব বিজ্ঞান ও ধর্মের যে বিরোধ তাহা একমাত্র বেদান্তের দ্বারাই মিটাইতে পারা যায়। মনীষী দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে বেদান্তসম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া লিখিয়া ছিলেন যে তাঁহার দার্শনিক মতবাদের সাদৃশ্য রাখিতে পারে এমন একটি মতবাদ ভারতবর্ষে আছে তাহা জানিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন।

নীতিবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্থাপন ও তাহার যুক্তিপূর্ণ মূল নিয়মাবলী একমাত্র বেদান্তের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে। কারণ যাহা প্রকৃত নীতিবাদ (ethics) তাহা বৈজ্ঞানিক

ভিত্তির উপরেই স্থাপিত হওয়া উচিত। তাহা না হইলে ইহার কোনই মূল্য থাকে না। যীশুখৃষ্টের প্রদত্ত নীতি-শিক্ষায় বলা হইয়াছে : "তোমার প্রতিবেশীদের তুমি একান্ত আপনার জানিয়াই ভালবাসিবে" (Love the neighbours as the Self")। কিন্তু আমাদের প্রতিবেশীদের কেন যে আমরা ভালবাসিব এবং এইরূপে প্রতিবেশীদের আত্মবৎ ভালবাসার সার্থকতা কি তাহার কোনও যুক্তি খৃষ্টানদের বাইবেল অথবা পাশ্চাত্যের নীতিবিজ্ঞানে আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু এই নীতিশিক্ষার যুক্তিশীলতা আমরা বেদান্তে পাই কারণ বেদান্তের মতে 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ তুমি সেই সর্বব্যাপী শাশ্বত অব্যয় আত্মা। তুমিই ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন জীবরূপে প্রতিভাত হইতেছে। আপাদতদৃষ্টিতে 'বহু' বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তুমি ও তোমার প্রতিবেশীগণ সকলেই স্বরূপতঃ একই আত্মা। অতএব তোমার প্রবিবেশীগণ তোমারই বিভিন্ন প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নয়। আমাদের প্রতিবেশীদের ভালবাসা কর্তব্য, কিন্তু তাহার কারণ এই নয় যে, তাঁহারা আমাদের উপকার করিয়া থাকেন, পরন্তু তাঁহারা আমাদের সহিত স্বরূপতঃ অভিন্ন বলিয়া তাঁহাদের আত্মবৎ ভালবাসা আমাদের একান্ত কর্তব্য। আমাদের প্রতিবেশীগণ, সমাজভুক্ত প্রত্যেক নরনারী এবং সমগ্র মানবজাতি সকলেরই মধ্যে একই আত্মা বিরাজিত। আমরা সকলেই এক সর্বান্তর্যামী বিশ্বপিতা পরমাত্মারই সন্তান। ভালবাসা অথবা প্রেম অর্থে সমগ্র মানবজাতী, সমস্ত জীব ও সমগ্র বিশ্বচরাচরের সহিত আমাদের একাত্মতা উপলব্ধি করাকে বুঝাইয়া থাকে। সমস্ত

মানবকে সমস্ত জীবের সহিত সেই একই আত্মা বলিয়া উপলব্ধি করাই নীতিবাদের ভিত্তি হওয়া উচিত। তাহা হইলে আমরা আর অপরের প্রতি দ্বেষ হিংসা করিতে চাহিব না, কাহারও অনিষ্ট করিতে আমাদের আর প্রবৃত্তি হইবে না করিয়া এবং অপরকে বঞ্চিত করিয়া, ও অপরের সর্বনাশ নিজের উন্নতি সাধনের দুর্মতি কখনও আমাদের মনে জাগিবে না।

বেদান্তের প্রতিপাদ্য এই তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। এই সুমহান তত্ত্ব দেশে বিদেশে ও সমগ্র জগতে প্রচার করা উচিত। এই সত্য সর্বত্র প্রচারিত হইলে শুধু যে জগতের ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে শান্তি, ঐক্য ও সমন্বয় স্থাপিত হইবে এমন নয়, পরন্তু প্রকৃত বিজ্ঞানের মধ্যে ভাবের ঐক্যও প্রমানিত হইবে। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এই সমন্বয় এবং ধর্মে ও বিজ্ঞানে ভাবের ঐক্য স্থাপিত ও প্রমানিত হওয়া এই বিংশ শতাব্দীতে একান্ত প্রয়োজন। মনীষী অধ্যাপক মোক্ষ মূলার (Max Muller) যথার্থই বলিয়াছেন যে সকল দার্শনিক মতবাদের মধ্য বেদান্ত অপূর্ব্ব। জিজ্ঞাসু মানব-মনকে ইহা শান্তি ও সান্ত্বনা দান করে। বেদান্তের সুবিশাল আয়তনে সর্ববিধ ধর্মমতেরই যে স্থান আছে শুধু তাহাই নয়, ইহা নিখিল ধর্মমতকে সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব করিয়া ফেলিয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ

॥ ধর্মের লক্ষ্য ॥

পৃথিবীতে যে সমস্ত ধর্ম প্রচলিত আছে তাহাদের প্রত্যেকেই ঈশ্বরলাভ করিবার উদ্দেশ্য সাধনার এক একটি পথমাত্র। কিন্তু সকল ধর্মের শিক্ষার বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের পশ্চাতে আমরা এই ঐক্য দেখিতে পাই যে, সমাধি অথবা দিব্যজ্ঞান লাভ করাতেই মানুষ সর্বোচ্চ জ্ঞান ও অসীম আনন্দের অধিকারী হয়। ইহা সকল ধর্মেরই অভিমত। ইহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান, জরথুস্ত্রীয় প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীরা মনে করে স্বর্গে যাইয়া সুখভোগ করাই ধর্ম ও জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ। কিন্তু এ বিষয়ে বেদান্তের লক্ষ্য আরও উর্ধে এবং আরও মহত্তর। বেদান্ত প্রতিপন্ন করে স্বর্গে যাইয়া অনন্তকাল সুখভোগ করা কখন সম্ভব হইতে পারে না। কারণ স্বর্গ প্রভৃতি লোকেরও উৎপত্তি ও বিনাশ আছে সুতরাং তাহারা অনন্ত নয়, একমাত্র ব্রহ্মই অনাদি ও অনন্ত[১]। বেদান্তের মতানুসারে স্বর্গ, দেবলোক বা ব্রহ্মলোক প্রভৃতিতে যাওয়া ধর্মসাধনার চরমলক্ষ্য নয়, পরন্তু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মূলকারণ পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎকার করা এবং সনাতন ধর্মেরও ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা। হিন্দুদের যাহা প্রকৃত ধর্ম তাহাতে কোন গতানুগতিক একঘেয়ে মতবাদ, যুক্তিহীন, অর্থহীন কোন গোঁড়ামী অথবা নির্বিচারে যাহাতে তাহাতে অযথা বিশ্বাস স্থাপন, কোন কোন বিশেষ বিষয়ে মানিবার

১। 'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুনঃ।' —ভগবদ্গীতা ৮।১৬

জন্য অঙ্গীকারে বাধ্য হওয়া প্রভৃতি ব্যাপারের স্থান আদৌ নাই। বৃথা আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ, সংকীর্ণ মতবাদ, বিশ্বাস-বিধি প্রভৃতি ধর্মের বহিবারণ মাত্র, এ-সমস্তই ধর্মের অসার ও গৌণভাগ। যে বায়ুর দ্বারা আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করি সেই বায়ুর ন্যায় ধর্ম অবাধ উন্মুক্ত ও সকল প্রকার সঙ্কীর্ণতা ও গণ্ডীর বাহিরে। জাতি, ধর্ম ও বর্ণনির্বিশেষে যে কোন সত্যান্বেষী ব্যক্তিই এই ধর্মকে জানিবার অধিকারী।

সুদূর অতীতে প্রাচীন ভারতের (বৈদিক যুগে) কোন এক ঋষিকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, "বিশ্বের চরমতত্ত্ব কী?" তাহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন: "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বি-জিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি",—অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই জীব সকল উদ্ভূত হইয়াছে, যাঁহার মধ্যে যাবতীয় জীব ও জড়পদার্থ অবস্থিত এবং যাঁহাতে তাহারা পরিণামে বিলীন হইবে তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর তিনিই ব্রহ্ম[১]। এই ব্রহ্ম অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়, অনাদি অনন্ত অসীম সত্তা। মানুষের অন্তর নির্মল হইলে যখন তাহার মলিন স্বার্থবাসনা দূরীভূত হয় তখনই এই অসীম সত্তা অথবা পরমাত্মার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। আমাদের অন্তর এখন স্বার্থবাসনায় মলিন হইয়া আছে এইজন্য আমরা সেই পরমাত্মার অস্তিত্বকে অনুভব করিতে পারি না।

সেই পরমাত্মাকে লাভ করিবার জন্য আমাদিগকে বিবেক অর্থাৎ সদসদ্ (নিত্য ও অনিত্য) বিচারশীলতা অভ্যাস

১। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ৩।১

করিতে হইবে। চৈতন্যস্বরূপ আত্মা হইতে আমাদের এই স্থূল জড় দেহের উৎপত্তি; আত্মাই দেহকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যাহারা বিশ্বাস ক'রে যে দেহের ধ্বংসে মানুষের কোন অস্তিত্ব থাকে না আমেরিকায় প্রেতবিদ্যা বিশারদদের আন্দোলন (spiritualistic movement) তাহাদের এই দেহসর্বস্বতার মতবাদ ও বিশ্বাসের উপর মৃত্যুশেল নিক্ষেপ করিয়াছে। এই প্রেতবিদ্যাবিশারদদের আন্দোলনের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে যেসব নরনারী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে তাহাদের অনেকের আত্মা সুখে থাকে এবং এমনকি তাহারা আমাদের সহিত কথাবার্তাও কহিতে পারে। খৃষ্টানদের বিশ্বাস যে যীশুখৃষ্টই জগৎকে সর্বপ্রথম মানবাত্মার অমরত্বসম্বন্ধে শিক্ষাদান করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্য নয়। ইতিহাস হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যীশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের প্রায় ছয় শতাব্দী পূর্বে বুদ্ধদেব আত্মার অমরত্ব সম্পর্কে প্রচার করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের বহুযুগ পূর্বে সর্বপ্রথম বেদেই এই তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। যে সমস্ত বিদেশী ও অন্যধর্মাবলম্বী ব্যক্তি আমাদের দর্শনশাস্ত্র ও বেদকে আদৌ বুঝিতে না পারিয়া অজ্ঞতাবশত বলিয়া থাকেন "যদি তুমি ইহাতে (খৃষ্টধর্মে) বিশ্বাস না কর তাহা হইলে অনন্ত নরকে তোমার গতি হইবে—তাঁহাদের এই সব অন্যায় উক্তি আমরা মোটে গ্রাহ্য করি না। আমেরিকায় বিচারশীল বা যুক্তিবাদী লোকেরা এখন আর বাইবেলে বর্ণিত 'অনন্ত নরকে শাস্তি'-তে বিশ্বাস করেন না। খৃষ্টিয়ান-চার্চ অনন্ত নরকভোগের মতবাদ (doctorine of eternal hell-fire) প্রচার করে বলিয়া পাশ্চাত্যদেশের প্রকৃত সুবিদ্বান ব্যক্তিরা

চার্চের সমস্ত মতবাদ আর অবাধে গ্রহণ করে না। তাহাদের মন এখন সংশয়ে আবৃত আর সেইজন্য বেদান্তের দার্শনিক মতের শিক্ষা প্রচার ভিন্ন তাহাদের সেই সংশয়কেও কখনও দূর করা যাইবে না। বেদান্তের মতে ঈশ্বর কখনও কোন ব্যক্তিকে তাহার পাপকর্মের জন্য শাস্তি দেন না, কিন্তু খৃষ্টানধর্মে এই প্রকার উন্নত ধর্মাদর্শ শিক্ষাদানের প্রমাণ আদৌ দেখা যায় না। আমরা যদি সকলে ঈশ্বরের সৃষ্ট হই তাহা হইলে কী করিয়া আমরা পাপী হইতে পারি! এ' সম্বন্ধে হয়তো বলা যাইতে পারে যে, শয়তানের কুপ্রভাবে এইরূপ হয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি শয়তানকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? যে শয়তান মানবজাতির নানা অমঙ্গল ও দুর্নীতির কারণ ঈশ্বর তাহাকে ধ্বংস করেন না কেন? এই প্রশ্নের সমস্ত উত্তর দিয়া খৃষ্টান মিশনারীগণ আমাদিগকে আশ্বস্ত করিতে পারে না। বেদান্ত স্পষ্টই বলে যে ঈশ্বর কাহারও পাপের শাস্তি অথবা পুণ্যের পুরস্কার দেন না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিজ নিজ কার্যের দ্বারা মানুষ আপনার পুণ্যের পুরস্কার ও পাপকর্মের শাস্তি পায়। উদাহরণ যেমন কোনও লোক যদি আগুনে হাত দেয় তাহা হইলে তাহার হাত পুড়িয়া যাইবে। এমন জিজ্ঞাসা করি ভগবান কি ঐ ব্যক্তির হাত পুড়াইয়া দেন? কিন্তু তাহা সত্য নয়, আগুনের দ্বারা এবং প্রাকৃতিক নিয়মে ইহা ঘটিয়া থাকে। সেইপ্রকারে কেহ যদি কাহারও কোন বস্তু চুরি করে, মিথ্যা কথা বলে অথবা হত্যা করে তাহাহইলে সে নিজের কুকর্মের প্রতিক্রিয়ার ফলেই শাস্তি ভোগ করিবে। আমাদের পূর্বতন সৎকার্য ও সুচিন্তাসমূহের ফলে আমরা সৌভাগ্যের

অধিকারী হই এবং যাবতীয় কুকার্য ও কুচিন্তার ফলেই আমাদের অশান্তি ও দুর্গতি দেখা দেয়। যদি আমরা সর্বদা সৎ ও পুণ্যকার্য করি এবং নিঃস্বার্থ, দানশীল ও আতিথ্যপরায়ণ হই; যদি আমাদের অন্তরে প্রেম, মৈত্রী, ও দরিদ্রদের প্রতি দয়া থাকে, যদি আমাদের পবিত্রতা, দাক্ষিণ্য, নৈতিকতা এবং যেসব সদ্‌গুণ অন্তরকে নির্মল করে আমরা তাহার অধিকারী হই তাহা হইলে আমরা নিশ্চতই ধর্মসাধনার চরম আদর্শে উপনীত হইতে পারিব।

আধ্যাত্মিক উন্নতির বিভিন্ন প্রকার অবস্থাব বিষয় বেদান্তে বর্ণিত আছে যে প্রথম আধ্যাত্মিক শৈশব অবস্থা, দ্বিতীয় যৌবনাবস্থা ও অবশেষে পরিণত অবস্থা। প্রথম অবস্থায় সাধক মনে করে ঈশ্বর জীব ও জগৎ হইতে একবারে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন এবং তিনি বহু দূরে ও উচ্চে আকাশে কোথায় বসিয়া আছেন। ইহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান, ও জরথুস্ত্রীয় (পারসী) প্রভৃতি মতের উপাসকগণ ধর্মভাবের এই স্তরে অবস্থিত।

দ্বিতীয় অবস্থায় সাধক অনুভব কবে ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হইতে দূরে ও বিচ্ছিন্ন নহেন—তিনি সকলের অন্তরে ও বাহিরে এবং তিনি সর্বব্যাপী ও বিশ্বের সর্বত্র ওতঃপ্রোত। তিনিই এক অসীম অখণ্ড পরিপূর্ণ সত্তা এবং সমস্ত জীব তাঁহারই অংশস্বরূপ। তৃতীয় অবস্থায় আমরা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করি এবং বুঝিতে পারি যে তিনি আমাদের মধ্যে বিরাজিত এবং স্বরূপত আমাদের সহিত এক ও অভিন্ন। তিনি সর্বশক্তিমান, বিশ্বের পরিপালক এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তিনিই একমাত্র চরম মূলসত্তা। যে যোগী এই অবস্থাকে

উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি দেখিতে পান ঈশ্বর তাঁহার মধ্যে ব্যাপ্ত, তাঁহারই নিজস্বরূপ এবং তিনি নিজেও বিশ্বচরাচরে সর্বজীবের সহিত একাত্ম ও অবিচ্ছিন্ন।

স্বর্গ প্রভৃতির লোকে যাওয়াকে আমরা ধর্মসাধনার চরম-লক্ষ্য বলিয়া মনে করি না। আমরা স্বর্গাদি সমস্ত লোককে অতিক্রম করিয়া আরও উচ্চতর আধ্যাত্মিক অবস্থার স্তরে উঠিয়া অবশেষে পরিপূর্ণ দিব্যজ্ঞান লাভের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকি। দিব্যজ্ঞানের এই অপরূপ অবস্থায় উন্নীত হইলে আমাদের সর্ববিধ কামনা পরিপূর্ণ হইয়া যায়। এই নিষ্প্রপঞ্চ অবস্থায় উপনীত হইলে স্বার্থবাসনা রূপ সাধকের অন্তরের সমস্ত গ্রন্থি উন্মোচিত হইয়া যায়, সমস্ত সংশয়ের এখানে চির অবসান হয় এবং সমস্ত কর্মফল চিরতরে ক্ষয় হইয়া মহামুক্তি লাভ করে।[১]

১। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ —মুণ্ডকোপনিষৎ, ২।২।৮

॥ পরিশিষ্ট ॥

॥ দার্জিলিঙে ছাত্রগণের প্রতি উপদেশ ॥

আজকে আমার বড় আনন্দের দিন তোমাদের কাছে এসে। তোমরা যে আমার বিদেশে ধর্মপ্রচারের কথা শুনে আনন্দিত হচ্ছ তাই শুনে আমি আরও আনন্দিত। এখনকার আমাদের ধর্ম হয়েছে পুঁথিগত। ভাল হোক বা মন্দ হোক বইয়ে যা লেখা থাকবে তাকেই যে ধর্ম বলে মানতে হবে সেটা কুসংস্কার। ধর্মজীবন আরম্ভ ছোট বয়স থেকেই করা উচিত। এইতো আমি ষোল বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী হয়েছিলাম। ঐ বয়সে আমি পরমহংসদেবের কাছে যাই। তাঁর কাছে যাবার আগে আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল না। বাইবেলে আর আমাদের ধর্মপুস্তকে যা লেখা আছে তা একেবারে বিশ্বাস করতাম না, বরং ওসব কবিকল্পনা ভেবে একেবারে উড়িয়েই দিতাম। বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য এঁরা যে ঈশ্বরের অবতার তা তখন বিশ্বাসের মধ্যেই আসত না। মানুষ যতক্ষণ কোন একটা জিনিষ প্রত্যক্ষ না করে ততক্ষণ তার বিশ্বাস হয় না। আমাদেরও তাই। পরে এক আদর্শ মহাপুরুষকে প্রত্যক্ষ করলাম। ইনিই শ্রীশ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেব। তিনি বলতেন ছেলেদের ভিতর ঈশ্বরের প্রকাশ বেশী, কারণ তারা অকপট, তাদের ভিতর বিষয়বুদ্ধি প্রবেশ করেনি। মানুষের মনে যতই বিষয়বুদ্ধি আসে ততই কপটতা বাড়ে। এতে ঈশ্বরলাভের

ইচ্ছা থেকে মন অনেক দূরে চলে যায়, তাহলে বুঝতে হবে সরলতাই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। শ্রীপরমহংসদেবের স্বভাব দেখেছি তিনি সর্বদা বালকভাবে থাকতেন। বাইবেলে বলেঃ "Unless you become simple as child, you cannot enter into the kingdom of Heaven."—অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি শিশুর মতো সরল হবে ততক্ষণ ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। বালকেরা কোন জিনিসের মূল্য বোঝে না এবং এটা আমার, ওটা তোমার প্রভৃতি ভাব তাদের সরল মনে প্রভাব বিস্তার করে না, তাই সংসারের সকল বন্ধন তখন তাদের কাছ থেকে দূরে থাকে। স্বার্থবুদ্ধি যখন তাদের মনে উদয় হয় তখনই তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস হারায় আব সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনের শান্তি নষ্ট হয়। আজকাল আমাদের দেশের লোকের ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই, আছে মাত্র টাকায়। অর্থকেই অনেকে ঈশ্বরের স্থানে বসাতে চায়। কিন্তু ঈশ্বরবিশ্বাসী লোকের টাকায় দরকার কি। তাঁর কাছে টাকার কোনই মূল্য নাই। তাঁর কাছে টাকা ও মাটি সব সমান। উপনিষদে আছে "সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ",—অর্থাৎ ভগবান সকলের সাক্ষী, অদ্বিতীয় ও সকল গুণের অতীত। এই জ্ঞান তোমাদের জীবনে হওয়া উচিত। বর্তমানে বিদ্যালয়গুলিতে অধ্যাত্মিক বিষয়ে কিছুই শিক্ষা দেয় না। ত্যাগ ও সেবা মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ এবং এতে মহাসুখ ও শান্তি নিহিত, কিন্তু এসকল বিষয়ের কিছুই স্কুল কলেজে শেখাতে চেষ্টা করে না। স্কুলে কদাচিৎ কোন মহাপুরুষের আদর্শ-জীবনের চিত্রগুলি চোখের সামনে ধরতে দেখা যায়। ধর্ম নামে কোন জিনিষই সেখানে একেবারে

অজ্ঞাত বলা চলে। কিন্তু ছেলেবেলা ধর্মশিক্ষার উপযুক্ত সময় এবং এই সময়েই ছেলেরা স্কুলে কলেজে থাকে। তাই তারা যদি তখন ধর্মে মন দিতে না পারে তা হলে পারবেই বা কবে। তাই তোমাদের এই সময় থেকে ধর্মভাব শিক্ষা করা দরকার। টাকায় অনেক জিনিষ পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের বেলা ঐকথা খাটে না। তাঁকে পেতে গেলে জীবনে ত্যাগ চাই। ঈশ্বরের জ্ঞানেই যথাযথ জ্ঞান লাভ হয়। আত্মার বিকাশ ধর্মের আচরণে হয়। মনু বলেন : "ধৃতি ক্ষমা দমস্তেয়ং শৌর্যমাত্মবিনিগ্রহ, হ্রীবিদ্যা সত্যমক্রোধো দশ কর্ম ধর্ম লক্ষণম্,"—অর্থাৎ ধারণা, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়দমন, অচৌর্য, পরিচ্ছন্নতা, আত্মনিগ্রহ. লজ্জা, ব্রহ্মবিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ এই দশটি ধর্মের লক্ষণ।

ইংরাজিতে একটি কথা আছে : "return good for evil", —অর্থাৎ মন্দের পরিবর্তে ভাল দান কর। কেহ যদি তোমার প্রতি অসদ্ব্যবহার করে তবে তুমি ঐরূপ ব্যবহারের পরিবর্তে তাহার প্রতি ভাল ব্যবহাব কর। যতই দেহের প্রতি মমতা হবে ততই অপরের ওপর প্রতিহিংসা নেবার ইচ্ছা জাগবে এবং এটাই মনুষের স্বভাব। বিশেষত আমাদের বাঙালীর আবার প্রধান দোষ পরশ্রীকাতরতা, তার কারণ আমাদের মধ্যে সংযমগুণ নেই, তাই কারও গুণ দেখতে পারি না। অনেকে নিজেকে সর্বাপেক্ষা বড় দেখি। এই একটি জিনিষ তোমরা সতত দূরে রাখতে চেষ্টা করবে ও সেটি হোল চিত্তের চাঞ্চল্য। এটি দমন করতে হলে আত্মসংযম ও শক্তির প্রয়োজন। যারা বিষয়াসক্ত তারা সকল জিনিষকে নিজের ভাবে। পরের জিনিষে লোভ করা তাদের একটা

স্বভাব হয়ে দাঁড়ায় এবং পরে লোভ সামলাতে না পেরে চৌর্যকার্যে অভ্যস্ত হয়। এখন দেখছি চুরি ও প্রবঞ্চনা করা আমাদের দেশে একটা ধর্মের লক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চাকুরীতে সকলেই আগে উপরি পাবার আশা করে এবং উপরিটা যে এক রকম চুরি তা তারা মনে করে না।

সকল ব্যক্তিরই শৌচের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। এর অভাবে শরীর অসুস্থ হয় এবং মনেও শান্তি পাওয়া যায় না, কারণ মন আর শরীরের পরস্পরের মধ্যে খুব নিকট সম্বন্ধ। শৌচকে সকল ধর্মই খুব উচ্চ আসনে স্থান দিয়েছে। ইংরাজেরা বলে: "cleanliness is next to Godliness,"—শৌচ ঈশ্বরপ্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ। অপরিষ্কার হওয়াকে সকলেই ঘৃণা করে। তাই সকলকে শিক্ষা দেবে যে অপরিষ্কার থাকায় কি কুফল হয় আর পরিষ্কার থাকায় কি সুফল ফলে। এসব বিষয় সকলকে ভাল করে বোঝাবে। আত্মনিগ্রহের দিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখাও জীবনে এক মহাকর্তব্য। এটা পালন করতে হলে মানসিক শক্তির প্রয়োজন। কুপ্রবৃত্তির প্রভাবকে সংযত ক'রে সৎপথে যাওয়াটা যদিও কষ্টসাধ্য কিন্তু চেষ্টা করলে শীঘ্র সহজসাধ্য হয়। মনু বলেন অসাক্ষাতেও কুকাজ না করাই মানুষের ধর্ম। তোমরা এমনভাবে কাজ করবে যাতে তোমরা লজ্জা না পাও। ভগবান সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ, তাঁর কাছে কিছুই লুকোনো যায় না। মানুষের অগোচরে কোনও কুকাজ করলে মানুষ যে ধরতে পারেনা সেটা ঠিক, কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সকল সময়েই তা ধরা পড়ে, সুতরাং তাকে বাধা দেবে কি করে! তাই মানুষের সমানে যা করতে না

পারবে একাকী তা করা উচিত নয়, কারণ তুমিতো ঠিক একাকী নও, আর একজন অদৃশ্য পুরুষ তোমার সঙ্গে সতত আছেন।

বিদ্যা দুই প্রকার: একটি অপরা বিদ্যা আর একটি পরা বিদ্যা। জগতে যে সকল পদার্থ আছে তাহার জ্ঞান অপরা বিদ্যা আর আমি কে, তুমিই বা কে, ঈশ্বরই বা কি এই সব বিষয়ের জ্ঞান পরা বিদ্যা। পরা বিদ্যায় ঈশ্বর লাভ হয়। অপরা বিদ্যাই পরে ধীরে ধীরে পরা বিদ্যায় পরিণত হয়। যে কোন একটি বিষয় ভাল করে অধ্যয়ন করলে পরে তার অদ্ভুত শক্তি দেখতে পাবে। একটা ফুলের দিকে তাকাও, এর বিষয় হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে চিন্তা কর, দেখবে এটা কি, কোথা থেকে এল ইত্যাদি। এইভাবে সর্বশেষে মূলরহস্যে এসে দেখবে কেবল সেই অন্তপুরুষেরই সমস্ত মহিমা। চর্মচক্ষে প্রজাপতির সুন্দর ডানার সৌন্দর্য, অস্তরবির অরুণ আলো, জ্যোৎস্নার হাসি প্রভৃতি দেখতে পাবে, কিন্তু সেই নিরাকারকে নিরঞ্জনকে দেখবে কি করে! তিনি তো চর্মচক্ষের বাইরে। তাঁকে দেখতে হলে তাই হৃদয় পরিষ্কার করা দরকার। ঈশ্বরকে যে শুধু ধ্যানে পাবে তা নয়, যে কোন জিনিষের ধ্যান কর, পরে সে জিনিষের সাহায্যে তাঁরই কাছে গিয়ে পৌঁছুবে। তাঁকে চর্মচক্ষের পরিবর্তে জ্ঞানচক্ষে স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে। He is the pervading spirit,—অর্থাৎ তিনি সর্বব্যাপী চৈতন্য। সামান্য বালুকণার ভিতরেও তিনি আছেন। এভাবে তোমার যে পূর্বজন্ম আছে তাও বুঝতে পারবে।

আমরা পরমাণু থেকে কীটাণু এবং তাই থেকে বৃক্ষ-লতা,

পরে পশু এবং সর্বশেষে এই শ্রেষ্ঠ নররূপে পরিণত হয়েছি। আমাদের পূর্বজন্মের জ্ঞান নেই, কিন্তু এর জ্ঞানও লাভ করা যায়। যোগের দ্বারাই এই জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর! যোগে মন যত উন্নত হয় ততই তোমার মনে পূর্বস্মৃতি স্পষ্ট হয়ে উদয় হয়। কোন মানুষ একটি জীবনে সমস্ত বিষয় জানতে পারে না, তাই তাকে বার বার আসতে হয়। পরে তার কাজ সিদ্ধ হলে পরমাত্মার দর্শন লাভ হয়। মৃত্যুর পর তোমাদের দেহ এখানেই পড়ে থাকবে, সঙ্গে যাবে একমাত্র প্রকৃতি, সংস্কার বা স্বভাব। এ'জন্মে আমরা এসেছি পূর্বজন্মের কর্মফলভোগের জন্য। পূর্বজন্মে যে যে কাজ করেছ এজন্মে সেই সেই কর্মানুযায়ী ফল ভোগ করবে। মানুষ নিজেই নিজের প্রকৃতি গঠন করে। তোমরা নিজেদের সংযমশক্তিতে ও চেষ্টায় তোমাদের প্রকৃতি খুব উন্নত ও মহৎ করতে চেষ্টা করবে। পরা বিদ্যাকে লক্ষ্য ক'রে সর্বদা কাজ করবে। মৃত্যুর পর মানুষ যায় কোথায় এর জ্ঞান বই পড়লে পাবে না, সাধুকর্মের দ্বারাই লাভ করা সম্ভব।

যোগাভ্যাসে তোমরা আত্মার অনন্ত শক্তি উপলব্ধি করতে পারবে। Healing power (মনের আরোগ্যশক্তি) তোমাদের মধ্যেই আছে। স্বাস্থ্যের নিয়ম জাননা বলেই তোমাদের নানান রকম ব্যাধি হয়। কিন্তু healing power-এর culture করলে অনায়াসে সে সকল দমন করতে পারা যায়। Healing power ব্রহ্মচর্যপালনে আরও বাড়ে। সংযত জীবন হলে চিন্তা করার শক্তি বাড়ে এবং সামান্য চিন্তায় মস্তিষ্ক দুর্বল হয় না। শক্তিহীন ব্যক্তির কিছুই মনে থাকে না, এমন কি ধীরে ধীরে তাদের মনুষ্যত্বেরও লোপ

পায়। সত্যস্বরূপ ভগবানকে মিথ্যা দ্বারা কোনদিন পাওয়া যায় না, তাই সত্য রক্ষা করার জন্য মনে একটা দৃঢ়প্রত্যয় রাখবে। দেয়ালে লিখে রাখবে: "আমি সত্য কথা বলব ও সাধুস্বভাব হব"। অহঙ্কার দূর করার খুব চেষ্টা করবে। সকল সময় মনে রাখবে সেবাই পরমধর্ম। আমরা রামকৃষ্ণ মিশনে এটাই দেখাই, দেখাই নরই নারায়ণ—তা সে যে জাতিরই হোক। এই পূর্বোক্ত জ্ঞানের উদয় হ'লে ধীরে ধীরে পরা বিদ্যা লাভ করবে এবং পরে ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ ক'রে ধন্য হবে। দিব্যজ্ঞান হলে সীমার মধ্যে অসীমের দৃষ্টি পাবে।

বর্তমান যুগের আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণদেব। শ্রীচৈতন্যের সকল ভাব আমরা তাঁর মধ্যে দেখেছি তোমরা এখন বালক, পরে ছেলের পিতা হবে, তোমাদের ওপর দেশের সমস্ত সমৃদ্ধি ও কল্যাণ নির্ভর করছে। তোমাদের ওপর দেশের সমস্ত গুরুভার পড়ে আছে আর ঐগুলি তোমাদেরই বহন করতে হবে এই ভেবে এখন থেকে কাজকর্ম করবে যাতে সত্যকার মানুষ হতে পার [১]

১। স্কুলের ছাত্রগণের অভিনন্দনের উত্তর। এর ভাষা চলতি হিসাবে পূর্বে "হিমাদ্রী" মাসিক পত্রে প্রকাশিত হওয়ায় ঐ ভাষাই কিছুটা মার্জিত ক'রে দেওয়া হোল।